সত্য কথন

সত্যকথন

সম্পাদনা
আসিফ আদনান

শার'ঈ সম্পাদনা
শায়খ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী
মাওলানা আলী হাসান উসামা

ভাষা সম্পাদনা
মাওলানা আলী হাসান উসামা

প্রচ্ছদ
ইয়ামিন সাজিদ

সত্যকথন

আরিফ আজাদ, আসিফ আদনান, আশিক আরমান নিলয়, জাকারিয়া মাসুদ, মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার, মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন, মুহাম্মাদ তোয়াহা আকবর, শিহাব আহমেদ তুহিন, তানভীর আহমেদ

সম্পাদনা

আসিফ আদনান

শারঈ সম্পাদনা

শায়খ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী

মাওলানা আলী হাসান উসামা

সীরাত পাবলিকেশন

সত্যকথন

প্রথম প্রকাশ : মুহাররাম ১৪৩৯, অক্টোবর ২০১৭

দ্বিতীয় প্রকাশ : সফর ১৪৩৯, নভেম্বর ২০১৭

তৃতীয় প্রকাশ (ইবুক সংস্করণ) : শাবান ১৪৪১, এপ্রিল ২০২০

www.shottokothon.com
www.facebook.com/shottokothon1

ISBN: 978-984-34-2999-5

প্রকাশক :

সীরাত পাবলিকেশন

ফোন : +৮৮ ০১৮ ৫৪৪৭ ৬৯৫৩

অনলাইন পরিবেশক :
wafilife.com
rokomari.com

পরিবেশক :

মাকতাবাতুল বায়ান

শপ#৩১৫, দ্বিতীয় তলা, ৩৮/৩-কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন : +৮৮ ০১৭ ০০৭৪ ৩৪৬৪

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ۝ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ۝

তারা কি সৃষ্ট, নাকি না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা সৃষ্টি করেছে আকাশসমূহ ও পৃথিবী? বরং (বাস্তবতা তো এই যে,) তারা বিশ্বাসই রাখে না। তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ কি তাদের কাছে, নাকি তারাই (সবকিছুর) নিয়ন্ত্রক? [আল কুরআন, সুরা তূর, ৫২ : ৩৫-৩৭]

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। ***সত্যকথন*** এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হচ্ছে। অল্প সময়ে বইটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বইটির প্রথম সংস্করণের ব্যাপারে পাঠকসমাজে যেই আগ্রহ ও চাহিদা দেখা গেছে, তা আমাদের ধারণাতীত ছিল। তবে যদি আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতির দরবারে এ প্রচেষ্টা কবুল না হয়, তাহলে সৃষ্টির কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা ও গ্রহণযোগ্যতা মূল্যহীন। নিশ্চয় সাফল্য শুধুই আল্লাহর পক্ষ থেকে।

প্রথম সংস্করণের বেশ কিছু বানান ও মুদ্রণজনিত ভুল এ সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ***উমেদ*** এর ভাইয়েরা নিঃস্বার্থ সহায়তা করেছেন। সত্যকথন এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া আরেকটি পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম সংস্করণে লেখক মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনারের "তাকদির আগে থেকে নির্ধারিত হলে মানুষের বিচার হবে কেন? যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছেনি তাদের কী হবে"—শিরোনামের প্রবন্ধের ১১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হাদিসের অনুবাদে ভুল ছিল। মূলত যে উৎস থেকে অনুবাদটি গৃহীত হয়েছিল সেখানে ভুল থাকার কারণে এমনটি হয়েছে। অনুবাদটি গ্রহণ করা হয়েছিল তাফসির পাবলিকেশন কমিটি থেকে প্রকাশিত ড. মুজিবুর রহমান অনূদিত তাফসির ইবন কাসিরের ২০০৮ এর সংস্করণ থেকে। উক্ত বইয়ের আলোচ্য হাদিসের ভুল অনুবাদের পাশাপাশি হাদিসে নেই এমন অতিরিক্ত বক্তব্যও যুক্ত করা হয়েছিল, যার ফলে পাঠকের মধ্যে তাকদিরের ব্যাপারে ভুল ধারণা তৈরি হবার আশঙ্কা থাকে। অনিচ্ছাকৃত

ভুলটি চোখে পড়ার সাথে সাথে লেখক ভুল সংশোধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে। ভুলটি সনাক্তকরণ ও সংশোধনের কাজে সহায়তার জন্য আমাদের সম্মানিত শার'ঈ সম্পাদকদ্বয়ের পাশাপাশি শায়খ মুনিরুল ইসলাম ইবন জাকির এবং বিশেষভাবে আবু সাদ ভাইয়ের ধন্যবাদ প্রাপ্য। আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী ও সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ এর ওপর, তাঁর পরিবারের ওপর, তাঁর সাহাবিগণের ওপর।

আসিফ আদনান

সফর ১৪৩৯, নভেম্বর ২০১৭

সূচি

শুরুর কথা

ইসলামবিদ্বেষের কদর্য চেহারার সাথে বাংলাদেশের মানুষের আনুষ্ঠানিক পরিচয় হয় ২০১৩ এর শাহবাগ আন্দোলনের সময়। বাক্‌স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীলতার নামে বিভিন্ন ব্লগে যে ভয়ঙ্কর ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, এ ব্যাপারটা আমাদের অধিকাংশেরই ধারণার বাইরে ছিল। ঘৃণার এই মাত্রা ও তীব্রতার মুখোমুখি হবার প্রস্তুতি বাংলাদেশের মুসলিমদের ছিল না, এমন বলাটা ভুল হবে না। বলা যায়, ২০১৩ পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ এই জাতিকে—সেক্যুলার ও মুসলিম—একটি বিশ্বাসের সঙ্কটের *(Crisis of faith)* মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ব্যক্তিপরিচয়, জাতীয় পরিচয় এবং রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যাপারে বেশ কিছু অমীমাংসিত কঠিন প্রশ্নের জবাব খোঁজা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হতে পারে এ সঙ্কটের শুরু ২০১৩-তে, কিন্তু এ সঙ্কট, এ দ্বন্দ্বের শেকড় প্রোথিত আরও গভীরে।

ইসলাম নিয়ে বাংলাদেশের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের অ্যালার্জি বেশ পুরোনো। সংখ্যার বিচারে সংখ্যালঘু কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর প্রভাবের দিক দিয়ে সংখ্যাগুরু সমাজের এ অংশটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। কেউ তাদের 'সুশীল সমাজ' বলে থাকেন, কেউ বলেন 'প্রগতিশীল'। কেউ বলেন 'সংস্কৃতিমনা' অথবা 'মুক্তমনা'। অনেকে তাদের জাতির বিবেকও বলেন। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, বাংলাদেশের মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ওপর এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভ তৈরির ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য প্রশ্নাতীত। মফস্বল থেকে মেট্রোপলিটনে, শিক্ষিত ও 'আলোকিত' হবার চেষ্টায় ব্যস্ত মানুষেরা জ্ঞাতসারে অথবা অজান্তে এই ক্ষুদ্র কিন্তু প্রভাবশালী অংশটির চিন্তাচেতনা দ্বারা প্রভাবিত।

অজানা কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সুশীলতা, প্রগতিশীলতা, মুক্তচিন্তা এবং 'জাতির বিবেকের' ওপর নিরঙ্কুশ জমিদারিত্ব অর্জন করা এ অংশটি ইসলামকে আধুনিক সভ্যতার অ্যান্টিথিসিস (*antithesis*) হিসেবে উপস্থাপন করে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নিরলসভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে মধ্যযুগীয়, বর্বর, অমানবিক, পশ্চাৎপদ ইত্যাদি প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। 'বাঙালি' কিংবা 'বাংলাদেশি' হবার আবশ্যক শর্তাবলির লিস্টে পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্র, উদারনৈতিকতা (*Liberalism*) আর সেক্যুলারিযমের দর্শনকে সরাসরি কাট-পেইস্ট করে বসিয়ে দেয়। আর এর সাথে ৭১ এর ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা মিশিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজের এমন একটি বয়ান তৈরি করে, বাঙালিয়ানা বা বাংলাদেশিত্বের এমন এক সংজ্ঞা তৈরি করে, যা সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

এ ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্যের সাথে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং এ ভূখণ্ডের যেসব মানুষ ৭১-এ পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল, তাদের বক্তব্যের অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়। দুদলই ৭১ ও ইসলামকে মুখোমুখি দাঁড় করায়। এক দল পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামের সমার্থক দাবি করে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষের যুদ্ধকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রমাণ করতে চেয়েছিল। অন্য দল পাকিস্তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ দ্বারা চালিত যুদ্ধ দাবি করে এমন এক "ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" আবিষ্কার করে, যা বাক্‌স্বাধীনতা আর চিন্তার স্বাধীনতার নামে ইসলামবিরোধিতা ও ইসলামবিদ্বেষের লাইসেন্স দেয়।

একই সাথে তারা ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের (*Enlightenment*) মুখস্থ অনুকরণে ধর্মকে; এ ক্ষেত্রে ইসলামধর্মকে, উপস্থাপন করে উন্নতি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে। তারা মুক্তচিন্তা, মুক্তমন, আধুনিকতা আর প্রগতিশীলতার একটা সিলেবাস তৈরি করে। প্রথাবিরোধিতার নামে নতুন প্রথা তৈরি করে। ইসলামবিদ্বেষকে এ প্রথাগত প্রথাবিরোধিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেয়। আর যেহেতু আধুনিক যুগে জীবিকার পাশাপাশি চিন্তার দিক থেকেও মানুষ কেন্দ্রমুখী তথা শহরমুখী, তাই শহুরে এই প্রথাগত

ইসলামবিদ্বেষ বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন স্তরে। ২০১৩ সালে শাপলা বনাম শাহবাগ দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করে মুক্তচিন্তা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামবিদ্বেষের যে তীব্র রূপ আমরা দেখেছি, বাক্‌স্বাধীনতার আড়ালে ইসলামবিদ্বেষকে বৈধতা দেয়ার যে প্রচেষ্টা দেখেছি, সেটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই প্রক্রিয়ার ফলাফল; কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

তবে এ সঙ্কটের দায়ভার কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর পুরোপুরি চাপানো যায় না। যারা ইসলামকে তাদের আদর্শিক শত্রু হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছে, তারা সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামবিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন শক্তিশালী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় দীর্ঘদিন ধরে ছড়ানো ইসলামবিদ্বেষ প্রভাবিত করছে সামাজিক চিন্তা ও নৈতিকতাকে, প্রভাবিত করছে আমাদের যুবসমাজের উল্লেখযোগ্য একটি অংশকে; একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু কেন বাংলাদেশের মুসলিমরা সঠিকভাবে এই সিস্টেম্যাটিক ইসলামবিদ্বেষের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলো, কেবল ‘নাস্তিক-মুরতাদ’-দের ওপর দোষ চাপিয়ে সেই প্রশ্নের জবাব মেলে না। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য আমরা ঠিক কী পদক্ষেপ নিয়েছি, এ প্রশ্নেরও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের মুসলিমসমাজের সংখ্যাগুরু অংশ এ সমস্যার সমাধান হিসেবে উটপাখির মতো বালুতে মাথা গুঁজে রাখাকে বেছে নিয়েছেন। যেন যথেষ্ট সময়জুড়ে, যথেষ্ট জোরে চোখ বুজে রাখলে একসময় আপনাআপনি এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। বস্তুত ২০১৩ এর মতোই এখনও বাংলাদেশের মুসলিমরা এ সঙ্কটের মোকাবেলা করতে অপ্রস্তুত। আর এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো, সার্বিকভাবে ইসলামের ব্যাপারে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।

‘বাংলাদেশ ৯০% মুসলিমের দেশ’—এ জাতীয় কথা আমরা হরহামেশাই শুনে থাকি। বার বার এ ধরনের কথার পুনরাবৃত্তির মাঝে আত্মতৃপ্তি খুঁজে পাই। কিন্তু মুখস্থ বুলির আড়ালে বাস্তবতার দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি না অথবা করতে চাই না। আমাদের শহুরে শিক্ষিতসমাজের একটি বড় অংশের মাঝেই ইসলামের ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন হীনম্মন্যতা কাজ করে। ইসলামের সামাজিক ও

শাসন সম্পর্কিত বিধিবিধানের কথা বাদই দিলাম, নিছক ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত নানা বিধানের ব্যাপারে আমরা যারা মুসলিম বলে নিজেদের দাবি করি, তাদেরই নানা অজুহাতে বিরোধিতা করতে দেখা যায়।

একটি সহজ উদাহরণ দিই৷ দাড়ি-টুপি, হিজাব-নিকাব, বোরকা-জুব্বা নিয়ে ঠাট্টা করার প্রবণতা আমাদের সমাজে ব্যাপক। যদি ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি হজ্ব করার পর দাড়ি রাখেন, পাঞ্জাবি বা জুব্বা পরা শুরু করেন, তাহলে সেটা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আধুনিক সমাজের কোনো যুবক দাড়ি রাখবে, টুপি পরবে, গোড়ালির ওপর কাপড় রাখবে—এটা আমাদের কাছে কট্টরতা। ইসলামের ফরজ বিধান পর্দা করা, কিংবা ফ্রি-মিক্সিং থেকে দূরে থাকা—এটা সর্বসম্মতিক্রমে অতি রক্ষণশীল মনোভাব হিসেবে স্বীকৃত৷ আমাদের সমাজের বিশাল একটা অংশের কাছে এগুলো 'বাড়াবাড়ি', 'লোক-দেখানো ধার্মিকতা', 'পশ্চাৎপদতা'। এগুলো 'হুজুরদের' জন্য; মানুষদের জন্য নয়৷ নিয়মিত আমরা এগুলোকে আরবীয় সংস্কৃতির অনুসরণ বলে হালকা করার চেষ্টা করি। কিন্তু দুশো বছর ধরে যারা আমাদের দাস বানিয়ে রেখেছিল, তাদের অনুকরণে প্যান্টের মধ্যে শার্ট গুঁজে দেয়া, কাঠফাটা রোদ মাথায় কোট-টাই পরে ঘোরা আমাদের কাছে যৌক্তিক মনে হয়। সেটাকে কখনও গোলামির মনোভাব কিংবা ধর্ষিতা নেটিভের জারজ সন্তান কর্তৃক ঔপনিবেশিক পিতার আনুগত্য মনে হয় না; এ রকম উদাহরণ অসংখ্য।

'৯০% মুসলিমের' এই দেশের বাস্তবতা হলো, আমরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো 'গ্রহণযোগ্য ইসলাম' আর 'অগ্রহণযোগ্য ইসলাম'-এর সীমারেখা ঠিক করে নিয়েছি৷ যেটা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সেটা আমরা পালন করি, সেটা যদি শারিয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে ভুলও হয়। আর সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য আচার-অনুষ্ঠানের বাইরে যা কিছু আছে সেগুলোকে মধ্যযুগীয়, কট্টরতা, অতিরক্ষণশীলতা, বর্তমান যুগে অচল, ইত্যাদি নাম দিয়ে বাদ দিই৷ ইসলামের বিধানগুলো আমাদের কাছে ব্যুফের মতো। যেটা পছন্দ প্লেটে তুলে নিই, যেটা অপছন্দ সেটা ফেলে রাখি। আর এভাবে আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের বদলে ইসলাম আমাদের কাছে নিছক কিছু আচার-

অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের বদলে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এক অদ্ভুত ফ্রি-স্টাইল ইসলাম আমরা পালন করি। স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে কিতাবের কিছু অংশ গ্রহণ আর কিছু অংশ বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিই। আর তাই ইসলামের মধ্যে আমরা আত্মপরিচয় খুঁজে পাই না। ইসলাম আমাদের জন্য শুধুই ধর্মীয় পরিচয় হয়ে থাকে।

ইসলাম নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, হীনম্মন্যতা আর আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে ভোগা এই সমাজের একজন মানুষের সামনে যখন প্রগতি, মুক্তচিন্তা, বাক্স্বাধীনতা আর আধুনিকতায় মোড়ানো ইসলামবিদ্বেষ উপস্থিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেটার মোকাবেলা করার প্রস্তুতি বা সাহস কোনোটাই তার থাকে না। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে আধুনিক পশ্চিমা দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক বিধিবিধানগুলোকে যখন ইসলামবিদ্বেষীরা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানায়, তখন কীভাবে তার জবাব দিতে হবে, সেটা সে বুঝে উঠতে পারে না। কেউ চোখ বুজে, মুখ বুজে, এই বিতর্ক এড়িয়ে যেতে চায়। কেউ সংশয়ে পড়ে যায়। আবার কেউ নতুনভাবে ইসলামকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, যাতে করে পশ্চিমা মাপকাঠি অনুযায়ী ইসলামকে 'সভ্য', 'আধুনিক', 'মানবিক', 'প্রগতিশীল' ইত্যাদি প্রমাণ করা যায়। এভাবে আমাদের পরাজিত মানসিকতার কারণে হয় আমরা এই বাস্তব সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি অথবা পশ্চিমা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে *(worldview)* পরম সত্য, ধ্রুব ধরে নিয়ে শারিয়াহকে আমরা ভ্যারিয়েবলে পরিণত করি।

দীর্ঘদিনের সুপ্ত ইসলামবিদ্বেষের যে বিস্ফোরণ ২০১৩ থেকে আমরা দেখছি, ইসলাম ও চরমপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাকে *(militant secularism)* কেন্দ্র করে যে বিভাজন আমরা দেখছি, তার জন্য সংঘবদ্ধ ইসলামবিদ্বেষের পাশাপাশি বাংলাদেশের মুসলিমসমাজের কাঠামোগত এই দুর্বলতাও দায়ী। ইসলামবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে যতোই কঠিন ভাষায় বক্তব্য দেয়া হোক না কেন, অভ্যন্তরীণ এ দুর্বলতা কাটিয়ে না উঠলে বাহ্যিক শত্রুর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। একই সাথে এও সত্য, আমরা চোখ-কান বন্ধ করে থাকলে এ সমস্যা দূর

হয়ে যাবে না— আমরা এ তিক্ত সত্য স্বীকার করি বা না করি। যদি আমরা আসলেই মুসলিম হিসেবে এ সমস্যার সমাধান চাই তাহলে একদিকে যেমন ইসলামবিদ্বেষীদের মোকাবেলা করতে হবে তেমনিভাবে অন্যদিকে বাংলাদেশের মুসলিমসমাজকে এই আত্মপরিচয়ের সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ আত্মপরিচয়ের সঙ্কটকে জিইয়ে রেখে কেবল নাস্তিকদের যুক্তিখণ্ডন কিংবা ইসলামবিদ্বেষীদের অভিযোগের অপনোদন করে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব নয়।

প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অনলাইনে নাস্তিক-ইসলামবিদ্বেষীরা তাদের বস্তাপচা আবর্জনা প্রচার করে গেছে; এখনও করছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাদের কুযুক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই এবং সৃষ্ট সংশয়ের প্রত্যুত্তর, তাদের জোড়াতালি দেয়া আদর্শের ব্যবচ্ছেদের কোন দীর্ঘমেয়াদী, গোছানো প্রচেষ্টা হাতে নেয়া হয়নি। একই সাথে খেয়ালখুশি মতো ইসলামের ব্যাখ্যা করার অথবা ইসলামের সমর্থনে কথা বলতে গিয়ে ইসলামের বিধিবিধান এবং মূল বক্তব্য বদলে ফেলার প্রবণতার সংশোধনেরও চেষ্টা করা হয়নি। **সত্যকথন**–এর শুরুটা এই শূন্যতা পূরণের ইচ্ছা থেকে। সত্যকথনের উদ্দেশ্য বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামবিদ্বেষের মোকাবেলা করা। কিন্তু **সত্যকথন** এই আলোচনাকে নিছক 'আস্তিক বনাম নাস্তিক' জাতীয় কোনো তর্কের কাঠামোতে আটকে রাখতে চায় না। এ ধরনের তর্কে উত্তেজনা আছে, তর্কে জেতার আনন্দ আছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান নেই। নিছক তর্কের খাতিরে তর্ক করার বদলে **সত্যকথন** ইসলামের ব্যাপারে আমাদের সমাজের মুসলিমদের মাঝেই যে পরাজিত মানসিকতা আছে, তার পরিবর্তন চায়। নিজেদের স্বার্থেই ইসলামের ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। সত্যকথন এ পরিবর্তনের সূচনা করতে চায়, সত্যকথন এ রূপান্তরের অংশ হতে চায়।

সত্যকথনের পথচলার শুরু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে। অনলাইনের সফলতা ও জনপ্রিয়তার পর শুরু হয় ছাপার অক্ষরে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে সত্যকথন-কে নিয়ে আসার চিন্তা। তারপর নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে আজ

সত্যকথন মলাটবন্দি হয়েছে। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ চাইলে আমরা অনলাইনে এবং প্রিন্ট মিডিয়ামে আমাদের কাজের এই ধারা অব্যাহতো রাখতে চাই। নিয়মিত লেখা পাবার জন্য সংযুক্ত থাকতে পারেন, সত্যকথন এর ফেইসবুক পেইজ ও সত্যকথন সাইটের সাথে—

www.facebook.com/shottokothon1

www.shottokothon.com

বাস্তবতা হলো, 'যা আছে' আর 'যা উচিত' তার মাঝে পার্থক্য সহস্র যোজনের। তবে সহস্র যোজনের পথচলার শুরুটা হয় একটি পদক্ষেপ থেকেই। সত্যকথন—সেই প্রথম পদক্ষেপ নেয়ার এক প্রচেষ্টা। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

যদি এর মাঝে কোনো কিছু কল্যাণকর থাকে, তবে সেটা এক আল্লাহরই পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুলত্রুটি আছে, সেটা একান্তই আমাদের। যারা বিভিন্নভাবে সত্যকথনের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন ও আছেন, যারা নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের সময়, শ্রম ও মেধা এর পেছনে ব্যয় করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহ তাঁর অক্ষম বান্দাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন, এতে বারাকাহ দান করুন, সাফল্য দান করুন এবং একে অব্যাহতো রাখার তাউফিক দান করুন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর (ﷺ) সাহাবীগণ ও তাঁর (ﷺ) পরিবারের ওপর।

আসিফ আদনান

সম্পাদক, সত্যকথন

মুহাররাম ১৪৩৯, অক্টোবর ২০১৭

অন্যরকম পরশপাথরের গল্প

মুহাম্মাদ তোয়াহা আকবর

প্রিয় বন্ধুটা সেদিন বাসায় এসে বলছিল—“তোর দেয়া স্ট্যাটাসটা পড়লাম। আরে, যে আপুটার বদলে যাওয়ার গল্প লিখলি তার চেয়ে তোর বদলানোর গল্পটা তো আরও বেশি আকর্ষণীয় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই বছরে তুই কী ছিলি, আর শেষ দুই বছরে এসে কী হলি, সেটা শেয়ার কর।”

আমার ইতস্তত লাগে বলতে। এ যে একান্তই নিজের করা যুদ্ধের কথা। একা একা ভুল পথে, ভুল গলিতে হন্যে হয়ে হেঁটে বেড়ানো আর বার বার হোঁচট খাওয়ার গল্প বলতে কার ভালো লাগে! ভুলে ভরা নষ্ট অতীত তো বহু আগেই ছুড়ে ফেলেছি। পুনরায় তা খুঁড়ে বের করে পরিবেশ দুর্গন্ধ করার কী দরকার! পরে ভাবলাম, এই অতীতই তো আমার শক্তি, আমার এগিয়ে চলার সাহস আর প্রেরণা। এই গল্প যদি কাউকে জীবনের দুর্গম পথ মাড়ানোর খানিকটা সাহস যগায়, কেউ যদি এই গল্পের উদ্ভাসে সত্যের পথে চলার এবং সত্যের জন্যে আপসহীন হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়ে যায়—তাহলে তা তো হবে আমার জন্য বিরাট সার্থকতা ও অনন্য প্রাপ্তি। বলা তো যায় না, কোন গল্প কখন কার হৃদয় ছুঁয়ে যায় আর তার মনমানসে বিপ্লব ও পরিবর্তনের আকুল ঝড় তোলে!

সেই ছোট্টবেলা থেকেই আমার অবারিত বই গলাধঃকরণের অভ্যাস। সবাই মাঠে খেলতো, পর্দায় খেলা দেখতো, আর আমি নিশ্চুপ বইয়ের পর বই গলাধঃকরণ করতাম। বন্ধুরা আড্ডা দিতো, আমি বইয়ের জলতরঙ্গে অবগাহন করতাম। বন্ধুরা টিভির মোহে বুঁদ হয়ে থাকতো, আমি বইয়ের বিস্তীর্ণ জলরাশিতে নিরবধি সাঁতার কাটতাম, ডুবুরির মতো অতল গভীরে ডুব দিয়ে ঝিনুকের দেহ চিড়ে চিড়ে মুক্তা বের করে আনতাম। অশেষ পানির বুকে হাত-

পা সঞ্চালন করে করে হাঁসফাঁস ধরে যেতো। বই ছিল আমার প্রথম প্রেম, প্রথম ভালোবাসা। প্রিয় বলতে আমার যা-কিছু ছিল, তার সবই ছিল বইময়। আমি ছিলাম বইরাজ্যের এক উদ্যমদীপ্ত পথচারী। এমন কোনো বই ছিল না, যা আমি পড়তাম না। ইন্টার পাশ করার পর হুমায়ুন আজাদের "*আমার অবিশ্বাস*" বইটি গেলার পর পেটে খুব গ্যাস ফর্ম করে। খুব পানি খেয়ে, রেস্ট নিয়ে পেটের গ্যাস দূর হলো, কিন্তু মাথায় ঠিক ঠিক গ্যাস্ট্রিক হয়ে গেলো।

স্রষ্টা কি সত্যিই আছেন? নাকি সব মানুষের বানানো গালগপ্পো? হুম্ম? ধর্ম-টর্ম কি আসলে বানানো কিছু হাস্যকর "রিচুয়ালস" না? সমাজের গড়ে তোলা সংস্কারভীতু মন বলে ওঠে,

"না না, বাদ দাও তো ওসব ফালতু কথা। ওসব ভাবতে নেই।"

যুক্তি বলে, "না না তো করছো, ভিত্তি আছে এই বিশ্বাসের? ভীতু কাপুরুষ কোথাকার!"

মেজাজ খাট্টা হয়ে গেলো। কী করা যায়? কী করা যায়? পারি তো খালি একটাই কাজ। পড়া। তো, শুরু হয়ে গেলো আর কি!

পড়তে পড়তে আরজ আলী মাতুব্বর থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল, কুরআনের অনুবাদ থেকে শুরু করে বেদ-গীতা-বাইবেল কিচ্ছু বাদ থাকলো না। একটাই লক্ষ্য, যেটা সত্যি সেটাকে খুঁজে বের করবো, শুধু সেটাই মানবো। সত্যের সাথে কোনো আপস চলবে না, চলতে পারে না। ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুবাদ পড়ে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে এতদিন সব ফালতু বিশ্বাস মেনে এসেছি? হায় হায়! বন্ধ করো এসব। কেন মিলাদ পড়ো? নামায কেন পড়ো? মাজারে যাও কেন? মুসলিমই যদি হও তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কেন পড়ো না? নিজেকে মুসলিম বলো কী বুঝে? দেব-দেবীর পূজা করছো ভালো কথা, জেনেবুঝে করছো তো? ঘরে-বাইরে, বন্ধু-সহপাঠী, ঈদ-পূজায় সবখানে সবাইকে জ্বালিয়ে মারতাম। কেউ কিচ্ছু জানতো না। উত্তর দিতে পারতো না কেউ। সব্বাই হই-হই করে উঠতো "মাইরালামু-কাইট্টালামু" শোরগোল তুলে। সার্টিফিকেটধারী

বেকুবের দলকে চিনে গেলাম, চিনে গেলাম হাস্যকর জ্ঞানার্জনের সিস্টেমটাকে আর সেই সিস্টেম থেকে বিজবিজ করতে করতে বেরিয়ে আসা অন্ধ মেরুদণ্ডহীনদের। অন্ধবিশ্বাস আর বিনোদনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আবিষ্কার করে অনেকদিন অ-নে-কদিন হতাশায় ভুগেছি, আর তামাক পুড়ে ছাই করেছি। হতাশা ধীরে ধীরে ঘৃণাতে পরিণত হলো আর ঘৃণা ক্রমশ বেড়ে বেড়ে সৃষ্টি হলো অহংবোধ। খুব পড়তাম, আর যাকে যেখানে পেতাম ধুয়ে দিতাম। একেবারে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে, এসিড দিয়ে ঝলসে বিবর্ণ-রংহীন বানিয়ে ছেড়ে দিতাম। ভার্সিটির স্টুডেন্ট হলে তো কথাই নেই। চূড়ান্ত ওয়াশ দিতাম। মিয়া ভার্সিটিতে পড়ো! নামায পড়ো, পূজা করো, কেন করছো, কী করছো—না বুঝেই সব করবা, অজ্ঞতা নিয়ে রাতদিন চলবা আর সমাজে গিয়া ভাব নিবা যে "খুব শিক্ষিত হয়ে গেছি"— তা হবে না। অসহ্য লাগতো এই সমাজব্যবস্থা আর মানুষের অবিরাম ভণ্ডামি। এখনও লাগে।

এভাবে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষাও পার হয়ে গেলো। পড়া কিন্তু থামেনি। সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট কানেকশান। ধুমিয়ে চলছে ডকুমেন্টারি দেখা। এর মাঝেই একদিন *Atheism and Theism* নিয়ে এক লেকচার দেখা হয়ে গেলো। খ্রিষ্টান প্রফেসর এত সুন্দর করে লজিক দিয়ে সবকিছু বোঝালেন যে নড়েচড়ে বসলাম। ভাবনার নিস্তরঙ্গ পুকুরে অনেকদিন পরে তীব্র ঢিলের আঘাত! এইবার নিরপেক্ষ মন নিয়েই *Theism* এর লজিকের পেছনে লাগলাম। এর সাথে অ্যাকাডেমিক স্টাডি বিবর্তনবাদ নিয়ে ভুল ধারণাগুলোর দরজায় প্রচণ্ড আঘাত করতে সাহায্য করছিল। সংশয়বাদী মন বার বার বলে উঠতে চাইলো, স্রষ্টা কি সত্যিই আছেন তাহলে? আর অহংকারী মন বার বার তার টুঁটি চেপে ধরছিল।

কী যে কষ্ট এই নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা! কী যে যন্ত্রণা এই একা একা মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চালিয়ে যাওয়া! এত্ত এত্ত অসহায় লাগা সেই অনুভূতি আর দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধ করে যাওয়া। কেউ পাশে নেই। কেউ না। বার বার শুধু অহংকারী মন "ধর্ম ভুল, স্রষ্টা ভুল" বলে চিৎকার করে ওঠে আর বলে, "শোনো, তুমি যা জানো তা-ই ঠিক। আরও ভালো করে *Atheism* নিয়ে স্টাডি

করো, করতেই থাকো। এইসব সংস্কার, ফালতু সংস্কার।" দিনরাত মাথায় খালি আর্গুমেন্ট আর কাউন্টার আর্গুমেন্ট ঘুরতো। স্রষ্টা যে নেই সেটাই বা কনফার্ম করি কী দিয়ে? বিজ্ঞানীরা কী বলেন? ম্যাক্রো-ইভোলিউশানিস্টরা তো এই ব্যাপারে কিছু অপ্রমাণিত ধারণা কপচিয়ে উচ্ছৃঙ্খলদের উস্কে দেন। অথচ এই থিওরিগুলো থিওরিই শুধু। হাতেকলমে কাজ করে, অবজার্ভেশানে রেখে রেজাল্ট পাওয়ার জায়গা এটা নয়। বাকি থাকলো দর্শন। শুধু ভাবনা দিয়ে, চিন্তা-পরীক্ষা *(Thought Experiment)* করে যে কত্ত অসাধারণ জিনিস বের হয়ে আসে—তা সবাই জানে। আর বিজ্ঞানের শুরুটাও তো সেই দর্শন থেকেই। শুরু হলো দর্শন যুদ্ধ।

পড়তে পড়তে একটা উপলব্ধির শুরু হলো। আমি আসলে কিছুই জানি না, কিচ্ছু না। অহংবোধের পাহাড় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলো। দর্শন, যুক্তি আর কমনসেন্সের যুদ্ধে নাস্তিক্যবাদ হার মানলো। আমরা কোনোকিছু দেখে, ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে, বার বার দেখে তারপর একটা সিদ্ধান্তে যখন আসি, তখন সেটাকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বলি। এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কমনসেন্স আর ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই কাজে লাগাই।

ধরুন, আপনাকে আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা দেখালাম। তারপর বললাম আমার অ্যান্ড্রয়েডটা সৌদি আরবের মরুভূমিতে কুড়িয়ে পেয়েছি। এত বালি আর তেল এত্ত এত্ত মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে ঝড়ো হাওয়া আর জলে, তাপে আর শৈত্যে, তারপরে বজ্রের ধমধমাধম আঘাতে প্রথমে ধীরে ধীরে সিলিকন এবং প্লাস্টিক, তারপর আরও মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে অন্যান্য পার্টস, ব্যাটারি ইত্যাদিতে বিবর্তিত হতে হতে হতে হতে আজকের এই টাচস্ক্রিনড- অ্যান্ড্রয়েড ফোনে বিবর্তিত হয়েছে। *Samsung* লেখাটা যে খোদাই করা দেখছেন, সেটাও এভাবেই এসেছে, ভাই। বিশ্বাস করেন, ভাই। আপনার দুটি পায়ে পড়ি ভাই, প্লিজ বিশ্বাস করুন। আপনি বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু কেন? কেন করবেন না? কারণ, আপনার এতদিনের পর্যবেক্ষণ বলে এটা পুরোপুরিই অসম্ভব। তাই? একটা জড় পদার্থ থেকে আরেকটা জড় পদার্থ এভাবে তৈরি হওয়ার দাবিকে আপনি অসম্ভব বলছেন, যুক্তিসংগত প্রমাণ চাইছেন আমার দাবির!

ভালো ভালো, গুড, গুড! এই তো যুক্তিবাদী মন! যেখানে একটা জড় (তথা বালি, তেল ইত্যাদি) থেকে আরেকটা জড়ই (যেমন মোবাইল ফোন) তৈরি হতে পারে না, অসম্ভব, সেখানে জড় পদার্থ থেকে একটা কোষের মতো অসাধারণ সাজানো-গোছানো আবার পুনঃউৎপাদনক্ষম জৈবিক একটা যন্ত্র নিজে নিজে এমনি এমনি তৈরি হতে পারে? সম্ভব? আপনি বুদ্ধিমান হলে অলরেডি দুই দিকে মাথা নেড়ে “না, না” বলছেন, আর অন্ধ বিতার্কিক হলে উল্টো যুক্তি হাতড়ানো শুরু করেছেন।

প্রিয় অন্ধ বিতার্কিক, আপনি আপনার অন্ধকূপে হাতড়াতে থাকুন যদ্দিন সুখ পান, নিজে যা জানেন ভাব নিয়ে তাকেই শুধু সত্য বলে মেনে যান গলার জোরে এবং অহংবোধে, আর এভাবেই চিরকাল পড়ে থাকুন নিজ হাতে রচিত গোলকধাঁধায়। ততোক্ষণে আমরা আরেকটু আলোকিত হয়ে নিই, কেমন?

যেহেতু এত্ত সূক্ষ্ম জটিলতায় পরিপূর্ণ একটা জিনিস এভাবে নিজে নিজে তৈরি হয়ে যেতে পারে না, অনস্তিত্ব থেকে নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসতে পারে না, তার মানে আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এর একজন স্রষ্টা আছেন। তিনিই হচ্ছেন স্রষ্টা যিনি কোনো কিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন। এই দুনিয়া, প্রাণজগতের মাঝে এত্ত সুন্দর নিয়ম-শৃঙ্খলা আর ডিজাইন, নিখুঁত নিয়ম-কানুন মেনে চলা বিশাল মহাবিশ্ব থেকে শুরু করে ছোট্ট ইলেক্ট্রন-প্রোটন সবকিছু একজন অসাধারণ অপার্থিব অতিবুদ্ধিমান, জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবান ডিজাইনারের দিকেই ইশারা করছে অবিরাম।

কাজেই স্রষ্টা আছে, থাকতেই হবে।

আবার আরও একটু মন দিয়ে ভাবলেই বোঝা যায় যে, একজনের বেশি স্রষ্টা থাকা অসম্ভব। দর্শন, যুক্তি আর নিরপেক্ষভাবে কমন সেন্স খাটালেই বোঝা যায়, একজনের বেশি স্রষ্টা থাকলে এই বিশ্বের সুন্দর শৃঙ্খলা আর সাজানো-গোছানো প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনগুলো থাকতো না, এলোমেলো আর বিশৃঙ্খলায় ভরে থাকতো অণু-পরমাণু হতে সমগ্র মহাবিশ্ব। অনেক স্রষ্টার হিসেব বাদ দিই। শুধু দুজন সমান ক্ষমতাবান স্রষ্টা থাকলেই কিন্তু শক্তির প্রদর্শনী আর

যুদ্ধ লেগে যেতো। একজন ডানে বললে, আরেকজন বলতেন বামে। ফলে, শৃঙ্খলা কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতো না। টেনিস বল তিনবার অভিকর্ষের কারণে নিচে পড়তো, তো পরের দুইবার ওপরে উঠে যেতো, পরক্ষণেই আবার ডানে কিংবা বামে ছুট দিতো। কিন্তু তা তো না! সব তো কী সুন্দর নিয়ম-কানুন আর শৃঙ্খলা মেনে চলছে। সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তাহলে একজনই। তিনি অপার্থিব। সৃষ্টি অর্থাৎ যা কিছু অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে এসেছে—এমন কিছুর সাথেই তাঁর কোনো মিল নেই, সৃষ্টির কোনো গুণাবলি হুবহু তাঁর মাঝে নেই, থাকতে পারে না। সৃষ্টির উপাদান হতে তিনি পুরোপুরি আলাদা, ফলে এর বৈশিষ্ট্য হতেও তার স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কার। তিনি সৃষ্ট নন। কারণ তাঁকে যে সৃষ্টি করবে তাকে আবার আরেকজন দ্বারা সৃষ্ট হতে হবে, তাকে আবার আরেকজন দ্বারা, এভাবে চলতেই থাকবে অসীম পর্যন্ত। এর কোনো শেষ নেই।

সহজ করার জন্যে একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন, আপনি একজন ট্রাক ড্রাইভার। গাড়ির ইঞ্জিন রাস্তায় হঠাৎ বিগড়ে গেলো। ঠেলে ঠেলেই আধা মাইল দূরের গ্যারেজে নিতে হবে। ধাক্কা দেয়া দরকার। একজনকে ডাকলেন।

তিনি বললেন, "অক্কে ভাইয়া। কুনো সমিস্যা নাই। আমি ধাক্কা দিমু—তবে যদি আমার আরেকজন বন্ধু রাজি হয়, তাইলে দিমু; নইলে না।"

তার বন্ধুকে বললেন ব্যাপারটা। সেই বন্ধুও উত্তর দিলেন, "অক্কে ভাইয়া। সমিস্যা নাই কুনো। আমি ধাক্কা দিমু—তবে যদি আমার আরেকজন বন্ধু রাজি হয়, তাইলে দিমু; নইলে না।"

তর বন্ধুকেও খুঁজে বের করে অনুরোধ করলেন। তিনিও একই কথা জানালেন। তার আরেকটা বন্ধু রাজি হলে তবেই তিনি ধাক্কা দেবেন। এভাবে যদি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, বন্ধুর সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকবে—অসীম পর্যন্ত। ধাক্কা আর দেয়া হবে না। গাড়িও আর কোনোদিন আধমাইল দূরের গ্যারেজে যাবে না। ঠিক?

এভাবে স্রষ্টাও যদি আরেকজন স্রষ্টা দ্বারা, সেই স্রষ্টাও আরেকজন স্রষ্টা দ্বারা তৈরি হতে হয়, তাহলে তা অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে। সৃষ্টির মাঝে অসাধারণ ডিজাইনের ছাপ খুঁজে পাওয়া দূরে থাক, কোনো কিছু সৃষ্টিই তো হবে না আর কখনো। কিন্তু সৃষ্টি যেহেতু আছে, তাতে স্রষ্টার অতিবুদ্ধিমত্তা আর প্রজ্ঞার ছাপও বুদ্ধি খাটালেই পাওয়া যায়, তার মানে স্রষ্টাও আছেন। তবে মনে রাখতে হবে, সেই স্রষ্টা আমাদের এই জীবনে দেখা কোনো কিছুর মতোই না।

স্রষ্টা আছেন, তবে সেই স্রষ্টা আমাদের দেখা কোনো কিছুর মতো না, কোনো সৃষ্টির মতো না। কোনো মূর্তির মতো না, ফুটবলের মতো না, আমাদের মতো হাত-পা চোখওয়ালা না। মোটকথা আমরা যেভাবে ভাবতে পারি, তিনি সে রকম নন। খেয়াল করলেই দেখবো, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বাইরে, সৃষ্টিজগতের বাইরে ভাবতেই পারি না। কল্পনায় একটা নতুন ধরনের প্রাণী তৈরি করার চেষ্টা করতে পারেন। তাহলেই দেখবেন সেখানে আপনি শুধু আপনার পরিচিত জগৎ থেকেই নানান রকমের উপাদান নিয়ে প্রাণীটাকে সাজাচ্ছেন। কিন্তু একটু আগেই আমরা বুঝেছি যে, স্রষ্টা সৃষ্টিজগতের কোনো উপাদান দ্বারা তৈরি হতে পারেন না, ফলে সৃষ্টিজগতের উপাদানগুলোর সকল বৈশিষ্ট্য হতেই তিনি পুরোপুরি স্বতন্ত্র। একই কারণে তাঁকে থাকতে হবে সৃষ্টি থেকে আলাদা। তাঁকে হতে হবে অসম্ভব প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, শাশ্বত, সর্বশক্তিমান এবং স্বনির্ভর।

অসম্ভব প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান এবং সর্বশক্তিমান হওয়া ছাড়া এই সুবিশাল নিউক্লিয়ার শক্তি বিকিরণকারী নক্ষত্র, জটিল অণু-পরমাণু, আর ছোট্ট আণুবিক্ষণীক কোষ হতে সমগ্র মহাবিশ্বের এত সুন্দর নিয়ম-কানুন তৈরি করা সম্ভব নয়। তিনি স্বনির্ভর এবং কখনোই কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি অনাদি (সময়ের ওপর অনির্ভরশীল, পরম) ও স্বনির্ভর না হলে কার ওপরে নির্ভর করবেন? তিনি কারও ওপরে নির্ভর করলে সেই সত্তা আবার আরেকজনের ওপরে নির্ভর করার প্রশ্ন চলে আসে, যা কিনা অবিরাম চলতেই থাকবে, ফলে মহাবিশ্বের কিছুই আর অস্তিত্বে আসতে পারবে না। একই ভাবে তিনি *Self-fulfilling* না হলে তাঁকে কে *Fulfill* করবে? তিনি কারও থেকে জন্ম নেননি।

কারণ, কারও কাছ থেকে জন্ম নিলে জন্মদাতাকে কে জন্ম দিলো এ রকম প্রশ্ন আবার অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে। একই ভাবে তিনি কাউকে জন্মও দেননি। জন্ম দেয়া বা জন্ম নেয়া জীবের তথা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। স্রষ্টাকে অবশ্যই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হতে পুরোপুরি মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে।

ওপরে বর্ণিত গুণগুলো থাকতে হবে বলতে বুঝানো হচ্ছে এগুলোই একজন স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য। তিনি কোনোভাবেই সৃষ্টির মতো নন। একদম সহজে বলতে গেলে বলতে হয়, একটা টেবিল বাতাস দেয় কি না, তা ঘূর্ণিঝড় তৈরি করে কীভাবে— এই প্রশ্ন যেমন অবান্তর এবং ভুল, ঠিক তেমনি একজন স্রষ্টার স্রষ্টা কে, তাঁকে কে পূর্ণ করে, তাঁর আগে তাহলে কী ছিল—সেই প্রশ্নগুলোও সব অবান্তর। কারণ, "টেবিলটা বাতাস কেমন দেয়?" এই প্রশ্নটাই যেমন অপ্রাসঙ্গিক, টেবিলের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী, ঠিক একই ভাবে স্রষ্টাকে কে তৈরি করলো, তাঁর আগে কী ছিল, তিনি কী খেয়ে জীবনধারণ করেন—এই প্রশ্নগুলোও একই ভাবে অবান্তর এবং ভুল।

স্রষ্টা কি এমন একটা পাথর বানাতে পারেন, যা তিনি নিজেই তুলতে পারবেন না? কিংবা তিনি কি নিজেকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দিতে পারেন? কিংবা তিনি কি খারাপ হতে পারেন? মিথ্যা বলতে পারেন? উত্তর হচ্ছে, না। কারণ, এর প্রতিটাই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী, স্ববিরোধী। তিনি এমন কিছু করেন না, যা স্ববিরোধী। অনেকে বলতে পারে, এই কাজগুলো করতে না পারলে তিনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা নন।

আবারও স্ববিরোধী ভুল সিদ্ধান্ত। সহজ করার জন্যে বলি, কেউ যদি আপনাকে একটা টেনিস বল দেখিয়ে বলে এই বলটা কাঠের আলমারি তৈরি করতে পারে না, ফলে এটা টেনিস বলই নয়, এমনকি এই টেনিস বলটার অস্তিত্বও নেই। তাহলে আপনি হা-হা-হা করে হেসে ফেলবেন। কেন হাসবেন? তার যুক্তিতে ভুল কোথায়? ভুল এখানেই যে টেনিস বলটার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার জন্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বোকাটা টেনিস বলটার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে, যা থাকলে এটা আর টেনিস বলই থাকবে না, হয়ে যাবে কাঠমিস্ত্রি!

একই ভাবে স্রষ্টার ক্ষেত্রেও সব ধরনের বৈশিষ্ট্য আরোপ করার ব্যাপারটা খাটে না।

বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে রাখা যাক :

১. স্রষ্টা এক। ফলে, পূজনীয় এবং উপাস্য হিসেবে শুধু তাঁকেই মেনে নিতে হবে। কারণ, তিনি ব্যতীত আর সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। আর তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল কোনো কিছুই পূজনীয় এবং উপাস্য হতে পারে না; বরং উপাস্য এবং পূজনীয় শুধু তিনিই, যিনি সবাইকে সৃষ্টির পর সবকিছু দেন, রক্ষা করেন কারও ওপর নির্ভরশীল না হয়েই।

২. তিনি সর্বশক্তিমান। কারণ, এত বিশাল গ্রহ, সুবিশাল নক্ষত্র নীহারিকা থেকে শুরু করে কোষের জটিলতা পর্যন্ত যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে অন্যরকম শক্তির অধিকারী হতেই হবে, যা কিনা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. অত্যন্ত বুদ্ধিমান, যা কল্পনা করার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

৪. স্বনির্ভর। কারও ওপর নির্ভরশীল নন। সৃষ্ট নন। জন্ম নেননি। জন্ম দেননি। সৃষ্টি হওয়া, জন্ম নেয়া নামক নির্ভরশীলতা থেকে তিনি মুক্ত।

৫. তিনি সৃষ্টির মাঝে থাকেন না। তিনি সৃষ্টি হতে আলাদা। তিনি পরিচিত কোনো কিছুর মতোই নন।

মোটামুটিভাবে স্রষ্টাকে আমরা বুঝে ফেললাম। স্রষ্টা তো মানুষকে পথ দেখানোর জন্যে, মানুষকে এই পৃথিবীর জীবনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠিয়েছেন শুনেছি। এবার সেগুলো যাচাই করে দেখি কোনটা স্রষ্টাকে পুরোপুরি সঠিকভাবে বর্ণনা করে, ফলে সত্যকে আংশিকভাবে নয় বরং পুরোপুরি ধারণ করে। আশেপাশে পাওয়া ধর্মগুলোকেই খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে কী পেয়েছিলাম—সেটা একবার দেখা যাক।

কিছু ধর্মগ্রন্থে—'স্রষ্টা এক এবং উনাকে ছাড়া আর কারও বা কোনো বস্তুর পূজো করা যাবে না' উল্লেখ থাকলেও অনেক সাংঘর্ষিক কথাও রয়েছে। সেই ধর্মে তাই প্রাণীপূজা বা বস্তুপূজার পাশাপাশি আছে অবতারবাদ। অবতারবাদ অনুযায়ী স্রষ্টা নিজেকেই মানুষরূপে দুনিয়াতে পাঠান। স্রষ্টা নিজে মানুষ হওয়ার সমস্যা আছে। এটা উনার স্বনির্ভর বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। কারণ, মানুষ স্বনির্ভর নয়। তাকে সৃষ্টি হতে হয়। জন্ম নিতে হয়। একজন স্রষ্টা একই সাথে সৃষ্ট আবার স্রষ্টা দুটোই হতে পারেন না যুক্তি অনুযায়ীই। তিনি জন্মও নিতে পারেন না। আবার মানুষকে খাবারসহ অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। স্রষ্টা অনির্ভরশীল, স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটা পূর্বেই বলা হয়েছে। কাজেই এই ধর্ম কোনো যুগ বা কালে সত্যিকারের পথপ্রদর্শক হিসেবে যদি স্রষ্টার কাছে থেকে এসেও থাকে, তবুও এটা আর আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু এটা পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ সত্যকে ধারণ করছে না, যুক্তিবিরোধী সাংঘর্ষিক কথাবার্তা আছে, সেহেতু এখানে মানুষের হাত লেগেছে, বা সম্পাদিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আরেকটি ধর্মগ্রন্থে বলা হচ্ছে স্রষ্টার সন্তান আছে। তাঁর নাম হচ্ছে যিশু (বা ঈসা নবী আ.)। যিশু মানুষ ছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি, স্রষ্টার সন্তানই হতে পারে না। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্যবিরোধী। যীশু স্রষ্টা হতে পারেন না, কারণ তিনি মানুষ ছিলেন। মানুষ স্বনির্ভর না, তাকে সৃষ্টি হতে হয়। একজন স্রষ্টা একই সাথে সৃষ্ট আবার স্রষ্টা দুটোই হতে পারেন না যুক্তি অনুযায়ীই। এছাড়াও, ইতিহাস বলে এরা নিজেরাই ভোটাভুটির মাধ্যমে বাইবেলকে ইচ্ছেমতো বদলে নিয়েছে।

বাইবেলের বদলানোর কাজ অনেকজন করায় এর অনেক রকম সংস্করণ পাওয়া যায়। এছাড়াও বাইবেলে দেখা যায় যিশু স্রষ্টার কাছে দু'আ করেছেন, প্রার্থনা করেছেন। স্রষ্টার কাছে যে দু'আ করে, সে কীভাবে স্রষ্টা বা পূজনীয় হতে পারে? পূজনীয় তো শুধু একজনই যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি স্রষ্টা। কাজেই এই ধর্ম কোনো যুগ বা কালে সত্যিকারের পথপ্রদর্শক হিসেবে স্রষ্টার পক্ষ থেকে এসে থাকলেও, অদল-বদল আর মনুষ্য সম্পাদনার কারণে এটাও আর

গ্রহণযোগ্য নয় আমার কাছে। ফলে, এটাও আমি মানতে পারিনি। আরেকটি ধর্মের অনুসারীদের অনেকে বিশ্বাস করেন উযাইর স্রষ্টার সন্তান, ফলে উযাইর উপাস্য-পূজনীয়, যা আবারো স্ববিরোধী। ফলে, ঝামেলা আছে। আবার তাদেরই অনেকে বিশ্বাস করেন এই ধর্মকে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের বাইরের কেউ গ্রহণ করতে পারে না। নিয়ম নেই। এর মূল ধর্মগ্রন্থটা একটা নির্দিষ্ট সময়ে, শুধু নির্দিষ্ট একটি জাতির জন্যে প্রেরিত হয়েছিল, যার কার্যকারিতা এই যুগের সব মানুষের জন্যে নয়। তাই আমার জন্যে এটি প্রযোজ্য নয় মোটেও। সাথে যুক্তির সংঘর্ষ, ফলে বিকৃতির আশঙ্কা তো আছেই। কিছু ধর্মের ব্যাপারে যটুক জেনেছি, বুঝেছি—একজন মানুষের দর্শন নিয়ে এই ধর্ম বেড়ে উঠেছে, স্রষ্টার ব্যাপারে খুব বেশি বিস্তারিত কিছু সেইসব ধর্মে আমি খুব বেশি পাইনি।গ্রহণ এবং যাচাই করবার মতো খুব বেশি তথ্য তাতে ছিলও না। এমনকি মূল ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টা নিজে কিছুই বলেননি, নিজের বাণী বলে দাবিও করেননি। ফলে, সেটা স্রষ্টার পক্ষ থেকে ছিলই না কখনো।

ফাইনালি যে ধর্ম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হলো, তার মূল ধর্মগ্রন্থের নাম আল-কুরআন। আল-কুরআন দাবি করছে, এটা স্রষ্টার বাণী এবং স্রষ্টা শুধু একজন। এটি বলছে, স্রষ্টার আকার কল্পনা করা যায় না। তিনি কোনো কিছুর মতো নন। তিনি স্বনির্ভর। কারও মুখাপেক্ষী নন, নির্ভরশীল নন কোনো কিছুর ওপর। তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। এটা সব ক'টা যুক্তিকেই পূর্ণভাবে সমর্থন করছে। এছাড়াও এটা মানুষের সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের কাছে আসা অন্যান্য বাণীর (*Revelation*) কথা বর্ণনা করছে, বার বার বার্তাবাহক আর বাণী পাঠিয়ে পথ দেখানোর পরও মানুষের অন্য দিকে ছুটে যাওয়া, ভুল উপাস্য (যিশু, মূর্তি, মাজার, কুপ্রবৃত্তি ইত্যাদি) নির্বাচন, ভুলে ডুবে যাওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করছে। এটা এই দাবিও করছে যে, এটা জগতের ধ্বংস ও মহাপ্রলয় পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

এই দাবির পর ১৪০০ বছর পার হয়ে গেছে, এখনো একটি অক্ষর এদিক-ওদিক হয়নি। কেউ এটা প্রমাণ করতে পারেনি অনেক চেষ্টার পরেও। এর মাঝে স্ববিরোধী বা সাংঘর্ষিক কোনো কথা তো নেই-ই, বরং আছে স্থান-

সূচীপত্র

কালহীন সুগভীর প্রজ্ঞা আর জ্ঞান। কেউ যখন বলে এখানে স্ববিরোধী বা সাংঘর্ষিক কথা আছে, সে আসলে আরবি না জানার ফলে, আয়াতের কনটেক্সট না জানার কারণেই বলে। ভালোভাবে পড়াশোনা করার পর আর কোনো সন্দেহ থাকে না। আর এই কুরআনেই আল্লাহ চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।"[১]

মহান স্রষ্টা এই চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণ বার্তা আল-কুরআন এবং যার ওপর এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই বার্তাবাহকের (ﷺ) মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন করে যাচাই বাছাই করে এই পথ গ্রহণ করার আহ্বান জানান দুনিয়ার সব মানুষকে, প্রতিটি মানুষকে। এই পথের নাম ইসলাম। এই শান্তির পথকে, এই একমাত্র টিকে থাকা পরিপূর্ণ ও সত্যিকার পথকে যেসব মানুষ খুঁজে, জেনে, মেনে চলে নিজেকে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পিত করে দেন, তাদের মুসলিম বলে। কাজেই, একজন মানুষ মুসলিম হতে হলে তাকে অবশ্যই স্রষ্টা আর তাঁর বার্তাবাহক মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কথা পড়ে, বুঝে, জেনে মেনে হতে হবে। এখানে কোনো শর্টকাট নেই। জন্মসূত্রে নামের আগে একখানা 'মোহাম্মদ' থাকলেই সে স্রষ্টার কাছে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। এইখানে (ইসলামি) জ্ঞানার্জনকে এবং সেই অনুযায়ী জীবনধারণকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সব সত্য জেনে-বুঝেও যেসব মানুষ কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব এবং অনুসরণ, সমাজের ভয়, অহংকার, নির্যাতন-পীড়নের শঙ্কা ইত্যাদি নানা রকম অজুহাতে এক স্রষ্টার পাঠানো এই জীবনব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না, বিশ্বাস করলেও নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করতে চায় না, বরং বিরোধিতা করে যায়

---

[১] আল-কুরআন, সুরা মায়িদা, ৫ : ৩

অবিরাম, নিশ্চয়ই তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে। তাদের চোখের ওপর ঘন কালো আবরণ পড়ে গেছে, তাই তারা সত্যকে দেখে না। তাদের অন্তর বেঁকে গেছে, তাই তারা অন্তর দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। আর সত্যের বাণী কখনোই তাদের কর্ণকুহর ভেদ করে ভেতরে পৌঁছে না। উপর্যুক্ত শেষোক্ত শ্রেণী, অর্থাৎ যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং নিজেদের মুখের ফুৎকারে সত্যের প্রদীপকেই চিরতরে নিভিয়ে দিতে চায়, অবিশ্বাসীদের তুলনায় এসব অথর্ব ও অর্বাচীন ভণ্ডদের (*hypocrites*) শাস্তি হবে সকরুণ এবং অত্যন্ত ভয়াবহ। এখানে বিচারকে করা হয়েছে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, নিখুঁত হতে নিখুঁততর। পৃথিবীর বুকে একমাত্র এটাই পরিপূর্ণ সত্যকে ধারণ করে চলেছে। কাজেই, এটাই হচ্ছে এখন পর্যন্ত টিকে থাকা স্রষ্টাপ্রদর্শিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একমাত্র গ্রহণযোগ্য সঠিক সত্য পথ। আমার এই পথে যাত্রা শুরু হলো। হাঁটতে হাঁটতে জানলাম কুরআন নিজেই একটা মিরাকল। শেষদিন পর্যন্ত মানুষের এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এর মিরাকল আবিষ্কার হতেই থাকবে, হতেই থাকবে। এর সবচাইতে বড় অসাধারণত্ব হচ্ছে এর অলৌকিক ভাষাশৈলী। আরবি না জানলে এর সত্যিকার অলৌকিকত্ব বোঝা প্রায় সম্ভবই না। সেই আরবি শেখার পথে আমি মাত্র যাত্রা শুরু করলাম। ইসলাম নামের সেই পরশপাথরটি আমাকে বদলে দিয়েছে, প্রতিদিনই বদলে দিচ্ছে একজন সোনালি মুসলিমে, সত্যিকার মুসলিমে। এখন শুধু পথটা ধরে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকা, নিজেকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করতে থাকা, মানুষকে সত্যটা জানানোর চেষ্টা করতে থাকা।

অনেক কথা তো বললাম। ইসলামে আসার পর সেই হই-হই রই-রই করে মারতে আসা মানুষগুলোকে, সমাজকে যখন ইসলামের কথাগুলো হাসিমুখে বলতে গেলাম, জানাতে গেলাম সত্যের কথা, বোঝাতে গেলাম, সেই তারা এরপর কী করলো, জানেন? ভাবতেও পারবেন না! থাক, আজ না। এই বিশাল ভণ্ড আর দূষিত সমাজের কথা, সেই গথাম সিটির গল্প আরেকদিন বলবো ইন শা আল্লাহ। আপনি যদি এই দুনিয়ার কোনো মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকেও সেই সুমহান সত্যের পথে স্বাগতম। স্বাগতম ইসলামের

পথে। স্বাগতম দুনিয়ার চাকচিক্য, প্রদর্শনী, অশ্লীলতা আর গোলামি থেকে মুক্তির পথে। স্বাগতম অবিকৃত আর সুন্দরতম মানবতার পথে।

স্বাগতম স্রষ্টার নিজের দেখানো, একমাত্র অস্তিত্বশীল স্বীকৃত সত্যের পথে।

অপ্রমাণ্য নাস্তিকতা[২]

আসিফ আদনান

১.

নন-প্র্যাকটিসিং ইহুদি পরিবারে জন্ম নেয়া হাঙ্গেরিয়ান-অ্যামেরিকান পলিম্যাথ জন ভন নিউম্যান ছিলেন একজন অ্যাগনস্টিক (অজ্ঞেয়বাদী)। অর্থাৎ ভন নিউম্যান মনে করতেন স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে নাকি নেই, এ প্রশ্নটার উত্তর জানা সম্ভব না, অথবা সম্ভব হলেও জানাটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। কিন্তু প্যানক্রিয়েটিক ক্যান্সারে ভুগতে থাকা ভন নিউম্যান মৃত্যুর কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত নেন একজন ক্যাথলিক পাদ্রিকে ডেকে খ্রিষ্টাধর্ম গ্রহণ করার। স্বাভাবিকভাবেই ভন নিউম্যানের সিদ্ধান্ত তার পরিবার ও বন্ধুদের অবাক করে। আজীবন লালিত অজ্ঞেয়বাদকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসকে গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাওয়া হলে ভন নিউম্যান জবাব দেন—

"Pascal had a point" ["প্যাসকেলের কথায় যুক্তি আছে।"]

ভন নিউম্যান এখানে ফরাসি গণিতবিদ, দার্শনিক এবং পদার্থবিজ্ঞানী ব্লেইয প্যাসকালের বিখ্যাত 'বাজি'র কথা বলছেন। *Pascal's Wager* নামে খ্যাত এই যুক্তির মূল বক্তব্য হলো:

যেহেতু কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব না, তাই স্রষ্টায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ এক অর্থে একটি বাজিতে অংশগ্রহণ করে। কেউ বেছে নেবে স্রষ্টা আছেন।

---

[২] অপ্রমাণ্য/ অ-প্রমাণ্য : *Unprovable*, 'যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়' অর্থে ব্যবহৃত।

কেউ বেছে নেবে স্রষ্টা নেই। গাণিতিকভাবে এ ক্ষেত্রে যেকোনো মানুষের সঠিক বা ভুল হবার সম্ভাবনা হলো ১/২।

ব্যাপারটা অনেকটা কয়েন দিয়ে টস করার মতো। হেড বা টেইলস (আমরা ছোটবেলায় ক্রিকেট খেলার সময় বলতাম "শাপলা" আর "ফলমূল")। আপনি কয়েনের যেকোনো একটি দিক বেছে নেবেন। আপনার জেতার সম্ভাবনা থাকবে ১/২।

এখন দেখা যাক সম্ভাব্য এই দুটি ফলাফলের ক্ষেত্রে লাভ ও ক্ষতি কী রকম।

স্রষ্টা আছেন : বিশ্বাসীরা দুনিয়াতে স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার কারণে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ তাদের কিছু পরিমাণ আনন্দ, বিনোদন এবং সুখ পরিত্যাগ করতে হবে। এটাকে আমরা ক্ষতি হিসেবে ধরবো। তবে যেহেতু আমরা জানি, দুনিয়ার জীবন সীমিত, তাই বিশ্বাসীদের এই ক্ষতি হবে সীমিত। আর এই সীমিত ক্ষতির পরিবর্তে বিশ্বাসী মৃত্যুর পর পাবে অসীম সময় ধরে পুরস্কার। যেহেতু আখিরাতের জীবন অসীম।

অন্যদিকে অবিশ্বাসী দুনিয়াতে স্রষ্টার বাধানিষেধ না মেনে ইচ্ছেমতো যেকোনো কিছু করার কারণে সীমিত পরিমাণ লাভ পাবে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাকে অসীম সময় ধরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ যদি স্রষ্টা থাকেন, তাহলে সীমিত ক্ষতির বিনিময়ে বিশ্বাসী পাবে অসীম লাভ। আর সীমিত লাভের বিনিময়ে অবিশ্বাসী পাবে অসীম ক্ষতি।

স্রষ্টা নেই : যেহেতু মৃত্যুর পর আর কোনো কিছু নেই এবং দুনিয়ার জীবনই সব, তাই ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলার কারণে বিশ্বাসীদের দুনিয়ার সীমিত জীবনে সীমিত পরিমাণ ক্ষতি হবে। আর বাধানিষেধ না মেনে ইচ্ছেমতো যেকোনো কিছু করার কারণে দুনিয়ার জীবনে অবিশ্বাসীরা সীমিত পরিমাণ লাভ অর্জন করবে। সুতরাং একজন বিশ্বাসীর জন্য এই বাজিতে সম্ভাব্য ফলাফলের সেট দুটো—{সীমিত সময় জুড়ে ক্ষতি, তারপর অসীম সময় জুড়ে পুরস্কার} অথবা {সীমিত সময় জুড়ে ক্ষতি, তারপর শূন্যতা}। একজন

অবিশ্বাসীর জন্যও সম্ভাব্য ফলাফল দুটো—{সীমিত সময় জুড়ে লাভ, তারপর অসীম সময় জুড়ে শাস্তি} অথবা {সীমিত সময় জুড়ে লাভ, তারপর শূন্যতা}।

সুতরাং যদি স্রষ্টা না থাকে তাহলে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী দুজনের জন্যই মৃত্যুর পর ফলাফল এক| শূন্যতা। কিন্তু যদি স্রষ্টা থাকেন তাহলে বিশ্বাসীর পুরস্কার অসীম, অন্যদিকে অবিশ্বাসীর শাস্তি অসীম। তাই বাজি বা কয়েন টসের সময় একজন বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারবে তাকে মূলত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে সসীম আর অসীমের মধ্যে। প্যাসকেলের বক্তব্য হলো, সীমিত লাভের জন্য অসীম সময় জুড়ে শাস্তির ঝুঁকি নেয়া অযৌক্তিক। এ কারণে সম্ভাব্য ফলাফলের বিবেচনায় গাণিতিক ও যৌক্তিকভাবে "স্রষ্টা আছেন" এই অবস্থান গ্রহণ করা অধিকতর নিরাপদ।

প্যাসকেলের প্রায় ৬০০ বছর আগে মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ জিয়াউদ্দিন আব্দুল মালিক আল-জুয়াইনি একই ধরনের যুক্তির ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া আমাদের দেশের ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর ক্ষেত্রে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা শোনা যায়, যেখানে মূলত এই যুক্তিই একটু অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

একজন নাস্তিক ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে প্রশ্ন করলো, "আপনি যে এত ধর্ম-কর্ম করেন, এত বিধিনিষেধ মানেন, যদি মরার পর দেখেন, আল্লাহ নাই, তাহলে কেমন হবে? এসবই কি তাহলে লস না?" ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ জবাবে বললেন, "যদি তুমি মরার পর দেখো, আল্লাহ আছে তাহলে তোমার যা হবে সেই তুলনায় আমার লস কিছু না।"

তাই প্যানক্রিয়েটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত ভন নিউম্যান ঠিক কোন অবস্থান থেকে বলেছিলেন *"Pascal had a point"*, তা বোধগম্য। একজন মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে একটি ওষুধের কথা বলা হলো, যেটা খেলে ৫০% সম্ভাবনা হলো মারা যাবার আর ৫০% সম্ভাবনা হলো সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভের। এ ক্ষেত্রে ওষুধটি খেলে রোগীটির হারানোর কিছু থাকে না, কিন্তু পাবার সবকিছুই থাকে। এই সহজ সমীকরণ ভন নিউম্যানের মিস করার কথা না। প্যাসকেলের বাজি স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে

যুক্তি না। তবে নিঃসন্দেহে নাস্তিকরা বিশ্বাসীদের অবস্থানকে অযৌক্তিক বলে যে দাবি করে, তার বিরুদ্ধে সহজবোধ্য এবং শক্তিশালী একটি জবাব। আর একই সাথে নাস্তিকতার অবস্থানের যৌক্তিকতার ব্যাপারেও একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

২.

১৯৫৩ সালে *Look* ম্যাগাজিনের একটি সাক্ষাৎকারে বিখ্যাত নাস্তিক বার্ট্রান্ড রাসেলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "ঠিক কী ধরনের প্রমাণ পেলে আপনি বিশ্বাস করবেন স্রষ্টা আছেন?" জবাবে রাসেল বলেছিল, "যদি আমি আকাশ থেকে স্রষ্টার গায়েবি কণ্ঠ শুনতে পাই, আর যদি এই কণ্ঠ আগামী ২৪ ঘণ্টায় আমার সাথে কী কী ঘটবে তা হুবহু ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে, তাহলে আমি বিশ্বাস করবো, স্রষ্টা আছেন।"

বলাবাহুল্য আস্তিক বা নাস্তিক কেউই বিশ্বাস করে না যে, প্রতিটি ব্যক্তির সাথে স্রষ্টা এভাবে কথোপকথন করবেন এবং স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দেবেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কার মুশরিকদের কাছে তাওহিদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখনো তাদের অনেকেই রাসেলের মতোই দাবি করেছিল।

"কেন একজন ফেরেশতা আমাদের চোখের সামনে আসমান থেকে নেমে আসে না?" "কেন আমাদের চোখের সামনে আসমান থেকে একটি কিতাব নেমে আসে না?" "কেন তোমার রব আসমান থেকে একটি সিঁড়ি নামিয়ে দেন না, আর তুমি সেই সিঁড়ি দিয়ে আসমানে উঠে যাও না?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে এটা অবিশ্বাসীদের অবস্থানের ব্যাপারে একটা ধারণা দেয়। যদিও অনেক কিছুই তারা চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করে, কিন্তু স্রষ্টার ক্ষেত্রে তারা চাক্ষুষ প্রমাণ চায়। মিরাকল বা কারামতপূর্ণ ঘটনা দেখতে চায়। এ ক্ষেত্রে আরও একটি কথাও বলা যায়—যদি নাস্তিকরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত মোটা দাগের প্রমাণ দাবি করে, তাহলে যুক্তির দাবি হলো, স্রষ্টার অনস্তিত্বের ব্যাপারে তাদের দাবি প্রমাণ করার জন্য তাদের একই ধরনের মোটা দাগের

কোনো প্রমাণ উপস্থাপন আবশ্যক। যদিও অতি সূক্ষ্ম দাগের কোনো ইতিবাচক প্রমাণও *(Positive proof)* নাস্তিকরা আজ পর্যন্ত উপস্থাপন করতে পারেনি।

৩.

ভন নিউম্যান এবং রাসেলের এ দুটো ঘটনা থেকে মূলত যা প্রমাণ হয় তা হলো, শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার ব্যাপারে অবস্থান—সেটা আস্তিকতা হোক বা নাস্তিকতা হোক—একটা দার্শনিক বা দর্শনগত অবস্থান। এটা কোনো বৈজ্ঞানিক অবস্থান না। কারণ, আমাদের বিজ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব না। একজন মানুষ এই দুটো অবস্থানের কোনটি গ্রহণ করছে, সেটা থেকে বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান সম্পর্কেও (পার্থিব বিচারে) কোনো ধারণা করা যায় না। ভন নিউম্যান কিংবা প্যাসকেল নিশ্চিতভাবেই অশিক্ষিত, মূর্খ ব্যক্তি ছিলেন না। তারা যুক্তি, বিজ্ঞান বুঝতেন না এমন দাবি করার চিন্তা করাটাও হাস্যকর। অন্যদিকে ম্যাথমেটিশিয়ান এবং দার্শনিক রাসেলকেও পার্থিব বিচারে মূর্খ-আহাম্মক বলা যায় না।

স্রষ্টায় বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় নিজ বিচার, বিবেচনা ও বোধবুদ্ধির আলোকে। আর আধুনিক মিলিট্যান্ট বা নিউ অ্যাথিস্টরা যতই চিৎকার চেঁচামেচি করুক না কেন, বিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম না। সুতরাং যারাই শুধু বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আস্তিকতা কিংবা নাস্তিকতাকে সঠিক প্রমাণ করতে চান তারা দু-দলই একটি মৌলিক ভুল করেন।

বিজ্ঞান শুধু কিছু পর্যবেক্ষণকে আপনার সামনে তুলে ধরতে পারে, যা স্রষ্টার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্বের প্রশ্নের ব্যাপারে নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ। আস্তিক আর নাস্তিকরা এই পর্যবেক্ষণগুলোকে নিজ অবস্থানের পক্ষে ব্যবহার করে। কিন্তু তারা যে উপসংহার উপস্থাপন করে, তা তাদের নিজ নিজ ব্যাখ্যা; বিজ্ঞান না। নাস্তিকরা এই ভুলটা অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবেই করে, কারণ দর্শনের দিক থেকে নাস্তিকতার দাবি প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক প্রমাণ বা যুক্তি উপস্থাপন করতে দশকের পর দশক ধরে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাদের

জন্য বিজ্ঞানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা, বিজ্ঞানমনস্কতার ভান করাটাই লাভজনক।

আর আস্তিকদের একটা বড় অংশ একই ভুল করে নাস্তিকদের এই আপাত বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। নাস্তিকদের জবাব দেয়ার জন্য বিজ্ঞান ব্যবহার করা থেকে শুরু হলেও অনেকেই এই অবস্থানে চলে যান, যেখানে তারা বিশ্বাসকে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা চেষ্টা করেন। আর এটাও বিশ্বাস এবং যুক্তি—উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ভুল।

৪.

তাহলে উপায় কী? এই বিতর্কের মীমাংসা হবে কী করে?

একজন মুসলিম আপনাকে বলবে, এর মীমাংসা হবে মৃত্যুর পর।

“...অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; তখন আমি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবো যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছো।” [৩]

কিন্তু একজন নাস্তিক কী বলবে?

বার্ট্রান্ড রাসেল কিংবা মক্কার কুরাইশরা যে রকমের মিরাকল দাবি করেছে, সেগুলোর অবর্তমানে নাস্তিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শুধু একটি জিনিসই এ বিতর্কের মীমাংসা করতে পারে। আর তা হলো মৃত্যুপরবর্তী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণ, যাকে অনেকে এস্ক্যাটোলজিকাল ভেরিফিকেশান *(Eschatological Verification)* বলে থাকেন।

সে ক্ষেত্রে মৃত্যু পরবর্তী দুটো সম্ভাবনা থাকে:

১) স্রষ্টার অস্তিত্ব তথা পরকাল/আখিরাত এবং

---

[৩] আল-কুরআন, আলি ইমরান, ৩ : ৫৫

২) কোনো চেতনা, কোনো কিছুর অস্তিত্ব না থাকা; শূন্যতা *(Oblivion)*

যদি #১ সত্য হয় তাহলে বিশ্বাসীরা সঠিক প্রমাণিত হবে।
আর যদি #২ সত্য হয় তাহলে নাস্তিকরা সঠিক প্রমাণিত হবে।

মজার ব্যাপারটা হলো যদি সম্ভাব্য ফলাফল এই দুটোই হয়, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে যা বলতে পারি, তা হলো:

ক) বিশ্বাসীরা যদি ভুলও হয়, তবুও তারা কখনোই জানতে পারবে না যে, তারা ভুল।
খ) নাস্তিকরা যদি ঠিকও হয়, তবুও তারা কখনোই জানতে পারবে না যে, তারা ঠিক।[৪]

অর্থাৎ বিজ্ঞানের দিক থেকে এবং দর্শনের দিক থেকে নাস্তিকতাকে প্রমাণ করা অথবা ভেরিফাই করা অসম্ভব। নাস্তিকতা অ-প্রমাণ্য! আমাদের দেশীয় অধিকাংশ নাস্তিক—যারা মুক্তমনা জাতীয় ব্লগ, আরজ আলী মাতুব্বর-হুমায়ুন আজাদের বই পড়ে এবং ডকিন্স-ক্রাউস-হ্যারিসদের বই/ভিডিও থেকে ধরাবাঁধা যুক্তি মুখস্থ করে বিজ্ঞানমনস্কতার ভান করে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে—ডোমের মতো গালাগালি, আর লজিকাল ফ্যালাসির ভঙ্গুর প্রাসাদ বানানো কিংবা বেশি থেকে বেশি হলে লিঙ্গুইস্টিক প্যারাডক্স আওড়ানোকে ইসলামের "মুখোশ উন্মোচন"-জাতীয় কিছু একটা মনে করে—এই সত্যটা তারা হয়তো ধরতে পারবে না। যেহেতু সত্যিকার অর্থে আন্তরিকভাবে চিন্তা করার চাইতে গালাগালি, সস্তা রসিকতা এবং যেকোনো মূল্যে তর্কে জেতাতেই তাদের মূল আগ্রহ। কিন্তু তবুও নাস্তিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেই এতশত বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই আর বিজ্ঞানমনস্কতার ভান করার পর,

---

[৪] যদি মৃত্যুর পর কোনো কিছুই না থাকে, কোনো চেতনার (*consciousness*) অস্তিত্ব না থাকে, কোনো সত্তার অস্তিত্ব না থাকে, কোনো কিছু না থাকে তাহলে আস্তিক বা নাস্তিক সবার শেষ মৃত্যুতেই। মৃত্যুর সাথে সাথে আমাদের অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু মৃত্যুর পর কেউ ফিরে আসতে পারছে না, কিংবা মৃত্যুর পর কারও অস্তিত্ব থাকছে না তাই মৃত্যুর মাধ্যমে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে সেটা জানা যাচ্ছে না। যাচাইও করা যাচ্ছে না।

দিনশেষে একজন নাস্তিক শেষপর্যন্ত কখনোই তার বিশ্বাসের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে না—এটা জানাটা আশ্চর্য রকমের তৃপ্তিদায়ক।

অস্তিত্বের উদ্দেশ্যহীনতা ও নৈতিকতার অনস্তিত্ব

আশিক আরমান নিলয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আচ্ছা, চুরি করা কি খারাপ? কেন খারাপ? কারও ক্ষতি হচ্ছে বলে? আচ্ছা, ক্ষতি করা কি খারাপ? কেন খারাপ?...

প্রশ্নগুলো আপনার কাছে আজগুবি ঠেকলে বলতে হয়, আপনি এখনো বিজ্ঞানমনস্কতার মাকামে পৌঁছতে পারেননি। আপনাকে একটু বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করি। বিজ্ঞানমনস্করা বলে, বিজ্ঞানীরা বলেন, বিজ্ঞান বলে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর কোনো ভূমিকা নেই। মানে বুদ্ধিমান কোনো সত্তা এর পেছনে দায়ী নয়। এই গোটা বিশ্বজগৎ একটি অন্ধশক্তির দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনা। জড় পদার্থ থেকে আস্তে আস্তে এককোষী জীব, সেখান থেকে আস্তে আস্তে বর্তমান মানুষের উদ্ভব।

এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় 'ভালো' বা 'খারাপ' নামক কোনো বস্তু কখনো তৈরি হয়নি। ইনফ্যাক্ট, বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে একটা জিনিসকে সর্বসম্মতভাবে 'ভালো' বা 'খারাপ' বলে আখ্যা দেয়ার কোনো মানদণ্ড নেই। সত্তাগতভাবে একটা জিনিস কখনো 'ভালো' বা 'খারাপ' হয় না। কেউ যখন সেটাকে 'ভালো' বলে, তখনই কেবল সেটা 'ভালো'| কেউ 'খারাপ' বললে 'খারাপ'| আবার একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী বা জাতির কাছে যা ভালো, অন্য ব্যক্তি/গোষ্ঠী/জাতির কাছে তা খারাপ হতেই পারে। বিভিন্ন যুগে একই জিনিস কখনো ভালো, কখনো খারাপ বলে বিবেচিত হয়। আমরা যা কিছুকে ভালো বা খারাপ বলে জানি, তা হলো কোনো না কোনো ধর্ম বা সামাজিক রীতিনীতি বা রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত ভালো-খারাপ। আমরা

আমাদের মনকে সে অনুযায়ী প্রোগ্রাম করে নিই। কিন্তু আমাদের এই নির্মাণ এবং প্রোগ্রামের বাইরে একটা নির্লিপ্ত বাস্তবতার অস্তিত্ব আছে। নির্লিপ্ত বলার কারণ হলো, বুদ্ধিমান সত্তার হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজে নিজে সৃষ্ট এই জড় প্রকৃতিতে ভালো-খারাপ, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো পার্থক্য নেই। যেমন, সাপ ব্যাঙকে খায়। এখানে অন্যায়কারী কে?

তাই বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আপনার চারপাশে আপনি যতোকিছুর অস্তিত্ব দেখছেন, তা পয়েন্টলেস। মানে এদের অস্তিত্বের কোনো উদ্দেশ্য নেই। আপনার আমার তৈরি করা 'ভালো', 'খারাপ', 'ন্যায়', 'অন্যায়'-এর এই সিস্টেমটাও আসলে উদ্দেশ্যহীন। সবকিছুর শেষে ওই এক জিনিস—মৃত্যু!

আরও কঠিন করে ব্যাখ্যা করা যায়। এ নিয়ে বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও সাহিত্যের ফিল্ডে জিনিসপাতির ভান্ডার রয়েছে। সেদিকে গেলে আলোচনাটা জটিল হয়ে যায় ও প্রাসঙ্গিকতা হারায়। অস্তিত্বশীল এই জগতের উদ্দেশ্যহীনতাকে যদি আপনি স্বীকার করেন (অর্থাৎ ধর্মীয় কোনো বিশ্বাসের মাধ্যমে জগতের উদ্দেশ্যহীনতাকে অস্বীকার না করেন), তাহলে আপনার সামনে কয়েকটা অপশান খোলা থাকে।

একটা অপশান হলো আপনি সুইসাইড করে ফেলতে পারেন। সবকিছুই যখন অর্থহীন, সবকিছুর শেষ পরিণতি যখন মৃত্যু, তো এখনই নয় কেন? আরেকটা অপশান হলো বিনোদন। সবরকমের দৈহিক চাহিদা পূরণ করে আপনি চরমতম বিনোদনময় জীবনযাপন করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষাটাকে ভুলে থাকতে পারেন। অথবা রক্তপিপাসু ক্ষমতাধর শাসক হয়ে জীবনের সর্বোচ্চ মজাটা লুটে নিতে পারেন মরার আগে। অথবা নিজের জীবনের ওপর নিজেই একটা অর্থ আরোপ করতে পারেন যে 'আমি এই এই উদ্দেশ্যে বাঁচবো'।

বিজ্ঞানমনস্ক জীবনদর্শনের ভয়াবহ দিক হলো ওপরে এখন পর্যন্ত যা যা বলা হলো তা। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্করা আপনাদের সামনে তাদের ধর্মের সবকিছু উল্লেখ করে না। করলে আপনারা তাদের ওপর বিরক্ত হয়ে যেতেন। এদেশের

ইসলামবিদ্বেষীরা যখন দাবি করে যুক্তি ব্যবহার করা তাদের রীতি, আর চাপাতি দিয়ে কোপানো মুমিনদের রীতি একথা দিয়ে সে মুমিনদের ওপর বিজ্ঞানমনস্কদের একটা মোরাল সুপিরিওরিটি প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তার এ কথাটা কোনো ভ্যালু বহন করে না। কারণ সব যুক্তি নিয়ে বেঁচে থাকার পরও অর্থহীন জীবনের শেষটা হয় ওই অর্থহীন মৃত্যুর মাধ্যমে। আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেহেতু ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই, তাই চাপাতি দিয়ে কোপানোটাও একটা প্রাকৃতিক ফেনোমেনন ছাড়া কিছু না। খনি থেকে আহৃত লোহা প্রক্রিয়াজাত হয়ে হাতলযুক্ত ধারালো ইস্পাত হয়। একটি হোমো সেপিয়েন্সের ঐচ্ছিক পেশির নড়াচড়ায় অপর হোমো সেপিয়েন্সের খুলিতে ফাটল হয়। মাধ্যাকর্ষণশক্তির কারণে ভেতরকার সেরেব্রাল বডিগুলো ভূমিতে পড়ে যায়। এর বেশি কিছু না।

ওপরের এই জটিল ঝামেলা অল্প কথায় সমাধান হয়ে যায় ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের একটা সত্তায় বিশ্বাস করলে। আল্লাহ বলেছেন ন্যায়, অতএব ন্যায়। আল্লাহ বলেছেন অন্যায়, অতএব অন্যায়। ইসলামীশাস্ত্রের পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করলে দেখবেন, কী কী কারণে মানুষকে হত্যা করা যায় তার লিস্ট আছে। কিন্তু কী কী কারণে মানুষকে হত্যা করা যায় না, তার কোনো লিস্ট নেই। কারণ সেটা অসীম। লিস্ট করে শেষ করা যাবে না। ওই নির্ধারিত কারণগুলোর বাইরে একটা মানুষকে হত্যা করা মানে সমগ্র মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। কেন? আল্লাহ বলেছেন তাই।

বিজ্ঞানমনস্ক না হয়ে আমার ইসলামে বিশ্বাস করার কারণগুলোর মাঝে একটা হলো এই যে, এটা আমার জীবনকে সহজ করে। ইসলাম আমার জীবনকে একটা উদ্দেশ্য দেয়। বিজ্ঞানমনস্কদের মতো পাতার পর পাতা কঠিন ভাষায় মোটা মোটা বই লিখে শেষে উপসংহারে গিয়ে আমাকে বলে না *“তোমার এই অস্তিত্ব অর্থহীন, তোমার মৃত্যু অর্থহীন।*

ইডিপাস কমপ্লেক্স

শিহাব আহমেদ তুহিন

থিবস নগরীতে কোনো কিছুরই অভাব নেই। তারপরও রাজা লুইস আর তার স্ত্রী জকোস্টার মনে কোনো সুখ নেই। কারণ, তারা নিঃসন্তান। বহু বছর সন্তানহীন থাকার পর লুইস এক গণকের সাহায্য নিলেন। গণক ভবিষ্যদ্বাণী করলো, রাজা লুইসের যদি কোনো পুত্রসন্তান জন্মায়, তবে সে তাকে হত্যা করবে আর নিজের মা-কে বিয়ে করবে। দুঃখজনকভাবে, সে বছরেই তাদের একটি পুত্রসন্তান হলো। প্রফেসিটা ঠেকাতে রাজা লুইস ছেলেটাকে এক চাকরের হাতে তুলে দিলেন। চাকরটাকে নির্দেশ দিলেন ছেলেটাকে হত্যা করার জন্য।

কিন্তু এই নিষ্পাপ ছেলেটাকে হত্যা করতে লোকটার মন সায় দিলো না। তাই সে ছেলেটাকে এক রাখালের হাতে তুলে দিলো। পরবর্তীতে কয়েক হাত পালাবদল হয়ে, ছেলেটা শেষ পর্যন্ত পলিবাসের মহলে আশ্রয় পেলো। পলিবাস ছিলেন থিবসের প্রতিবেশী নগরী করিন্থের রাজা। রাজা আর রানি ছেলেটাকে নিজের ছেলের মতোই লালন-পালন করতে লাগলেন আর তার নাম রাখলেন ‘ইডিপাস’।

ইডিপাস খুব সুখেই রাজমহলে বড় হতে থাকলো। কিন্তু যুবক বয়সে হঠাৎ এক মাতাল তাকে “জারজ” বলে গালি দিলো। মাতালটা তাকে আরও জানালো, ইডিপাস রাজা পলিবাসের নিজের সন্তান না। ইডিপাস তার বাবা মাকে ঘটনার সত্যতা জিজ্ঞেস করলে তারা তা অস্বীকার করলেন। সত্যটা জানতে ইডিপাস এক গণকের আশ্রয় নেয়। গণক তাকে শুধু এটুকু বলে যে,

ইডিপাস নিজের বাবাকে হত্যা করবে আর নিজের মা-কে বিয়ে করবে। এমন কুৎসিত পরিণতি এড়াতে ইডিপাস করিন্থ নগরী থেকে পালিয়ে যায়।

"বিধির লিখন, যায় না খণ্ডন" বলে একটা কথা আছে। না হলে কেন ইডিপাস করিন্থ নগরী ছেড়ে নিজের জন্মভূমি থিবসেই ফিরে আসবে? থিবসে আসার পর পরই সে এক রথের সামনে পড়ে আর রথের চালকের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ইডিপাস চালকটাকে হত্যা করে ফেলে। দুঃখজনকভাবে, সেই চালকটাই ছিলেন থিবসের রাজা লুইস, ইডিপাসের জন্মদাতা। এভাবে নিজের জন্মদাতাকে হত্যা করে ইডিপাস ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক পূর্ণ করে ফেললো নিজের অজান্তেই। এক চাকর লুইসকে রাস্তায় মৃত দেখতে পেয়ে রাজমহলে অবহিত করলো। পুরো থিবস নগরীতে শোকের ছায়া নেমে আসলো।

থিবসের পথ চলতে চলতে ইডিপাস এক স্ফিংক্স (নারীর মাথা ও বুক, সিংহের দেহ ও ঈগলের ডানাবিশিষ্ট দানব) এর সামনে পড়লো। স্ফিংক্স পথিকদের ধাঁধা জিজ্ঞেস করতো। সঠিক উত্তর দিতে পারলে তাদের ছেড়ে দিতো আর ভুল উত্তর দিলে তাদের হত্যা করতো। দানবটা তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কোন প্রাণী সকালে চার পায়ে, বিকেলে দুই পায়ে আর রাতে তিন পায়ে হাঁটে?" ইডিপাস উত্তর দিলো—"মানুষ।" শৈশবে তারা চারপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে, পরিণত অবস্থায় দুইপায়ে আর বৃদ্ধাবস্থায় দুই পা আর লাঠি অর্থাৎ তিন পায়ে।

ইডিপাসের উত্তর সঠিক হলো। দানবটা তাকে কাঁধে নিয়ে থিবস ঘুরালো। থিবসের সবাই অবাক হয়ে তা দেখলো, কারণ ইডিপাসই প্রথম এই দানবটার কাঁধে চড়তে পেরেছে। এদিকে রাজার মৃত্যুতে রানি জকোস্টার ভাই ঘোষণা করেছিলেন, যে স্ফিংক্স এর কাঁধে চড়তে পারবে তাকেই থিবসের রাজা ঘোষণা করা হবে। তাই ইডিপাসকে থিবসের রাজা ঘোষণা করা হলো আর রাজার বিধবা স্ত্রী জকোস্টার সাথে তাকে বিয়ে দেয়া হলো। তাদের সন্তানও হলো। এভাবে ইডিপাস পুরো ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করলো—"ছেলেটা নিজের বাবাকে হত্যা করবে আর নিজের মাকে বিয়ে করবে।"

বিয়ের কয়েক বছর পর রাজ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়লো। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। এ অবস্থা ঠেকাতে রাজা ইডিপাস এক গণকের আশ্রয় নিলো। গণক জানালো, যদি রাজা লুইসের হত্যাকারীর শাস্তি হয়, তবে নগরীতে শান্তি ফিরে আসবে। হত্যাকারীর পরিচয় জানতে ইডিপাস থিবসের গণক টাইরিসিয়াসের সাহায্য চাইলো। টাইরিসিয়াস তাকে তিরস্কার করলো আর তাকে রাজা লুইসের হত্যাকারীকে খুঁজতে নিষেধ করলো।

ইডিপাস আরও জানতে পারলো, এ নগরীতে দুর্ভিক্ষের কারণ হচ্ছে এখানে এক ব্যক্তি নিজ বাবাকে হত্যা করেছে আর মা-কে বিয়ে করেছে। করিন্থ নগরীতে থাকা অবস্থায় শোনা ভবিষ্যদ্বাণীটা ইডিপাসের মনে পড়ে গেলো। সে করিন্থ নগরীতে দূত পাঠিয়ে জানতে পারলো, রাজা পলিবাস মারা গিয়েছেন। পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে ইডিপাস স্বস্তি বোধ করলো। কারণ, এখন তো আর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সম্ভব না। দূত তাকে আরও জানালো যে, সে জানতে পেরেছে—ইডিপাস রাজা পলিবাসের পালকসন্তান ছিল। একথা শুনে ইডিপাস ধাঁধায় পড়ে গেলো। কারণ, রানি জকোস্টা তাকে একবার বলেছিল যে, রাজা লুইস আর রানি জকোস্টা তাদের একমাত্র সন্তানকে এক চাকরের হাতে তুলে দিয়েছিল।

এদিকে রানি জকোস্টা যখন সবকিছু শুনলেন, তিনি আসল ঘটনা বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ইডিপাস আসলে তার আপন ছেলে। তিনি ইডিপাসকে নিষেধ করলেন, সে যাতে ব্যাপারটা নিয়ে আর না ঘাঁটায়। কিন্তু ইডিপাস থেমে গেলো না। যে চাকরটার হাতে রানি জকোস্টার ছেলেকে তুলে দেয়া হয়েছিল, ইডিপাস তাকে ডেকে পাঠালো। আর তার মাধ্যমেই সে জানতে পারলো, পলিবাসের পালকসন্তান আর রানি জকোস্টার পরিত্যক্ত সন্তান একই ব্যক্তি। ইডিপাস নিজে! রানি জকোস্টা তীব্র লজ্জায় আত্মহত্যা করলেন। ইডিপাস মৃত মায়ের সামনে আসলো। আর কাঁদতে কাঁদতে বললো, “তুমি আমার মা! আর আমার দুই চোখ কিনা তোমাকে কামনার দৃষ্টিতে দেখেছে!” অনুশোচনায় ইডিপাস নিজের চোখ মায়ের পোশাকের কাঁটা দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে অন্ধ করে ফেললো। চলে গেলো নির্বাসনে।

গল্পটা গ্রিক পুরাণ থেকে নেয়া। সত্য নাকি মিথ্যা জানার উপায় নেই। ইডিপাসের কাহিনী নিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৯ সালে সফোক্লিস লেখেন 'ইডিপাস রেক্স' নামের বিয়োগান্ত (*tragedy*) নাটক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু-দশকে প্যারিস আর ভিয়েনাতে ইডিপাসের কাহিনীকে কেন্দ্র করে বানানো মঞ্চ-নাটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যা সে সময়কার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েডকে বেশ প্রভাবিত করে। মনোবিজ্ঞানে সিগমুন্ড ফ্রয়েড বেশ বিখ্যাত (নাকি কুখ্যাত!) নাম। তিনি প্রায় সবকিছুই ব্যাখ্যা করতেন যৌনতা দিয়ে। এমনকি একটা ছেলে ছোটবেলা খেলনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, এটাও তিনি যৌনতা দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। ফ্রয়েড দাবি করতেন সকল সামাজিক সম্পর্কই যৌনতাকেন্দ্রিক।[৫]

ইডিপাসের গল্প থেকে তিনি এই উপসংহার টানেন যে, সকল ছেলেই তার মাকে কামনার বস্তু মনে করে। যার কারণে, তারা তাদের বাবার প্রতি হিংসা অনুভব করে, বাবাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। তিনি এটার নাম দেন *"ইডিপাস কমপ্লেক্স"*। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা এতটাই হাস্যকর এবং বিকৃত যে, অনেক বিবর্তনবাদীও তার এসব উদ্ভট ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেনি। তাদের মতে ফ্রয়েড কোনো বিজ্ঞানী নয়, বরং *"গল্পকার"*।

সমকামিতা প্রমাণের ক্ষেত্রে অনেকের কাছেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ শক্ত একটা দলিল। তাদের যুক্তি হচ্ছে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের পূর্বপুরুষ একই হবার কারণে আচরণে আর প্রবৃত্তিতে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষের খুব বেশি পার্থক্য নেই। তাই যদি পশুদের মধ্যে সমকামিতা থাকে, আমরা কেন তা করতে পারবো না? ঠিক একই ভাবে প্রাণীদের মধ্যে যদি ইনসেস্ট বা অজাচার বিদ্যমান থাকে, তবে আমাদের তা করতে সমস্যা কী? সমকামিতা এখন পাশ্চাত্যে মোটামুটি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই বিকৃত যৌনাচারের যুগেও বহু মানুষ ইনসেস্টকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না।

---

[৫] Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo, Edited by Arthur P. Wolf and William H. Durham. (Page -23)

কারণ, দিনশেষে বিকৃতিরও তো একটা সীমা আছে। তাই ইনসেস্টকে বলা হয় *'The last taboo'*। কিছু বিকৃত মানুষ দাবি করে, এই স্বাভাবিক(!) প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিতে পারলে নাকি আমরা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবো।

এদের জন্য আশার বাণী রেখে সম্প্রতি স্পেন আর রাশিয়া পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ইনসেস্টকে বৈধতা দিয়েছে।[৬] জার্মানির ন্যাশনাল এথিক্স কাউন্সিল ভাই-বোনের অজাচারকে বৈধতা দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছে।[৭] আমেরিকাও বৈধতা দেয়ার পথে এগুচ্ছে। অজাচারের ক্ষেত্রে বিকৃতমনাদের খুব প্রিয় একটা যুক্তি হচ্ছে—*"If animals can do it, why can't we?"*

প্রথমত, বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন কিছু কিছু নৈতিকতা শুধু মানুষের জন্যই। আমরা যখন পশুদের আচরণের কথা বলি, তখন আমরা কখনোই "ধর্ষণ" কিংবা "বিয়ে"—এই টার্মগুলো ব্যবহার করি না। এগুলো শুধু মানুষের জন্যই স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়ত, প্রাণীজগতে অজাচার স্বাভাবিক, এটি একটি অসত্য কথা। জীববিজ্ঞানীরা বলেন, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রাণীজগতে ইনসেস্ট একটি বিরল ঘটনা।[৮]

তৃতীয়ত, এমনকি প্রাণীদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে যে, তারা রক্তের সম্পর্কের কারও সাথে মিলিত না হয়ে দূরবর্তী কারও সাথে মিলিত হতে চায়। এটাকে বলা হয়, *'Sexual imprinting'*।[৯] উইকিপিডিয়াতে ইনসেস্টের যে

---

[৬] *Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law*, 14 March 2008. Retrieved 30 August 2012.

[৭] http://www.independent.co.uk/news/world/europe/german-ethics-council-calls-for-incest-between-siblings-to-be-legalised-by-government-9753506.html

[৮] Pusey and Wolf, "Inbreeding avoidance in animals," (Page 202-205)

[৯] Konrad Lorenz, *Der Kumpan in der Umwelt des Vogels*, Journal fürOrnithologie, vol. 83 (1935), (Page. 137–213, 289–413)

সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে কাজিনদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পরিষ্কার। আমরা বলি, কাউকে আমাদের ভাই অথবা বোন হতে হলে অন্তত আমাদের বাবা কিংবা মা এক হতে হবে। জাহেলি যুগে আরবদের একটি কালচার ছিল। পিতা মারা গেলে পিতার স্ত্রী ছেলের অধিকারে চলে যেতো। এমনকি সে সময়ে মিশর, ইরান ইত্যাদি দেশে অজাচার বিদ্যমান ছিল। রাজারা নিজ কন্যাদের বিয়ে করতেন।[১০] আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পরিষ্কারভাবে এসব নিষিদ্ধ করেন:

"যে নারীদের তোমাদের পিতা-পিতামহ (কখনো) বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ কোরো না। তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। এটা অত্যন্ত অশ্লীল, ঘৃণ্যকর্ম এবং কুপথের আচরণ। তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজি, ভাগিনি, তোমাদের সেসকল মা, যারা তোমাদের দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের প্রতিপালনাধীন তোমাদের সৎ কন্যা, যারা তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত, যাদের সাথে তোমরা নিভৃতে মিলিত হয়েছো। তোমরা যদি তাদের সাথে নিভৃত-মিলন না করে থাকো (এবং তাদের তালাক দিয়ে দাও বা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়), তবে (তাদের কন্যাদের বিবাহ করাতে) তোমাদের কোনো গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরাও তোমাদের জন্য হারাম এবং এটাও হারাম যে, তোমরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে; তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১১]

বাইবেলেও ইনসেস্টকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১২] কিন্তু দুঃখজনকভাবে একই সাথে, বাইবেলে দশটি অজাচারের গল্পও বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[১০] *মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবি (পৃষ্ঠা- ৮০-৮১)

[১১] আল-কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ২২-২৩

[১২] Holy Bible: Leviticus 18:6-12, Leviticus 18:10, Leviticus 18:12-14, Deuteronomy 27:20-23

যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

--- লূত (আ.) এর দুই মেয়ে তাদের বাবাকে পর পর দুই রাত মদ পান করায় এবং বাবার সাথে মিলিত হয়। ফলে, মেয়ে দুইটি বাবার দ্বারা গর্ভবতী হয়ে পড়ে।[১৩]

--- ইবরাহিম (আ.) আর তাঁর স্ত্রী সারাহ এর বাবা একই ব্যক্তি ছিলেন। যার অর্থ, সারাহ ছিলেন ইবরাহিম (আ.) এর সৎ বোন।[১৪]

--- দাউদ (আ.) এর বড় ছেলে এবং সিংহাসনের উত্তরসূরি অম্নোন, তার বোন তামারকে ধর্ষণ করে।[১৫] দাউদ (আ.) এর আরেক ছেলে অবশোলম তার পিতার সাথে বিদ্রোহ করে খোলা আকাশের নিচে পুরো ইসরায়েলবাসীর সামনে তার পিতার উপপত্নীদের ধর্ষণ করে।[১৬]

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের মুসলিমদের আকিদা হচ্ছে, সকল নবীই (আ.) নিষ্পাপ ছিলেন। যদি এমন কোনো কিছু কোনো পূর্ববর্তী কিতাবে উল্লেখ করা হয়, যা নবীদের চরিত্রকে কলুষিত করে, তবে তা বিকৃত এবং বানোয়াট।

বর্তমানে নাস্তিকসহ অনেকেই প্রশ্ন তোলে, যদি ধর্মগ্রন্থের পবিত্র ব্যক্তি আর তাদের সন্তানেরা এসব করতে পারে আর ঈশ্বর সেটা তাঁর কিতাবে উল্লেখও করতে পারেন, তবে আমাদের এসব করতে সমস্যা কী? বর্তমানে তাই পাশ্চাত্যে ইনসেস্ট ভয়াবহ আকারে বাড়ছে।

বেশি না, পঞ্চাশ বছর আগেও সবাই সমকামিতার মতো ইনসেস্টকেও একটি বিকৃত যৌনাচার হিসেবে জানতো। পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৯৫৫ সালে

---

[১৩] Holy bible: Genesis 19:30-38

[১৪] Holy bible: Genesis 20:12

[১৫] Holy bible: 2 Samuel 13

[১৬] Holy bible: 2 Samuel 16

আমেরিকাতে প্রতি মিলিয়নে কেবল একজন মানুষ অজাচারে লিপ্ত হতো।[১৭] আর এখন? প্রতি তিনটি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে আর প্রতি পাঁচটি ছেলের মধ্যে একটি ছেলে তাদের বয়স ১৮ হবার আগেই পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়।[১৮]

আচ্ছা, আমাদের এখানে কী অবস্থা? *NDTV-এর* একটি রিপোর্টে প্রতিবেশী দেশ ভারতে অজাচারের একটি পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে।[১৯] পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতে ৫৩% শিশু শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়। ৭২% শিশুকে নীরবে এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। ৬৪% অজাচারের শিকার শিশুদের বয়স ১০-১৮ বছর। ৩২% এর বয়স কেবল ২-১০।

চিন্তা করা যায়? মাত্র দুই থেকে দশ! যারা এই অজাচারের শিকার হয়, তাদের ৮৭% কে বার বার এই শারীরিক লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যারা আমার এই লেখা পড়ে এতক্ষণ "এমন বিকৃত টপিক নিয়ে কেন লিখছি!" এমনটা ভাবছিলেন তাদের জন্য এই পরিসংখ্যানগুলো দেয়া।

কয়েক বছর আগেও আমার ধারণার বাইরে ছিল যে, এমন বিকৃত কিছু মানবসমাজে থাকতে পারে। আর সত্যি বলতে যেকোনো সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের নিকট এসব বিকৃত মনে হবে। আমি প্রথম 'incest' টার্মটার সাথে পরিচিত হই, বর্তমান সময়ে নাস্তিকদের 'নবী' লরেন্স ক্রাউসের সাথে হামজা যর্তযিসের এক ডিবেটে।[২০]

বিতর্কের এক পর্যায়ে হামজা যর্তযিস, লরেন্স ক্রাউসকে প্রশ্ন করেন: *"Why is incest wrong?" (অজাচার কেন অন্যায়?) লরেন্স ক্রাউস জবাব দেন, "It's*

---

[১৭] S. K. Weinberg, Incest Behavior (New York: Citadel).

[১৮] https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/01/america-has-an-incest-problem/272459/

[১৯] Incest: India's ugly secret tumbles out in series of cases- https://www.youtube.com/watch?v=vA61xBnVb14&t=1s

[২০] Lawrence Krauss vs Hamza Tzortzis - Islam vs Atheism Debate https://www.youtube.com/watch?v=uSwJuOPG4FI

not clear (to) me that it's wrong." (আমার কাছে মনে হয় না যে এটা অন্যায়।) আমি জবাব শুনে থ হয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে পৃথিবীতে এমনও মানুষ থাকতে পারে, যারা এটাকে বৈধ মনে করতে পারে। বিতর্কের পর নাস্তিকদের আরেক 'নবী' রিচার্ড ডকিন্স তার টুইটার একাউন্টে উত্তরটি শেয়ার করে তার সম্মতি প্রকাশ করেন।[২১]

বাংলাভাষী নাস্তিকদের ধর্মগ্রন্থসম 'মুক্তমনা' ব্লগে আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে আদনান নামে এক ব্লগার "নষ্ট রাত্রি" নামে একটি ছোটগল্প লিখে। তাতে কল্পনার অযোগ্য বিকৃতিতে লেখক বাবাকে নিয়ে দুই মেয়ের ফ্যান্টাসির কথা লিখেছে। পুরো গল্পটিতে আসলে কী ছিল, সেটি আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। আমার রুচিতে কুলোচ্ছে না।

লেখক তার অশ্লীল গল্পটাকে বিশেষায়িত করেছে এভাবে : "গল্পটি আসলে ক্ষীণদৃষ্টি, বিশ্বাসের দাসত্ব, আর নষ্টামির বিরুদ্ধে আমার, আপনার ও আমাদের একটা সংগ্রাম। আর গল্পটি বলাও হয়েছে শিশ্নটির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কয়েকবার পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে, মানুষ ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে চায় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, কিন্তু আসলে ক্রমাগত সে তার নিজেরই ক্ষমতার দাস হয়ে ওঠে।"

আমার জানামতে, যে কারওর যেকোনো লেখাই মুক্তমনা ব্লগে প্রকাশ করা হয় না। মুক্তমনা ব্লগ আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই এমন বিকৃত লেখা ব্লগে রেখে প্রমাণ করেছে, তারা আসলে মুক্তচিন্তার নামে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে অশ্লীলতা আর বিকৃতমনস্কতা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আসলে ইনসেস্ট কেন ঠিক নয় সেটা নিয়ে আমার মনে হয় না কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন আছে। যেকোনো বিকৃতিহীন মানুষের কাছেই এটা কল্পনার অযোগ্য। ইনসেস্টের কারণে *Inbreeding* ঘটে। যার ফলে পরবর্তী প্রজন্মে বিভিন্ন জেনেটিক ডিজঅর্ডার ঘটে থাকে।

---

[২১] https://twitter.com/richarddawkins/status/312320023035273216

নিচের তালিকার দিকে ভালোভাবে লক্ষ করলে আরও পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা:

Levels of Death and Defect Reported in Four Studies of Incest

Country of Origin	No. Studied	Follow-up (yr.)	Autosomal Recessive Disorders	Congenital Malformations/ Sudden Infant Deaths	Nonspecific Severe Intellectual Handicap	Others, Including Mild Intellectual Handicap	Normal	Source
United States	18	0.5	2	4	0	5	7	Adams and Neel 1967
United Kingdom	13	4–6	2	1	1	4	5	Carter 1967
Czechoslovakia	161	1–37	20	21	24	18	78	Seemanová 1971
Canada	21	0.5–1.9	1	8	0	4	8	Baird and McGillivray 1982
Totals	213		25 (11.7%)	34 (16.0%)	25 (11.7%)	31 (14.6%)	98 (46.0%)	

SOURCE: C. O. Carter, "Risk to offspring of incest," *The Lancet*, vol. 289 (1967), p. 436.

এমনকি বিবর্তনবাদও অজাচার থেকে সতর্ক করে। কারণ, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই ইনব্রিডিং ঘটলে একটি প্রজাতির বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।[২২] অনেকেই প্রশ্ন করেন, ইনব্রিডিং তো কাজিনদের বিয়ে করলেও ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলামে কেন তাহলে কাজিনদের বিয়ে করার বৈধতা দিয়েছে? একেবারে রক্তের সম্পর্কের কারও সাথে আমাদের ৫০% জিন কমন থাকার সম্ভাবনা আছে। যার ফলে খুব সহজেই ইনব্রিডিং ঘটে। কিন্তু কাজিনদের ক্ষেত্রে এটা কেবল ১২.৫%, অপেক্ষাকৃত কম।[২৩]

এতটুকু জিন কমন থাকার আশঙ্কা অন্য কোনো শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রয়েছে। আর যতোটুকু ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে তা খুব সহজেই এড়ানো যাবে যদি আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম কাজিনদের বিয়ে না করি। অর্থাৎ এমন যাতে না হয় আমার বাবা তার চাচাতো বোনকে বিয়ে করেছেন, আমিও আমার

[২২] Bateson, *Optimal outbreeding in Mate Choice*, ed. P. Bateson (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), Page. 257–77.

[২৩] *Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo*, Edited by Arthur P. Wolf and William H. Durham. (Page -39)

চাচাতো বোনকে বিয়ে করলাম আর আমার ছেলেও তার চাচাতো বোনকে বিয়ে করলো, আর এভাবেই ব্যাপারটা চলতে থাকলো।

পাশ্চত্যের বিভিন্ন পরিবারের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়—যেখানে দেখানো হয়: ভাই-বোন, মা-ছেলে কিংবা বাবা-মেয়ে বিয়ে করে একসাথে নাকি সুখী (!) সংসার যাপন করছে। বাস্তবতা কিন্তু একেবারে আলাদা কথা বলে। যেসব পরিবারে এসব বিকৃতি ঘটে থাকে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে না।[২৪] ঝগড়া, অ্যালকোহল, ড্রাগ ইত্যাদি একদম নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।[২৫] যেসব মেয়ে তাদের পিতার দ্বারা এই অজাচারের শিকার হয়, তাদের অনুভূতিতে চরম রাগ, ঘৃণা, অবিশ্বাস, ভয় আর লজ্জা মিশে থাকে।[২৬]

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, *Incest Taboo* কে ছুড়ে ফেলার মাধ্যমে মানবসমাজ বিকৃতির চরমে পৌঁছাচ্ছে। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে নিজেকে পশু-পাখির চেয়েও নিচের কাতারে নামাচ্ছে। ডক্টর জেফরি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে সিগমুন্ড ফ্রয়েড একটি রূপকথাকে আমাদের সামনে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন।[২৭] তিনি এর নাম দিয়েছেন *"The Real Oedipal Complex"*।

ইডিপাস কখনোই নিজের বাবাকে হত্যা করতে চায়নি, মায়ের সাথে মিলিত হতে চায়নি। সে চেয়েছে এই কুৎসিত পরিণতি থেকে বাঁচতে। কিন্তু সে তার ভাগ্য থেকে বাঁচতে পারেনি। ঠিক একই ভাবে, মানুষ কখনোই তার পরিবারের প্রতি কামুক হয়ে জন্মায় না। বরং এগুলো যে স্বাভাবিক না, এই

---

[২৪] Herman, *Father-Daughter Incest*, p. 71.

[২৫] Kathleen C. Faller, *Women who sexually abuse children*, *Violence and Victims*, vol. 2 (1987), pp. 263–75;

[২৬] Patricia Phelan, "Incest and its meaning: The perspectives of fathers and daughters," Child Abuse and Neglect, vol. 19 (1995), pp. 7–24.

[২৭] https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-art-flourishing/201205/the-real-oedipal-complex

বোধ নিয়েই সে জন্মায়। আমার খুব অবাক লাগে এই বিকৃত যৌনাচারের জয়গান গাওয়া মানুষগুলোই আবার প্রশ্ন তোলে—কেন আমাদের নবী (ﷺ) নিজের ছেলের বউকে বিয়ে করেছিলেন (মিথ্যা দাবি)। তারা বলে, আমাদের নবী (ﷺ) শিশুকামী ছিলেন (ভিত্তিহীন)। মানুষকে মুক্তির দীক্ষা দেয়ার দাবিদার মানুষগুলো তাদের কুৎসিত চিন্তা দ্বারা এতটাই পরিবেষ্টিত যে, আজ তারা নিজেদের মা-কে মা ভাবতে পারছে না, বোনকে বোন ভাবতে পারছে না। জীবন মানেই তাদের কাছে *"Sex & Drugs and Rock & Roll"*। পুরো দুনিয়াটাই তাদের কাছে *Sex Object*.

দিনশেষে এই মানুষগুলোই যে আলোকে অন্ধকার ভাববে, সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে—তাতে কি খুব বেশি অবাক হবার মতো কিছু আছে?

"আর আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো উদাসীন।"[২৮]

---

[২৮] আল-কুরআন, সুরা আল-'আরাফ, ৭ : ১৭৯

ধর্মের আবশ্যকতা

জাকারিয়া মাসুদ

সকাল থেকেই আকাশে প্রচণ্ড মেঘ জমেছে। মেঘের কালো ছায়ায় দীপ্তিমান সূর্যটা ক্রমেই আড়াল হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় সূর্যটা যেন কোথায় হারিয়ে গেলো। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বৃষ্টির রিম-ঝিম শব্দটা উপভোগ করছিলাম। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। আমাদের স্কুলের ইংরেজি শিক্ষিকা একদিন ক্লাসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি কেউ বলতে পারবে *Cats and dogs* অর্থ কী*?'* আমরা সকলেই সমস্বরে বলে উঠলাম, 'বিড়াল এবং কুকুর' ম্যাম।

আমাদের উত্তর শুনে ম্যামের হাসি যেন আর থামছেই না। ম্যামের হাসির কারণটা অবশ্য ক্লাস সেভেনে ওঠার পর বুঝেছিলাম। ছোটবেলার কথা চিন্তা করতে করতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কলিংবেলে বেজে উঠল। আমি দরজা খুলতে গেলাম। দরজা খুলতেই কানে ভেসে আসলো, 'আসসালামু আলাইকুম।'

—'ওয়ালাইকুমুস সালাম। ফারিস, তুই?'

— 'রাতে ফোন করে না আসতে বলেছিলি?'

— 'তাই বলে এত বৃষ্টিতে?'

— 'কথা দিয়েছিলাম দশটায় আসব। কথা তো রাখতেই হবে দোস্ত!'

ফারিস আমার ক্লাসমেট। সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকেই ছেলেটার সাথে আমার পরিচয়। মাঝারি গড়নের। বেশ ফর্সা। মাথার চুলগুলো পাতলা। কিন্তু দাড়ি বেশ ঘন। দাঁতগুলো মুক্তার মতো। ফারিসের সবচেয়ে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য হলো তার হাসি। খুব সুন্দর মুচকি হাসতে পারে। কথা বলার সময় ঠোঁটের

কোনায় সব সময় এক ঝলক হাসি লেগে থাকে। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে।

পারবে না কেন! ও জানে প্রচুর। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার থেকে অন্যান্য বই-ই বেশি পড়ে। সময় পেলেই বই নিয়ে পড়ে থাকে। একটানা অনেকক্ষণ পড়তে পারে। বই পড়ার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ দেখে আমরা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতাম, 'ফারিস তোকে আমরা বইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবো'। অত্যন্ত তাক্বওয়াবান ছেলে। নামায, রোযা, যিকির আর ব্যক্তিগত আমলের ব্যাপারে খুবই সচেতন। সময়ের প্রতি সচেতনতার মাত্রাটা আমাদের সকলের থেকে বেশি। তাই এত তুমুল বৃষ্টিতে ভিজেও সে টাইমলি চলে এসেছে।

ফারিসকে বসার ঘরে বসতে দিয়ে আমি ভেতর থেকে তোয়ালেটা এনে বললাম, 'এই নে। শরীরটা মুছে নে। নয়তো ঠান্ডা লাগবে।' ফারিস শরীর মুছতে মুছতে বললো, 'কী যেন বলবি বলেছিলি?'

—'এত তাড়া কীসের?'

— 'রাহাতের সাথে দেখা করতে যেতে হবে। ১১ টায় যাবো বলে কথা দিয়েছিলাম। তাই আর কি!'

ফারিস কথা দিয়ে কথা রাখেনি—এমন উদাহরণ নেই। অগত্যা চলে যাবে বিধায় আমি আসল ঘটনাটা ওকে খুলে বললাম। আমার একজন ফুফাতো ভাই আছে— নাম আসিফ। প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে বিবিএ করছে। কিছুদিন আগেও যে ছেলেটা নামাযে অবহেলা করতো না, আজ সে সংশয়বাদীদের কাতারে নাম লিখাতে বসেছে। কোনো এক নাস্তিক লেখকের পাল্লায় পড়েছে। ধর্ম ব্যাপারটা তার কাছে আদিম বলে মনে হয়। বিশ্বায়নের এই যুগে নাকি ধর্মের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। যে মানুষ রকেট বানাচ্ছে, কৃত্রিম উপগ্রহ বানাচ্ছে, সুপার কম্পিউটার বানাচ্ছে, সে মানুষ তার জীবনবিধানও নিজেই নির্ধারণ করে নিতে পারে—এটা তার ধারণা। সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পূর্বেকার বিধান অনুসরণ করার কোনো যৌক্তিকতা তার কাছে নেই।

আমার কথা শুনে ফারিস বললো, 'আসিফ আছে বাসায়?'

— 'হুম। আছে। কালকেই এসেছে।'

— 'ওর সাথে কথা বলা যাবে?'

— 'সে জন্যেই তো তোকে ডেকেছি। আচ্ছা আমি ডাকছি। আসিফ! আসি...ফ! এই আসিফ! এই দিকে আয়।'

ভেতর থেকে আসিফ এলো। ততক্ষণে চা-ও চলে এসেছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফারিস বললো, 'ভালো আছো আসিফ?'

— 'জি, ভালো।'

— 'তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?'

— 'এই তো মোটামুটি।'

— 'বই পড়তে তোমার কেমন লাগে, আসিফ?'

— 'ভালো লাগে। খুব ভালো লাগে।'

— 'হুমায়ুন আজাদের বই পড়েছো—*আমার অবিশ্বাস?'*

— 'হুম।'

— 'তোমার সংশয় এই বই থেকেই উদ্ভব হয়েছে। তাই না?'

— 'আপনি কী করে জানলেন?'

ফারিস উত্তর দিলো না। কারণ বইটা সে আসিফের অনেক আগেই পড়েছে। সে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা আসিফ, তুমি কি মাও সেতুং এর নাম শুনেছো?'

আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আলোচনার মধ্যে হঠাৎ মাও সেতুং আসলো কেন? চুপ থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই নীরব শ্রোতার মতো ফারিস ও আসিফের কথোপকথন শুনে যাচ্ছিলাম। ফারিসের প্রশ্নের জবাবে আসিফ বললো, 'হাঁ, শুনেছি।' 'তুমি কি জানো, মাও সেতুং এর কারণে গণচীনে কতজন নিরীহ লোকের প্রাণহানি হয়েছিল?'

— 'না ভাইয়া। আমার আইডিয়া নেই।'

— 'তার প্রত্যক্ষ নির্দেশে প্রায় ১০ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয়।'

দশ মিলিয়ন সংখ্যাটা সত্যিই আমাকে অবাক করলো। মানুষ এতটাই হিংস্র হতে পারে? হাজার নয় শত নয়, একেবারে মিলিয়নসংখ্যক খুন? তাও আবার নিজের দেশের নাগরিক। আসলে ক্ষমতার লোভে যারা অন্ধ হয়ে যায়, তাদের কাছে এগুলো পানি ভাত।

ফারিস আরও বললো, 'শুধু হত্যাই নয়; হত্যার পর তাদের দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। এরপর রান্না করে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের দিয়ে তা ভক্ষণ করানো হয়। কোটি কোটি লোককে জেল খাটতে বাধ্য করা হয়। জেলে বন্দি অবস্থায় মারা যায় প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের কবলে মারা যায় ২০-৪০ মিলিয়ন লোক। বলতে পারবে জোসেফ স্ট্যালিনের নির্দেশে কী পরিমাণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল?' আসিফ না-সূচক মাথা নাড়ল| উত্তরটা তার জানা নেই।

— 'ষ্ট্যালিন ছিলেন সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর এক কুখ্যাত নেতা| যিনি প্রজাদের রক্তে নিজের হাতকে রঞ্জিত করেছিলেন| তার শাসনামলে প্রায় ২০ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয়|'

— 'বিশ মিলিয়ন?'

— 'হাঁ, ভাইয়া! বিশ মিলিয়ন। তুমি কি জানো, সমাজতন্ত্রীদের কারণে বিশ্বে ঠিক কি পরিমাণ লোক নিহতো হয়েছিল?'

— 'অনেক|'

— 'অনেক নয়| ঠিকঠাক সংখ্যাটা বলো'|

— 'সরি ভাইয়া। জানা নেই|'

—*The Black Book of Communism"*[২৯] এর দেয়া তথ্যানুসারে প্রায় ১০০ মিলিয়ন লোক নিহতো হয় এদের কারণে। আচ্ছা আসিফ, বলো তো তাদের এই কাজগুলো ঠিক ছিল? না ভুল?'

---

[২৯] কম্যুনিজম সম্পর্কে একদল অমুসলিমদের লেখা একটি বিখ্যাত বই। বইটি লিখেছেন, *St.phane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Pann., Andrzej Paczkowski, Karel*

—'অবশ্যই ভুল।'

— 'কীভাবে বুঝলে?'

— 'নিজের বিবেক দিয়ে।'

— 'তাদের বিবেক অনুসারে?'

— 'তাদের বিবেক অনুসারে তো ঠিকই ছিল মনে হয়।'

— 'তুমি তো অবশ্যই জানো, আমাদের দেশে মিনি স্কার্ট পরে বের হওয়াটা কী?'

— 'অসভ্যতা।'

— 'কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোতে?'

— 'স্বাভাবিক।'

'শুধু মিনি স্কার্ট-ই নয়। পশ্চিমা দেশগুলোতে যদি বিকিনি পরেও কেউ রাস্তায় বের হয় তবুও তা দোষের কিছুই নয়; বরং স্বাভাবিক। অপর দিকে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে কোনো মেয়ে যদি স্কার্ট পরে রাস্তায় বের হয় তাহলে তা আমাদের কাছে আপত্তিকর। তুমি যদি দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রসৈকতে যাও তাহলে দেখতে পাবে, সকল বয়সের অসংখ্য নারী শরীরের ঊর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে টপলেস হয়ে 'রৌদ্রস্নান' করছে। আরেকটু এগিয়ে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যাও, অসংখ্য নগ্নবাদীদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রসৈকতে রৌদ্রস্নান করতে দেখবে। আমাদের একজন অধ্যাপক—যিনি ডেনমার্ক থেকে তার পি.এইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন—একদিন ক্লাস নিতে গিয়ে বললেন, ডেনমার্কে কোনো যুবক আর যুবতী যদি প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন না করে, তাহলে তা তাদের দেশে অন্যায়। তাদের বাবা-মায়েরা চিন্তায় পড়ে যান এই কথা ভেবে যে, আমাদের যুবক সন্তানেরা কেনো প্রেমে জড়ায় নি? অথচ আমাদের দেশে আমাদের বাবা-মায়েরা তাদের সন্তান প্রেমে পড়লে চিন্তায়

Bartosek এবং Jean-Louis Margolin. আর বইটি ১৯৯৯ সালে *Harvard University Press* থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পড়ে যান। তাহলে এখন বলো তো, কোন সংস্কৃতিটা মানবসমাজের জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হবে? আমাদেরটা নাকি তাদেরটা?’

আসিফ চুপ। কিছু বলছে না। মনে মনে কী যেন চিন্তা করছে। কোনটা ভালো হয়তো সেটা মনে মনে ভাবছে। কিন্তু দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছে বলে উত্তরটা দিতে পারছে না। ফারিস বললো, ‘আচ্ছা আসিফ আমাদের দেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৭১ সালে সংগঠিত যুদ্ধকে তুমি কীভাবে দেখো?’

— ‘এটা মুক্তিযুদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমাদের স্বাধীনতার লড়াই।’

— ‘হাঁ। অবশ্যই, অবশ্যই এটা মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে?’

আসিফ এবারও কিছু বললো না। তার মানে উত্তরটা তার জানা।

— ‘তাহলে বলো তো আসিফ, তুমি জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোন মানদণ্ড দিয়ে মানুষের কাজগুলোকে বিচার করবে? কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, তা নির্ণয় করবে?’

— ‘কোনটা দিয়ে আবার! বিবেক দিয়ে।’

— ‘তুমি যদি কেবল বিবেক-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে সব কর্মগুলোকে যাচাই করতে যাও, তাহলে অবশ্যই সেটা ভুল হবে।’

— ‘কেন ভুল হবে?’

— ‘বিবেক দিয়ে তুমি সব ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে পারবে না।’

— ‘কেন পারবো না?’

— ‘কারণ তোমার বিবেক যেটাকে ঠিক মনে করছে, সেটা অন্যের কাছে ঠিক নাও হতে পারে। আবার অন্যের বিবেকের কাছে যেটা ঠিক মনে হচ্ছে, সেটা তোমার কাছে ঠিক নাও হতে পারে। যেমন ধরো, সমকামিতা। তুমি এটাকে কীভাবে দেখো?’

— ‘ইট’স এ ক্রাইম।’

— ‘হাঁ তুমি ঠিকই বলেছো, এটা ক্রাইম। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ কিংবা অভিজিৎ রায়দের কাছে এটা ক্রাইম নয়; নিতান্তই সাধারণ একটি কাজ। শুধু বিবেকের ওপর নির্ভর করেই কি ভালো-মন্দ নির্ধারণ করা যায়? যায় না।’

সূচীপত্র

আসিফের মাথায় হয়তো বিষয়টা ভালোভাবে ঢুকছে না। তাই আমি আসিফকে বললাম, 'কী রে! মাথায় ঢুকছে তো?' আসিফ বললো, 'বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ারলি বললে ভালো হতো।' আসিফের কথা শুনে ফারিস বললো, 'হ্যাঁ, বলছি। ভালো-মন্দ নির্ধারণের জন্য শুধু বিবেক-ই যথেষ্ট নয়। কেননা প্রত্যেকের বিবেক কখনো একটি কাজকে ভালো মনে করতে পারে না। যেমন ধরো, তোমার চোখে মিনি স্কার্ট কিংবা বিকিনি পরে রাস্তায় বের হওয়াটা অন্যায়, কিন্তু জাপানিদের চোখে তা স্বাভাবিক। তোমার চোখে নগ্ন হয়ে সমুদ্রসৈকতে স্নান করাটা অন্যায়, কিন্তু পশ্চিমাদের চোখে তা স্বাভাবিক। তোমার কাছে মাও সেতুং কিংবা জোসেফ স্ট্যালিনের কর্মকাণ্ডগুলো সন্ত্রাসবাদ, কিন্তু তাদের চোখে ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের চোখে তা স্বাভাবিক। তোমার দৃষ্টিতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধটা মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের দৃষ্টিতে তা সন্ত্রাসবাদ। তোমার কাছে সমকামিতা অস্বাভাবিক ব্যাপার হলেও হুমায়ুন আজাদ কিংবা অভিজিৎ রায়দের কাছে তা স্বাভাবিক। তাহলে আমাদের অবশ্যই একটা কিছুকে স্ট্যান্ডার্ড ধরতে হবে যার সাথে তুলনা করে আমরা আমাদের সকল কর্মকে বিবেচনা করে দেখবো যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। এই স্ট্যান্ডার্ড যদি মানুষ তার বিবেক দিয়ে নির্ধারণ করতে যায়, তাহলে বিপত্তি ঘটবে।'

— 'কেন? বিপত্তি ঘটবে কেন?'

— 'তোমাকে একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি, মার্কিন সরকারের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন *(FBI) Terrorism* এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে—

"কোনো সাধারণ নাগরিক বা সরকারকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা।" [৩০] কিন্তু সমস্যা হলো, এই সংজ্ঞা দ্বারা

---

[৩০] "The unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives." [Code of Federal Regulations (28 C.F.R. Section 0.85)]

সত্যিকার অর্থে সন্ত্রাসী চিহ্নিত করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। *FBI* এর সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে, ব্যক্তি বা ক্ষমতার বেআইনি ব্যবহার করলে তা সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তার আইনি ব্যবহার হয় তাহলে তা সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে না। এখন সমস্যা হলো, এই আইন ও বেআইন নিয়ে। যেমন, মার্কিন সরকারের আইন অনুসারে তারা বিভিন্ন মুসলিম দেশে তাদের সাম্রাজ্যবাদকে ছড়িয়ে দিতে অসহায়, নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে যাচ্ছে। এটা তাদের আইন অনুসারে বৈধ। কিন্তু ওই সমস্ত মুসলিমদের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনলে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ অবৈধ। ইরাক যুদ্ধ মার্কিন সরকারের আইন অনুসারে বৈধ ছিল। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এটা ছিল সন্ত্রাসবাদ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ। তাহলে এই ক্ষেত্রেও এই সংজ্ঞায় প্রকৃত অপরাধী নির্ণয়ের জটিলতা পরিলক্ষিত হয়।

এভাবে তুমি যদি একটি নির্দিষ্ট স্থান অথবা নির্দিষ্ট সময়ের প্রচলিত বিষয়কে কর্মের স্ট্যান্ডার্ড ধরতে যাও, তাহলে অবশ্যই বিপত্তির সম্মুখীন হবে। কারণ এক দেশের স্ট্যান্ডার্ড আরেক দেশে চলবে না। এক সমাজের স্ট্যান্ডার্ড আরেক সমাজে চলবে না। এক শতাব্দীর স্ট্যান্ডার্ড আরেক শতাব্দীতে চলবে না। তুমি যেমন পশ্চিমাদের স্ট্যান্ডার্ড মানবে না। তারাও তোমারটা মানবে না। তুমি যেমন নগ্নবাদীদের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবে না, তারাও তোমারটা ফলো করবে না। তুমি যেমন অভিজিৎ রায়ের মতো করে সমকামীদের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে আনইজি ফিল করবে, তারাও তোমারটা ফলো করতে আনইজি ফিল করবে।' আসিফ এবার চুপ। একেবারে চুপ। একধ্যানে ফারিসের কথা শুনে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।

ফারিস আবার বললো, 'একটা সময় প্রাচীন গ্রিস ছিল সভ্যতার রাজধানী। এরপর এলো রোমান সভ্যতা। কিন্তু কালের আবর্তনে তাদের সমাজে প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড বর্তমান বিশ্বে অচল। শুধু অচলই নয়, হাসির পাত্রও বটে। জীবন পরিচালনার স্ট্যান্ডার্ড বিধান কোনো মানুষ ঠিক করতে পারে না। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল—তা কেবল বিবেক দিয়েই নির্ধারণ করা যায় না। মানুষের সে সক্ষমতা নেই। কেননা, মানুষের বিবেক অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রবৃত্তির

কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ফলে মানুষ অন্যায় কর্মকেও স্বাভাবিক মনে করতে থাকে। তাই স্ট্যান্ডার্ড বিধান যিনি ঠিক করতে পারেন, তিনি হলেন আমাদের স্রষ্টা। যিনি প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে। যিনি সকল দোষত্রুটি হতে পবিত্র। আর মানুষ আমার কিংবা তোমার বিবেকপ্রসূত স্ট্যান্ডার্ড মানতে বাধ্য না হলেও স্রষ্টা-প্রণীত স্ট্যান্ডার্ড ওহী মানতে ঠিকই বাধ্য। কেননা, স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন। কোন কাজ কতটুকু ভালো আর কতটুকু খারাপ—তা এই ওহীর বিধানের মাধ্যমে যদি নির্ধারিত হয়, তাহলেই আর কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে না। মানুষকে যদি জীবন পরিচালনার নিয়মনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হয়, তাহলে চিরকালই এক দল মানুষের হাতে গোটা পৃথিবী জিম্মি থাকবে। আর সেই বিধান যদি স্রষ্টা-প্রণীত হয়, তাহলে সকলের জন্য সহজ হবে। কেননা, স্রষ্টার অদৃশ্যের জ্ঞান আছে। আমাদের নেই। তিনি জানেন, কোন কোন বিধান দিলে আমাদের সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে। কোন বিধান সকলের জন্য পালন করাটা সহজ হবে।

মহান স্রষ্টা কর্তৃক প্রণীত সেই ওহীর নাম হলো, 'আল-কুরআন'; যাকে আমরা মুসলিমরা সবকিছুর স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বিবেচনা করি। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল—তা এই কুরআন দিয়ে পরিমাপ করি। আর এ জন্যেই দেখবে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই পাল্টায় না। সব সময় একই থাকে। সময়ের প্রেক্ষাপটে খারাপ কাজগুলো মানুষ ভালো মনে করতে থাকলেও ইসলাম সেটাকে কখনো ভালো কাজ বলে স্বীকৃতি দেয় না। তদ্রূপ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভালো কাজও যদি মানুষ খারাপ মনে করতে থাকে, তবুও ইসলাম সেটাকে কখনো খারাপ মনে করে না। কেননা, সত্য সব সময় ধ্রুব। আর মানুষের প্রবৃত্তি পরিবর্তনশীল। বিবেক পরিবর্তনশীল। তাই প্রবৃত্তি বা বিবেক কখনোই কর্মের মানদণ্ড হতে পারে না—যা দিয়ে কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ—তা নির্ণয় করা যায়।'

ফারিসের কথা শেষ হতেই আসিফ কিছু না বলে মাথা নিচু করে চলে গেলো। আমি ওকে আটকাতে যাবো—এই মুহূর্তে ফারিস আমাকে নিষেধ করলো। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর ফারিস চলে যাওয়ার জন্য উঠলো। ওর

কাজ না থাকলে হয়তো আরও কিছুক্ষণ বসতে বলতাম। কিন্তু তা আর হলো না। আমি ফারিসকে বিদায় জানতে গেইট পর্যন্ত এলাম।

ফারিস চলে যাবে—এমন সময় হঠাৎ আসিফ এলো। এসে ফারিসকে অনেক শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। এরপর বললো, ‘সরি ভাইয়া অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারিনি। আমি অনুতপ্ত।’

আসিফের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। ফারিস আসিফের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘সত্য এমনই, ভাইয়া! সত্য আমাদের সকলকে আকর্ষণ করে। আমাদের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। কেননা, স্রষ্টা আমাদের সত্যকে মেনে নেয়ার যোগ্যতা দিয়েই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর তুমি সেই সত্যের দিকেই ফিরে এসেছো। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।’

এমন আবেগঘন মুহূর্তটা দেখবো—কল্পনাও করিনি। চোখের পানি আটকাতে পারলাম না। মনে মনে বললাম, ‘ফারিস তুই পারিসও বটে’।

এত ধর্মের মধ্যে কোন ধর্মটি সঠিক?

আসিফ আদনান

নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী এবং সংশয়বাদীদের কিছু রেডিমেইড 'যুক্তি' থাকে। যখন স্রষ্টা, পরকাল ও স্রষ্টার আনুগত্যের আবশক্যতার কথা বলা হয়, তৎক্ষণাৎ এই মুখস্থ উত্তরগুলো তারা পেশ করে, এবং মোক্ষম জবাব দিয়ে প্রতিপক্ষকে লা-জওয়াব করা গেছে—এটা ভেবে পরিতৃপ্তি অনুভব করে। এছাড়া যারা বিশ্বাসী কিন্তু বিশ্বাস সম্পর্কে তেমন একটা জ্ঞান রাখেন না, তাদের মনে সংশয় সৃষ্টি করতেও নাস্তিকরা এসব রেডিমেইড 'যুক্তি' ব্যবহার করে।

এ রকম মুখস্থ 'যুক্তি'-র সংখ্যা সীমিত হওয়াতে দেখা যায় ঘুরেফিরে একই 'যুক্তি' বিভিন্ন আঙ্গিকে সামনে আসছে। এ রকম একটি 'যুক্তি' হলো—সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যাধিক্য ও পারস্পরিকভাবে সাংঘর্ষিক হবার 'যুক্তি'। শুনতে যতো জটিল মনে হয়, আসলে বিষয়টা ততোটা জটিল না। সাধারণত এই 'যুক্তি' প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করা হয়। যেমন—

"পৃথিবীতে এত ধর্মের মাঝে কোন ধর্মটি সঠিক? প্রতিটি ধর্ম নিজ নিজ স্রষ্টার কথা বলে, প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরা দাবি করে একমাত্র তাদের ধর্মই সঠিক, একমাত্র তাদের ধর্ম অনুসরণ করেই মুক্তি পাওয়া যাবে। এর মাঝে আপনার ধর্ম যে সঠিক তার প্রমাণ কী?"

নাস্তিকদের এই যুক্তিটির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে এবং আন্তরিকভাবে যদি কোনো সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করেন, তাহলে তার মনে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্নের উদয় হবার কথা (তবে এ ক্ষেত্রে চিন্তার ক্ষেত্রে কিছুটা নিরপেক্ষ হওয়া এবং স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ব্যাপারে

আন্তরিক হওয়া আবশ্যক)। তা হলো, এই প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য কী? ধর্ম যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে, প্রশ্নকারী কি এই প্রশ্নের মাধ্যমে ওই বিষয়গুলোর উত্তর খুঁজতে চাচ্ছেন? অথবা যে প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আস্তিক ও নাস্তিকদের মতপার্থক্য—স্রষ্টা, স্রষ্টার আনুগত্য, সৃষ্টির সূচনা, মানব অস্তিত্বের লক্ষ্য, মৃত্যু, পরকাল, নৈতিকতা, ভালো ও মন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে কি এ প্রশ্ন করা হচ্ছে? নাকি এটা কথার পিঠে বলা একটি কথামাত্র—একটি রেটোরিকাল যুক্তি?

প্রশ্নটা আরও স্পেসিফিকভাবে করি। যেই যুক্তি বা প্রশ্নটা নাস্তিকরা উত্থাপন করছে, সেটা কি আদৌ সত্যকে খোঁজার সাথে সম্পর্কিত? নাকি সেটা একটা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে, নির্দিষ্ট একটা কথোপকথনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা একটি যুক্তি? সহজ ভাষায় এই প্রশ্নের পেছনে উদ্দেশ্য বা *intent* কি সত্যের অন্বেষণ নাকি তর্কে জেতা?

আপনি যদি লক্ষ করেন, তাহলে দেখবেন, প্রশ্নকারী ইতিমধ্যেই তার প্রশ্নের মাধ্যমে সম্ভাব্য সব উত্তরকে ভুল সাব্যস্ত করে বসে আছে। এ প্রশ্নটা এমনভাবে তৈরি করা, যাতে করে সম্ভাব্য যেকোনো উত্তরকে গ্রহণ না করার জাস্টিফিকেশান তৈরি করা যায়। আপনি যে উত্তরই দিন না কেন, সে বলবে— "তুমি এটা বলছো; কিন্তু আরেকজন তো আরেকটা বলবে। তো আমি তোমাদের কার কথা শুনবো?" অর্থাৎ উত্তর খোঁজাটা আদৌ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য না। আপনি কী উত্তর দেবেন তা শুনতে, কিংবা আপনার উত্তর সঠিক কি না তা পরীক্ষা করে দেখতেও সে আসলে আগ্রহী না; বরং তার উদ্দেশ্য হলো সম্ভাব্য উত্তরগুলোর সংখ্যাধিক্য এবং পারস্পরিকভাবে সাংঘর্ষিক হবার বিষয়টি উত্থাপন করে সম্ভাব্য সকল উত্তর সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করা।

ধরুন, আপনি একজন নাস্তিক। একজন ধর্মে বিশ্বাসী লোক—সেটা যেকোনো ধর্ম হতে পারে—আপনাকে এসে প্রশ্ন করলো, "আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না কেন?" অথবা ধরুন আপনাকে প্রশ্ন করা হলো, "আপনি কী বিশ্বাস করেন?" এ ক্ষেত্রে ধর্মে বিশ্বাসী লোককে ওপরের প্রশ্ন করে আপনি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিতে পারবেন—"কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করবো? কোন ধর্মে

বিশ্বাস করবো? এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর কী? সঠিক উত্তর কীভাবে বের করবো, যখন সবাই বলছে তার উত্তরই সঠিক?” এটুকু বলে ধর্মে বিশ্বাসী লোকটাকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেয়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাস্তিকরা বলে, “(অতএব) ধর্ম-টর্ম এগুলো মানুষ নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে, আর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখন এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহ-ঈশ্বর-ভগবান এসব কিছু নেই, সব মানুষের বানানো...” ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো, যে প্রশ্ন থেকে এই আলোচনার শুরু, সেই প্রশ্ন থেকে কি যৌক্তিকভাবে এই উপসংহারে পৌঁছানো যায়? অনেক ধর্ম থাকা, এবং এ ধর্মগুলোর বক্তব্য সাংঘর্ষিক হওয়া কি সব ধর্মের ভুল হবার প্রমাণ?

আলোচনা সম্ভবত একটু বেশি তাত্ত্বিক হয়ে যাচ্ছে, আমি একটি উদাহরণ দিয়ে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করি।

মনে করুন, সমুদ্রপাড়ের একটি শহর। ধরুন, হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। একদিন সকালে শহরবাসী আবিষ্কার করলো, একটি ছোট্ট নৌকা সৈকতে এসে ভিড়েছে। নৌকাতে অচেতন দুটি প্রাণী। একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি এবং তার বুকে আনুমানিক ছয় মাসের একটি শিশু। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি মারা গেলো। তবে মৃত্যুর আগে কিছু সময়ের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়ে কিছু তথ্য জানিয়ে গেলো - শিশুটির মা তাদের সাথেই জাহাজে ছিলেন। জাহাজডুবি হওয়াতে তিনি এবং তার সন্তান জাহাজের অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

তিনি শহরের লোকেদের প্রতিজ্ঞা করালেন তার সন্তানকে দেখে রাখার এবং সন্তানের মা আসলে তার কাছে সন্তানটি তুলে দেবার। শহরের লোকজন আর কোনো তথ্য লোকটির কাছ থেকে জানার আগেই তিনি মারা গেলেন। ধরা যাক, এক বছর পর এক জাহাজে চেপে এক শ জন মহিলা হাজির হলো এবং সকলেই সেই শিশুটির মাতৃত্বের দাবি করে বসলো। এক শ জনের এক শ জনই নিজের দাবিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে সত্য বলে প্রচার করতে থাকলো। নিজের দাবির স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করলো। শহরের

লোকজন পড়লো মহাসমস্যায়। কী করা যায় তা ঠিক করার জন্য এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক ডাকা হলো।

বৈঠকে শহরের মেয়র দাঁড়িয়ে বললেন, *"উপস্থিত লোকসকল! আসুন দেখা যাক আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কী জানি। আমরা জানি :*

ক) এক শ জনের প্রত্যেকেরই এ শিশুর মা হওয়া সম্ভব না। যদি একজনের দাবি সঠিক হয়, তাহলে অবধারিতভাবে বাকি ৯৯ জনের দাবি ভুল।

খ) এই এক শ জনের মধ্যে আসলেই এ শিশুর মা উপস্থিত আছে—কেবল তাদের দাবির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না।

গ) এই এক শ জনের মাঝে শিশুটির প্রকৃত মা উপস্থিত নেই—এটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

ঘ) কোন মহিলা প্রকৃতপক্ষে এ শিশুটির মা—সেটাও নিছক দাবির ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না।

ঙ) যদি শিশুটির প্রকৃত মা এই এক শ জনের মাঝে উপস্থিত থাকে, তাহলে এটা আবশ্যক যে ৯৯% দাবিকারী এখানে মিথ্যা বলছে। আর যদি শিশুটির মা এখানে উপস্থিত না থাকে তাহলে এখানে ১০০% দাবিকারীই মিথ্যা বলছে।

অতএব হে শহরবাসী, আপনারা বলুন কীভাবে আমরা এ সমস্যার সমাধান করতে পারি?" মেয়রের কথার পর পিনপতন নীরবতা নেমে আসলো। মিনিটখানেক সবাই যেন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকলো। তারপর একটি শিশু দাঁড়িয়ে বললো, *"আমি জানি এ সমস্যার সমাধান কী। যেহেতু সবাই বলছে তার দাবিই সঠিক, যেহেতু প্রত্যেকের দাবি অন্যান্যদের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক এবং যেহেতু এখানে কমপক্ষে ৯৯% দাবিদার মিথ্যাবাদী, অতএব স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, এই শিশুটির আসলে কোনো মা-ই নেই। আমরা ধরে নেবো, নৌকায় চেপে আসা সেই ব্যক্তিও মিথ্যা বলেছে এবং মাতৃত্বের দাবিকারীরাও সবাই মিথ্যা বলছে। আর আমরা বিশ্বাস করবো, এই শিশুটির কোনো মা নেই, এবং তার কোনো বাবাও নেই। বাবা-মা ছাড়াই এ শিশু*

এসেছে। আর যেহেতু শিশুটির কোনো মা নেই, বাবাও নেই, তাই সেই ব্যক্তির কাছে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এটা মানতেও আমরা আর বাধ্য নেই।”

এই শিশুটির কথা কি যৌক্তিক? গ্রহণযোগ্য? হতে পারে সে অবুঝ, পাগল, প্রতিবন্ধী অথবা সে সঠিক উত্তর খুঁজতেই চায় না। কিন্তু তাকে কি আদৌ সত্যান্বেষী বলা যায়? নাস্তিকদের এই ‘যুক্তি’ এবং এর ভিত্তিতে দেয়া তাদের উপসংহার হলো এই শিশুর কথার মতো। যেহেতু সবাই নিজেকে ঠিক দাবি করছে, যেহেতু অনেকে দাবি করছে, তাই সব ধর্মই নিশ্চিতভাবে ভুল এবং কোনো স্রষ্টা নেই! ধর্মের সংখ্যাধিক্য এবং ধর্মগুলোর বক্তব্য পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়া প্রতিটি ধর্মের ভুল হবার প্রমাণ না, যদিও এটা অবধারিত যে সবগুলো ধর্ম সঠিক হতে পারে না। একই ভাবে অনেকগুলো ধর্ম থাকা, প্রতিটি ধর্মের বিভিন্ন বক্তব্য থাকা, স্রষ্টার অনস্তিত্বের প্রমাণ না।

যদি সমুদ্রপাড়ের শহরের মানুষ আসলেই সমস্যার সমাধান করতে চায়, তবে তাদের হয় পরীক্ষা করতে হবে যে মাতৃত্বের দাবিকারীরা কী কী দলিল-প্রমাণ উত্থাপন করেছে, অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে শিশুটির মাতৃপরিচয় সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত হতে হবে। সমস্যা বেশ জটিল তাই ধরে নিলাম এই শিশুর মা নেই, বাবা নেই—এটা কোনো সমাধান না। তাই নাস্তিকরা যা বলে তা না কোনো প্রমাণ, না কোনো সঠিক উত্তর। বরং তারা প্রমাণহীন, যৌক্তিকতাহীন আরেকটি দাবি, আরেকটি বিলিফ সিস্টেম বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আসে। আর তা হলো—কোনো স্রষ্টা নেই, স্রষ্টাকে মানার প্রয়োজনও নেই।[৩১]

---

[৩১] *এ ক্ষেত্রে অনেকে একটি যুক্তি দিতে পারেন—ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে শিশুর মাতৃত্ব নির্ণয় সম্ভব, কিন্তু এমন কোনো পরীক্ষা কি আছে যা দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব (বা অনস্তিত্ব) প্রমাণ সম্ভব? দু’টি কাঠামোগত কারণে এই যুক্তি ভুল। প্রথমত, এই উদাহরণ বা থট এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে না। এখানে শুধু এটাই উপস্থাপন করা হচ্ছে যে একাধিক সাংঘর্ষিক দাবি থাকার অর্থ এই না যে—সকল দাবিই মিথ্যা। অনেক সাংঘর্ষিক দাবি থাকার অর্থ এই না যে, যে বিষয়ে দাবি করা হচ্ছে সেই বিষয় অস্তিত্বহীন। যেহেতু অনেক সাংঘর্ষিক দাবির কারণে বলা যায় না—পিতামাতা ছাড়া শিশুটি অস্তিত্বে এসেছে।*

কিন্তু যেখানে তারা ভাঁওতাবাজি করে, বুঝে কিংবা না বুঝে, তা হলো—দুনিয়ার সব ধর্মকে যদি তারা ভুল প্রমাণ করেও (যেটা তারা করতে পারে না) তবুও কিন্তু স্রষ্টার অনস্তিত্ব—'স্রষ্টা নেই'—এটা প্রমাণিত হয় না।

সুতরাং অন্য ধর্ম কেন ভুল বা 'প্রত্যেক ধর্মের ভুল হবার ৯৯% সম্ভাবনা আছে'—এ ধরনের কথা না বলে তাদের উচিত এটা প্রমাণ করে দেখানো যে, তাদের দাবি সঠিক। কিন্তু তারা এই কাজটা করে না। তারা বরং আলোচনাকে ডাইভার্ট করে বা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে| কথার মারপ্যাঁচ আর রেটোরিকাল যুক্তি দিয়ে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু অপরের দাবির ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ না। অর্থাৎ নাস্তিকদের অবস্থানটা হলো, তারা বিশ্বাস করে স্রষ্টা নেই। কিন্তু তারা তাদের এই দাবির পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন

এখানে বলা হচ্ছে, স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার কোনো উপায় না থাকা সত্ত্বেও, স্রষ্টার ব্যাপারে অনেক সাংঘর্ষিক দাবি থাকার কারণে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই এমন কথা বলা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক। সুতরাং, এখানে স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু নাস্তিকতার পক্ষে উপস্থাপিত একটি যুক্তির ফ্যালাসিকে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, একটি থট এক্সপেরিমেন্টের নির্দিষ্ট একটি ভিত্তি বা premise থাকে। এর বাইরে গিয়ে থট এক্সপেরিমেন্টের সমাধান করা যায় না। বক্সের মধ্যে একটি ভিডিও ক্যামেরা রেখে দিলেই বা একটা এক্সরে মেশিন ব্যবহার করলেই তো জানা যায় শ্রডিঞ্জারের বিড়াল জীবিত নাকি মৃত— চা-র দোকানের এই উত্তর শুনতে হয়তো যৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি এভাবে চিন্তা করছে, সে থট এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্য, premise, কাঠামো—কোনোটাই বোঝে নি। একই ভাবে এই লেখার থট এক্সপেরিমেন্টে হাজার বছর আগের একটি সমুদ্রপাড়ের শহরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এমন একটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যেখানে দাবিকৃত বিষয়ের ব্যাপারে (অর্থাৎ মাতৃত্ব নির্ণয়) নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই। শিশুটির মা কে, তা যদি নিশ্চিতভাবে নির্ণয়ের উপায় থাকেই, তাহলে শহরবাসীর বৈঠক করা, এ নিয়ে চিন্তিত হওয়া, এ সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খোঁজা—এসব কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি এখন বলে বসেন, এখানে ডিএনএ টেস্ট করলেই তো হয়, তাহলে সম্ভবত আলোচনা তার জন্য খুব জটিল হয়ে গেছে, অথবা তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়েননি। যেটাই হোক, তার উচিত এই আলোচনাতে অংশগ্রহণ এবং নিজেকে হাস্যস্পদ করা থেকে বিরত থাকা।

করতে পারে না। স্রষ্টা আছে—এই দাবিকে তারা ভুলও প্রমাণ করতে পারে না এবং মহাবিশ্বের উৎস ও সূচনার কারণ হিসেবে কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না।

বরং তারা একটা স্ট্যাটিস্টিকাল পয়েন্টে তর্কটা নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তারা বলতে চায়—যদি অনেক ধর্ম থাকে আর এর মধ্যে শুধু একটি ধর্মই সঠিক হতে পারে, তাহলে স্ট্যাটিস্টিকালি একজন নাস্তিকের অবিশ্বাস ততোটাই যৌক্তিক যতোটা একজন বিশ্বাসীর বিশ্বাস। দুটোরই ভুল হবার সম্ভাবনা সমান। (তাদের এই অবস্থানের মাঝেও একটা ভুল আছে, তবে সেই আলোচনাতে এখন যাচ্ছি না।)

সমস্যা হলো কোনো চায়ের আড্ডায়, কিংবা তর্কবিতর্কের ক্ষেত্রে এ ধরনের আর্গুমেন্টের ব্যবহার হয়তো একজন নাস্তিকের অবস্থানকে অপরের সামনে জাস্টিফাই করার ক্ষেত্রে কার্যকর, কিন্তু মূল বিষয়ে, অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের বিষয়ে, পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কোনো কিছুই এ ধরনের আর্গুমেন্ট থেকে পাওয়া যায় না। আপনি যদি দুনিয়ার সব ধর্মকে ভুল প্রমাণিত করেনও, তাও কিন্তু এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া হয় না। এছাড়া এই স্ট্যাটিস্টিকাল পয়েন্টটা এমন-সব প্রশ্নের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর একটি। কারণ যেকোনো প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর সঠিক হবার অর্থ অবশ্যই অন্য সব সম্ভাব্য উত্তর ভুল।

ধরুন, একটি কাচের জারে নির্দিষ্টসংখ্যক বিভিন্ন আকার ও রঙের ছোট ছোট রাবারের বল আছে। আপনি যদি জারটি এক নজর দেখিয়ে মানুষকে প্রশ্ন করেন—"বলুন তো, এখানে কয়টি বল আছে?"

তাহলে এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যা অসীম। যদি হাজার জনকে প্রশ্ন করেন হয়তো হাজারটা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাবেন। কিন্তু তার অর্থ কি এ প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর নেই? অবশ্যই না। নিশ্চয় একটি নির্দিষ্টসংখ্যক বল সেই জারে থাকবে, এই সংখ্যা বদলাবে না। নিশ্চয় সঠিক উত্তর একটিই হবে এবং

তা ছাড়া বাকি সব উত্তর ভুল হবে। সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যাধিক্য ও তাদের পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়া প্রমাণ করে না যে, কোনো সঠিক উত্তর নেই।[৩২]

ধর্মের অনুসরণ, ধর্মীয় অনুশাসন পালন—এগুলো স্রষ্টায় বিশ্বাসের পরবর্তী ধাপ। আবশ্যক প্রথম ধাপকে এড়িয়ে গিয়ে তর্কে জেতা কিংবা নিজের অবস্থানকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই হতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সত্যের অন্বেষণ না। একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তি যিনি সংশয়ে আছেন, তিনি আগে এই প্রথম ধাপের মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন। আর একজন ক্যারিয়ার নাস্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাইয়ের মাধ্যমে তর্কে জেতার চেষ্টা করবে।

সুতরাং যদি কোনো নাস্তিক পরবর্তীতে এই প্রশ্ন আপনার সামনে উপস্থাপন করে, তাহলে তর্কে জিততে চাইলে তাকে বলুন—

---

[৩২] *নাস্তিকরা বলতে পারে, এই উদাহরণ তৈরি করা হয়েছে পিতামাতা ছাড়া শিশু জন্মাতে পারে না—এই প্রমাণিত বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে। জারের উদাহরণেও জারের মধ্যে বল আছে আগে এটা ঠিক করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু স্রষ্টা আছে সেটা একই ভাবে প্রমাণিত না। তাই এটি একটি False Analogy. সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে, এটি False Analogy না, কারণ এ থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হচ্ছে না। শিশুর জন্য যেহেতু পিতামাতা থাকা আবশ্যক, তাই অবশ্যই মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক—এই যুক্তি এখানে দেয়া হচ্ছে না। এখানে শুধু বলা হচ্ছে দাবিদার অনেক হওয়া, কিংবা অধিকাংশ বা সকল দাবিকারীর দাবি মিথ্যা হওয়াও প্রমাণ করে না যে, শিশুটি পিতামাতা ছাড়া জন্মেছে। সম্ভাব্য উত্তর অনেক হওয়া প্রমাণ করে না যে, 'জারে কয়টি বল আছে'—এই প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর নেই।*

একই ভাবে অনেক ধর্ম থাকা এবং তাদের বক্তব্য পারস্পরিকভাবে সাংঘর্ষিক হওয়াও কোনোভাবেই প্রমাণ করে না যে, স্রষ্টা নেই। স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নটা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের সঠিক বা বেঠিক হবার ওপর নির্ভরশীল না, কোনোভাবে সংযুক্তও না। বরং আমরা এটাই বলছি যে, ধর্মের সংখ্যা, ধর্মের বক্তব্য, তাদের পারস্পরিক সংঘাত ইত্যাদি ছেড়ে মূল আলোচনায় আসুন। অহেতুক পানি ঘোলা করা বাদ দিয়ে, মূল প্রশ্নের মীমাংসা করুন। একজন বা একাধিক স্রষ্টা আছেন কি না, সেই আলোচনায় আসুন।

যদি আমি ধরে নিই, দুনিয়ার সব ধর্মই ভুল, তবুও তো সব ধর্মের ভুল হওয়া তোমার বিশ্বাসকে (নাস্তিকতার বিশ্বাস—স্রষ্টা নেই, পরকাল নেই, স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির দায়বদ্ধতাও নেই) সত্য প্রমাণ করে না। তাই তাদের ভুল তোমার পক্ষে প্রমাণ না; বরং তুমি তোমার দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করো। আর যদি তুমি সেটা না পারো, তাহলে একজন অন্ধবিশ্বাসী আর তোমার মতো অন্ধ অবিশ্বাসীর মাঝে পার্থক্য কী?

যদি আসলেই কেউ সত্যান্বেষী হন, তাহলে এসব মুখস্থ প্রশ্ন বাদ দিয়ে তার উচিত—ভিন্ন একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা, রেটোরিকাল কুতর্ক ছেড়ে মূল বিষয়ে প্রশ্ন করা, শেকড় থেকে শুরু করা।

এই মহাবিশ্বের অরিজিন কী? পৃথিবী, সৌরজগৎ, ছায়াপথ নীহারিকা থেকে শুরু করে ইলেক্ট্রন, প্রোটন পর্যন্ত—ম্যাক্রো স্কেল থেকে শুরু করে ন্যানো স্কেল পর্যন্ত— এ সবকিছু কি নিজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে? নাকি এগুলো সব সময় ছিল এবং সব সময় থাকবে? নাকি এগুলো নির্দিষ্ট এক পর্যায়ে শুরু হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় পর বিলীন হয়ে যাবে; আর এর পুরোটাই হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে?

নাকি এসব কিছুর একজন স্রষ্টা আছেন?

‘স্রষ্টাতত্ত্ব’ যদি সত্য হয়, তাহলে বিজ্ঞানীদের বেশিরভাগই কেন নাস্তিক?

আরিফ আজাদ

খুব কমন এবং ইমপর্ট্যান্ট একটি প্রশ্ন। ইন্টারেস্টিংও বটে। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে বেশ কিছু ব্যাপারে। প্রথমত, আমি সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে সময়ে চার্চের পাদ্রিদের সাথে বিজ্ঞানের একটা বৈরী সম্পর্ক ছিল। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর সাথে ঘটা ঘটনাটা বেশ উল্লেখযোগ্য। ইউরোপ-আমেরিকায় তখন ছিল পাদ্রিদের যুগ। পাদ্রিদের যুগ বলছি এই কারণে যে, পাদ্রিরাই ছিল তখন সমাজের সর্বেসর্বা। তারা যা-ই বলবে তা-ই ‘ঠিক’, তাদের বিপরীতে কেউ কিছু বললেই পেতে হতো ধিক্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং মৃত্যুদণ্ডও। তারা যে কেবল সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল, তা নয়। তারা সমানভাবে সে সময়ের বিজ্ঞানী মহলকেও নিয়ন্ত্রণ করতো।

তো, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে যেহেতু পৃথিবীকেই সবকিছুর কেন্দ্র বলা হয়েছে, পাদ্রিদের কাছে সেটাই ছিল ধ্রুব সত্যের মতোন। এমন অবস্থায়, গ্যালিলিও এসে যখন প্রচার করা শুরু করলো যে পৃথিবীই সবকিছুর কেন্দ্র নয়, আমাদের দৃশ্যমান সবকিছুর কেন্দ্র আসলে সূর্য, তখন খ্রিষ্টান পাদ্রিসমাজ গ্যালিলিওকে মেনে নিতে পারেনি। তারা গ্যালিলিওর ওপর নির্যাতন শুরু করে এবং তাকে তার মতবাদ প্রচার থেকে বিরত হতে বলে। কারণ, গ্যালিলিও যা প্রচার করছে, সেটা সরাসরি বাইবেলের সাথে সাংঘর্ষিক। মোটামুটি এ রকমই ছিল সেই পাদ্রিযুগের পরিবেশ। যা কিছু অন্যরা বলতো, তা পাদ্রিদের মন রেখে বলতে হতো। পাদ্রিদের বিরোধিতা করে কেউ কিছু বলতে পারতো না।

বললেই তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হতো। নির্যাতন করা হতো। মোটামুটি, পাদ্রিরা একপ্রকার স্বৈরাচারের ভূমিকায় ছিল বলা যায়।

পাদ্রিরা এ রকম করতো দুটি কারণে—

এক. তারা যেহেতু সমাজে নিজেদের সর্বেসর্বা ভাবতো, তাই অন্যের মতো যখন তাদের মতের ওপর প্রাধান্য পাবে, তখন সমাজ থেকে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে।

দুই. তাদের জীবিকানির্বাহের একমাত্র পদ্ধতিই ছিল এটা। মানুষকে অন্ধকারে রেখে নিজেদের মতো করে আইন করে তারা ফায়দা লুটতো। এমতাবস্থায়, সত্য জানাজানি হয়ে গেলে মানুষ তাদের আর মান্য করবে না। ফলে, সমাজে তাদের ডমিনেশান কমে যাবে। জীবিকানির্বাহের মাধ্যম বন্ধ হয়ে পড়বে ইত্যাদি।

আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি এতসব গল্প বলছি কেন, তাই না? এই গল্প বলার কারণ হলো, পাদ্রিদের সেই যুগ সময়ের বিবর্তনে শেষ হলেও, আমরা ঢুকে পড়েছি আরেকটি পাদ্রিদের যুগে। আগের যুগে পাদ্রিগণ ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে কবজা করলেও, বর্তমানের পাদ্রিগণ মানুষকে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কবজা করে রেখেছে।

আরেকটু ক্লিয়ার করি। আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানজগৎকে (আরও ক্লিয়ারলি, বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিয়াকে) আষ্টেপৃষ্ঠে আছে বস্তুবাদীরা (*materialists*)। আর বস্তুবাদ হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের একটি প্রধানতম শাখা। আগেকার সময়ে, সমাজ থেকে বিজ্ঞানমহল, সবকিছুতেই যেমন পাদ্রিরা ডমিনেট করতো, বর্তমানে সমাজ থেকে বিজ্ঞানমহল, সবকিছুতে ডমিনেট করে এইসব ভোগবাদী, বস্তুবাদীরা। আমেরিকার 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স' এর মেম্বারদের মধ্যে ৯০% হচ্ছে এই বস্তুবাদীরা।

আপনি বলতে পারেন, 'এটার সাথে বিজ্ঞানীদের নাস্তিক হবার কী সম্পর্ক?' সম্পর্ক আছে। বস্তুবাদ তথা ভোগবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার স্পন্সর করা হয় প্রতিনিয়ত। বস্তুবাদের সাথে মেজর ধর্মগুলোর বেসিক

ডিফারেন্স হচ্ছে, ধর্ম বলে এই জীবনটাই শেষ জীবন নয়। মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন আছে। সুতরাং ধর্ম মেনে চলতে গেলে আপনাকে ধর্মের নির্দিষ্ট কিছু রুলস, কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। ধর্ম মানলে আপনার জীবনে আপনার ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা হয় না। আপনাকে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হয়। এই প্রাধান্য দিতে গিয়ে, আপনি চাইলেই 'যেমন খুশি তেমনভাবে' চলতে পারেন না। অবাধ, অবৈধ সেক্স করতে পারেন না, মদ খেতে পারেন না, অবাধ মেলামেশা করতে পারেন না ইত্যাদি।

কিন্তু বস্তুবাদ আপনাকে বলে—এই জীবনটাই শেষ জীবন। মৃত্যুর পরে আসলে কিচ্ছু নেই। সুতরাং জীবনটাকে যেমন খুশি এনজয় করো। এজন্যে, নাস্তিকদের অন্যতম প্রধান গুরু রিচার্ড ডকিন্স বলেছে, *"There is no God. So enjoy your life."*

মূলত, বস্তুবাদ প্রচারের অন্যতম কারণ হচ্ছে ব্যবসায়িক। বিশাল একটি অংশ যখন স্রষ্টা আছে জেনে ধর্মপালন শুরু করবে, তখন তাদের ব্যবসায়িক বিরাট লস হবে। আপনি যখন স্রষ্টার ভয়ে মদ খাবেন না, ফ্রি-সেক্স করবেন না, সুদ খাবেন না, ঘুষ নেবেন না, দুর্নীতি ইত্যাদি করবেন না, তখন বস্তুবাদীদের ব্যবসায় লালবাতি জ্বলবে। সুতরাং, বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ হচ্ছে—ব্যবসায়িক। এখন, বর্তমান বিজ্ঞানজগৎ হচ্ছে এই বস্তুবাদীদের দখলে। সুতরাং চালকের আসনে যখন বস্তুবাদীরা, তখন বর্তমান বিজ্ঞানজগৎ আর বিজ্ঞানীদের কাজই হলো, যেভাবে হোক, নাস্তিক্যবাদ তথা বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মের কবর রচনা করা। এর জন্য যা যা করা দরকার, তার সবটাই এই বস্তুবাদীরা করবে। ঠিক পাদ্রি সম্প্রদায়ের মতোন।

বর্তমান বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিয়াতে যারা কাজ করে, যারা রিসার্চ করে—তারা যদি স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েও থাকে, তবুও তারা তা মুখ ফুটে কখনোই বলতে পারে না। কারণ, যদি তারা স্বীকার করে আর প্রচার করে, তাহলে বস্তুবাদীদের নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাডেমিয়া থেকে সেই বিজ্ঞানীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হবে। অন্তত, রুটি-রুজি, সম্মান, প্রফেশন রক্ষার তাগিদে হলেও তাদের বস্তুবাদীদের মন জুগিয়ে চলতে হয়, তাদের কথামতো কাজ করতে হয়।

দু-একটি উদাহরণ দিই। বস্তুবাদ, নাস্তিক্যবাদ তথা ডারউইনিজম[৩৩] যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে সমাজে ন্যায়–অন্যায়ের মধ্যে কোনো ফারাক থাকবে না। ধর্ষণ, খুন, হত্যা ইত্যাদি আর অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না। এগুলোকে সময়ের বিবর্তনে, বিবর্তনের ধারায় জাস্ট '*Adaptive*' হিসেবে ধরা হবে। বেশ কিছুদিন আগে এসব বিবর্তনবাদীরা মানবশরীরে '*Crime Gene*' টাইপ কিছু একটার অস্তিত্ব নির্ণয়েরও চেষ্টা চালিয়েছে। *Crime Gene* হচ্ছে এমন একপ্রকার জিন, যা আমাদের *Crime* (অন্যায়) করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। অর্থাৎ, মানুষ যে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ করে, সেসব সে নিজের ইচ্ছাতে করে না। তার মধ্যে এই জিন থাকলেই সে এসব করে। যেহেতু এটা জেনেটিক্যালি হয়, সেহেতু এটা কোনো অপরাধ নয়।

বুঝতে পারছেন এদের দুরভিসন্ধি? যদি এই *Crime Gene* তত্ত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া যায়, তাহলে পৃথিবীতে আর কোনোকালেই ধর্ষণকে অন্যায় বলা যাবে না, খুনকে অন্যায় বলা যাবে না। মোদ্দাকথা, যা ইচ্ছা করো—সমস্যা নেই। এমন একটা পৃথিবী যদি হয়, তা কেমন হবে, ভাবুন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, পাদ্রিরা শক্তির বলে একসময় এসব করে বেড়াতো, আর বস্তুবাদীরা এখন বিজ্ঞানমহল দখল করে, বিজ্ঞানের নাম দিয়ে এসব করে বেড়ায়। এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য বিবর্তনবাদী র‍্যান্ডি থর্নহিল এবং ক্রেইগ পুলম্যানের বই *Natural History Of Rape* বইটা পড়া যেতে পারে, যেখানে ধর্ষণকে অপরাধ না বলে, বিবর্তনের ধারায় *Adaptive* বলে চালানো

---

[৩৩] ডারউইনিজম বলতে আসলে কী বোঝায়, তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এখানে ডারউইনিজম বলতে একটি সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও দর্শনকে বোঝানো হচ্ছে। যে বিশ্বাস বলে, বাহ্যিক কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া কেবল লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, 'প্রাকৃতিক' উপায়ে পৃথিবীতে জড় বস্তু থেকে প্রাণের সূচনা হয়েছে *(abiogenesis)*, এবং কালক্রমে প্রাকৃতিক নির্বাচন *(Natural Selection)* ও *Random Variation* এর মাধ্যমে এই বৈচিত্র্যময় প্রাণীজগৎ তৈরি হয়েছে, একধরণের প্রাণী অন্য ধরনের প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এখানে ডারউইনিজম বলতে নিছক সময়ের সাথে কোনো এক জাতের প্রাণীর মধ্যে পরিবর্তনকে *(change over time)* বোঝানো হচ্ছে না।

হয়েছে। শুধু এটা নয়। সমকামিতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও এরা মানবশরীরে *Homosexual Gene* নামের একধরনের জিনের অস্তিত্ব নির্ণয়েরও খুব প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে। অর্থাৎ, সমকামিতাও যে অপরাধ নয়, অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং এটাও যে একটা জেনেটিক্যাল ব্যাপার—সেটা প্রতিষ্ঠা করা।

সমস্যা হচ্ছে, কিছু সৎ বিজ্ঞানী এবং সৎ দার্শনিকদের জন্য তারা এগুলো গেলাতে পারে না মানুষকে। বিজ্ঞানমহলকে বস্তুবাদীরা এতটাই চেপে ধরে আছে যে, যখনই তারা এমন কোনো বিজ্ঞানীর নাম শোনে, যিনি বুদ্ধিমান সত্তার মাধ্যমে মহাবিশ্বের শুরু হবার কথা বলেন, তখন নাক সিটকে বলে—"উহু, *Creationist* কীভাবে আবার সাইন্টিস্ট হয়?" (আমাদের বাংলা নাস্তিকরা যেমন বলে—"আরে! মোল্লা আবার বিজ্ঞানের কী বোঝে, হুঁহ?")

বিবর্তনবাদীদের একসময়ের নেতা জুলিয়ান হাক্সলি-কে এক টকশোতে মার্ভ গ্রিফিন জিজ্ঞেস করলেন, *"Why do people believe in evolution?"* তিনি উত্তরে বলেছিলেন, *"The reason we accepted Darwinism even without proof, is because we didn't want God to interfere with our sexual mores."* অর্থাৎ, "প্রমাণাদি ছাড়াই বিবর্তনবাদকে আমরা মেনে নিয়েছি কারণ-আমরা চাই না, স্রষ্টা আমাদের যৌন আচার-আচরণের [স্বাধীনতায়] নাক গলাক।" আগেই বলেছিলাম, বিবর্তনবাদ তথা নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠা মানেই—অবাধ যৌনাচারের সার্টিফিকেট।

একসময়ের তুখোড় নাস্তিক লি স্ট্রোবেল তার *Case For Faith* বইতে লিখেছেন, *"I was more than happy to latch onto Darwinism as an excuse to jettison the idea of God so I could unabashedly pursue my own agenda in life without moral constraints."* অর্থাৎ—"ঈশ্বরের ধারণা থেকে পালানোর অজুহাত হিসেবে ডারউইনিজমের আশ্রয় নিয়ে আমি প্রচণ্ড খুশি হয়েছিলাম, কারণ এর ফলে নৈতিক বাধ্যবাধকতার তোয়াক্কা না করে আমি নিজের জীবনের খায়েশগুলো অকুণ্ঠচিত্তে পূরণ করতে পারবো।" বিবর্তনবাদ মেনে নিয়ে স্রষ্টাকে জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয়ার নেপথ্য কারণ

ছিল নৈতিকতা যেন তার জীবনে বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে (অর্থাৎ, বস্তুবাদ মেনে নিলে আপনি যেমন খুশি তেমন জীবন উপভোগ করতে পারবেন।)

শেষ কথা হলো, বিজ্ঞানীদের অধিকাংশেরই অ্যাকাডেমিয়াতে তাদের নিজের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। তাদের ওপরের মহল থেকে সব সময় একটা চাপে রাখা হয়। তাই চাইলেও তারা চাকরি, সম্মান, পদমর্যাদা ধরে রাখতে বলতে পারে না, *"I do believe in God..."* এটি কি শুধু বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিয়ার দৃশ্য? নাহ। এটি পুরো পৃথিবীর দৃশ্য। জোর যার, মুল্লুক তার। একটা মজার ঘটনা বলি। ঘটানাটাকে কেউ পলিটিক্যালি নেবেন না, অনুরোধ রইলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাবস্থায় দেখেছি—সেখানে ছাত্রশিবিরের একটা দাপট ছিল একসময়। হল থেকে শুরু করে ক্যাম্পাস—সবখানে। একটা সময় পরে ছাত্রলীগ এসে ছাত্রশিবিরের কাছ থেকে কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। এরপরে, যে ছেলেগুলো শিবির করতো, তাদের অধিকাংশকেই আবার ছাত্রলীগের মিটিং-মিছিলে যেতে দেখা গেলো।

কেন এমন হলো? *Yes, just to survive...*
থাকতে হলে আপনাকে করতেই হচ্ছে। নো আদার ওয়ে।

ঠিক এভাবেই বর্তমান বিজ্ঞানীমহলে 'বিজ্ঞানী' হিসেবে টিকতে হলে আপনাকে নাস্তিক হতেই হচ্ছে। মন থেকে না হোক, অন্তত, মুখ থেকে নাস্তিক না হলে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিয়াতে আপনার দুই পয়সারও মূল্য নেই।

বুদ্ধিমান সত্তা

মুহাম্মাদ তোয়াহা আকবর

প্রারম্ভিকা :

এই লেখাটিতে সায়েন্সের সাথে আমার, আপনার এবং স্রষ্টার একটা সংযোগ ঘটানো হয়েছে। আমাদের ক্লাসগুলোতে সায়েন্সের গাদা গাদা বোরিং তথ্য দেয়া হয় শুধু, পেছনের দর্শনটা কেউ আর শেখায় না। এটা পড়ার পর হয়তো আপনি নিজে নিজেই বিজ্ঞানের নতুন কিছু জানার সাথে সাথে ভেবে বের করে ফেলতে পারবেন এটার সাথে আপনার সম্পর্কটা কী এবং নিজের জীবনটাকে কীভাবে যাপন করা উচিত, সবকিছুর মাঝে একটা সম্পর্ক তৈরি করে ফেলে বেশ মজা পাবেন। তো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যাক।

গোবরনামা :

১০০ বছর আগের একটা ফটো সামনে তুলে ধরা হলো। গোবরের ফটো বলে মনে হচ্ছে। দূরে আউট অফ ফোকাসে একটা গোয়ালঘর এবং অনেকগুলো গরুও দেখা যাচ্ছে। তাতেই অবশ্য প্রমাণিত হয়ে যায় না যে, এটা গোবরের ফটো। যেহেতু এটা অতীতের ঘটনা, এবং ঘটনাটা ঘটার সময়ে আমি সেখানে ছিলাম না, সেহেতু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, এটা "গোবর"। এ ক্ষেত্রে এখন যে উপাত্তগুলো *(Data)* আমার কাছে আছে, তার ওপর ভিত্তি করেই আমাকে অতীতের সেই ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আমার সারাজীবনের পর্যবেক্ষণ থেকে যে পরিমাণ উপাত্ত আমার মাথায় জড়ো হয়েছে, তা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে এটা হাঁস কিংবা বিড়ালের বিষ্ঠা হতেই পারে

না। হাতির হওয়াও সম্ভব না। এটা ম্যাচ বাক্স, কম্পিউটার, মানুষ কিংবা টর্চ লাইটের ছবিও না আমি নিশ্চিত। কারণ, এতদিনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার সাথে মিলছে না। তবে হ্যাঁ, ষাঁড়ের হতে পারে। আবার দূরে যেহেতু গোয়ালঘর আর গরু দেখা যাচ্ছে, তাহলে ওই গরুগুলোরও হতে পারে। তবে রং, আকার-আকৃতি দেখে এইটুকু নিশ্চিত যে, এটা গরু জাতীয় কোনো নির্লজ্জ প্রাণীরই কুকর্ম!

এই সিদ্ধান্তে আসতে আমার অতীতে ওই ঘটনার সময়টাতে উপস্থিত থাকতে হয়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা পর্যবেক্ষণও করতে হয়নি। ঘটনাটা যেহেতু অতীতের, ফলে আমি নিজে এক্সপেরিমেন্ট এবং পর্যবেক্ষণ করিনি, এবং তা সম্ভবও নয়। শুধু উপাত্ত এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসার এই সায়েন্সটাকে বলা হয় *Historical Science*, আমি যার বাংলা করেছি "ইতিহাসের বিজ্ঞান"। এই বিজ্ঞানে শুধু *Effect* (গোবর) দেখেই তার পেছনের আসলে কার্যকারণটা (*cause*) কী ছিল সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্তে চলে আসা যায়।

এটাই নিয়ম।

আপনার তিনটি ঘটনা—প্রথম ঘটনা :

আপনার ফোনে লাস্ট যে মেসেজটা এসেছিল সেটা পড়ে কী মনে হয়েছিল? মেসেজটা তো পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন, নাকি? এটা তো নিশ্চিত যে মেসেজটা আপনাকে এমন একজন পাঠিয়েছে, যে পড়তে এবং লিখতে জানে। জানে, কীভাবে মেসেজ পাঠাতে হয়। পুরো প্রক্রিয়াটার পেছনে একটা বুদ্ধিমান সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার কোনো সন্দেহ নেই। আপনি বুদ্ধিমান হলে সন্দেহ থাকার কথা না আর কি! হা হা হা! অথচ মেসেজটা একটা ইঁদুর লিখেছে কি না আপনি দেখেননি। আপনি সেখানে ছিলেন না। পর্যবেক্ষণও করেননি। তবুও আপনি নিশ্চিত এটার (*effect*) পেছনে কোনো বুদ্ধিমত্তাকে *(cause)* থাকতেই হবে।

এবার ২য় :

আমি যদি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করতে করতে গলা ফাটিয়ে দিনরাত বলতে থাকি -

‘*Angry Birds*’ গেইমটার পেছনে কোনো বুদ্ধিমান সত্তার হাত নেই, সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতিতে এলোমেলোভাবে (*random*) নিজে নিজেই এটা তৈরি হয়ে গেছে। শুধু তাই না, যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে গেইমটা চলছে, সেটা স্যামসাং কোম্পানি বানায়নি। বরং সেটাও প্রকৃতিতে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর থাকার ফলে তৈরি হয়ে গেছে। এমনকি এর গায়ে খোদাই করা স্যামসাং কথাটাও এভাবেই এসেছে। আমি আপনাকে হাজার (কু) যুক্তি দিয়ে বোঝালেও আপনি এটা মেনে নিতে পারবেন না। আমাকে পাগল ভাববেন, ঠিক? কারণ, আপনি জানেন সামান্য স্যামসাং শব্দটাও সময়ের স্রোতে ফোনের গায়ে খোদাই হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মিলিয়ন মিলিয়ন বছরেও নয়। অসম্ভব। সামান্য ৬টা ইংরেজি অক্ষর যেখানে সময়ের স্রোতে ফোনের গায়ে খোদাই হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে অ্যান্ড্রয়েড ফোন নিজে নিজে তৈরি হয়ে যাওয়া তো অনেক অনেক দূরের কথা।

আর গেইমটার পেছনে যে হাজার হাজার লাইনের প্রোগ্রামিং কোড লেখা হয়েছে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা দিয়ে, এবং সেটা যে অন্ততপক্ষে একজন দক্ষ বুদ্ধিমান প্রোগ্রামার ছাড়া হওয়া কোনো দিনও সম্ভব না, এটাও আপনি ভালোভাবেই জানেন।

আমি যতোই আউল-ফাউল যুক্তি দিই, প্রোবাবিলিটির অংক কষে আপনাকে দেখাই, আপনি যে টলবেন না সেটা আমি নিশ্চিত। অথচ ফোন কিংবা গেইমটা প্রস্তুত হয়েছে অনেক আগে। অতীতে। আপনি নিজের চোখে দেখেননি এটা কীভাবে প্রস্তুত হয়েছে। তবুও আপনি অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত

জানেন, এই ফোন আর গেইমসের (*effect*) পেছনে অনেকগুলো বুদ্ধিমত্তার পরিশ্রম (*cause*) জড়িত।

তৃতীয় গল্প :

আমার বিড়ালটাকে কিবোর্ডের ওপর ছেড়ে দেয়ায় সে তার ওপর কিছুক্ষণ এলোমেলো দৌড়ালো। খটাখট করে অনেক কিছু টাইপ হয়ে গেলো খুলে রাখা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলটাতে। বিড়ালটাকে নামিয়ে ফাইলটাকে '*Random*' নামে সেইভ করলাম। এবার আমি বিড়াল নিয়ে একটা রচনা লিখলাম টাইপ করে। ফাইলটাকে '*Essay*' নামে সেইভ করলাম। দুইটা ফাইলেরই সাইজ হলো *50 KB.*

এরপর আপনাকে ঘাড় ধরে এনে আমার কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে ফাইল দুটো দেখিয়ে, মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বললাম, "ঠিক করে বল ব্যাটা, কোন ফাইলটা আমি টাইপ করেছি? এখানে একটা আমার টাইপ করা, আরেকটা আমার বিড়ালের।" কাঁপা কাঁপা হাতে ফাইল দুটো ওপেন করেই আপনি বুঝে যাবেন, '*Essay*' ফাইলটা আমার টাইপ করা। কেন? কারণ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এখানে প্রতিটা অক্ষর সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ লেখা হয়েছে। শব্দগুলোকে সাজিয়ে বাক্য সাজানো হয়েছে। বাক্যগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে, সেগুলো এক-একটা অর্থবোধক অনুচ্ছেদ তৈরি করেছে। সবগুলো অনুচ্ছেদ মিলে একটা রচনা তৈরি করেছে। এটা কোনোভাবেই আমার বিড়ালের পক্ষে করা সম্ভব না। এ রকম সাজানো গোছানো রচনার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধিমত্তার হাত রয়েছে। যেহেতু এখানে আপনাকে দেয়া অপশান মাত্র দুইটা—আমি আর আমার বিড়াল, সেহেতু আপনি এটা নিশ্চিত যে, রচনাটা আমারই লেখা। ঠিক?

টাইপ হওয়ার সময় আপনি সেখানে ছিলেন না। ঘটনাটা অতীতে ঘটেছে। পর্যবেক্ষণ না করেও '*Essay*' ফাইলটার (*effect*) পেছনে যে বিড়ালটার বদলে আমার অবস্থানই (*cause*) বেশি যুক্তিযুক্ত, এটা আপনি কীভাবে জানলেন? আপনার এতদিনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থেকে। বেশ তো তিনটা ঘটনা একটানা পড়ে ফেললেন। এবার একটা সিদ্ধান্তে আসা যাক। কী বলেন?

সিদ্ধান্ত :

মেসেজ, গেইম, কিংবা ফাইলটাতে আসলে কী ছিল? ছিল *Information* তথ্য। ইনফর্মেশান বা তথ্য আছে কীভাবে বুঝলাম? বুঝলাম কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রতিটি ঘটনাই অর্থপূর্ণ উপাত্ত এবং জ্ঞান বহন করছিল। তথ্য বহন করছিল। এবং আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সব সময়েই জানি যেকোনো অর্থপূর্ণ ইনফরমেশান বা তথ্যের পেছনে বুদ্ধিমত্তার উপস্থিতি থাকতেই হবে। ওপরের অংশটুকু *Science* / এই সায়েন্স আমাদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে যদি আমরা ভাবি, এবং এর পেছনের দর্শনটুকু উপলব্ধি করতে পারি।

সামান্য বিজ্ঞান আর পেছনের দর্শন :

যদি আমরা নিজেদের দিকে, নিজেদের চারপাশের জগতের দিকে তাকাই, ভেবে দেখি, তাহলে আমরা অবাক হয়ে যাবো। আমরা জানি যে, প্রতিটা প্রাণীর একদম গাঠনিক একক হচ্ছে কোষ। সেই কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা *DNA* তে *A, T, G, C* নামের চারটা অক্ষর দিয়ে সাজানো আমাদের পুরো শরীরের গঠন কেমন হবে তার ব্যাপারে তথ্য। আজিব না?

এই ডিএনএ-তেই লেখা আছে আমার নাক কেমন হবে, কান কেমন হবে, চোখের রং কেমন হবে, চুল কি কোঁকড়ানো হবে, নাকি সোজা! এই যে আমার এত জটিল মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে জটিল হৃৎপিণ্ড, চোখ, ফুসফুস, কিডনি এসব কিন্তু যাত্রা শুরু করেছে আমার আব্বু আর আম্মুর দুইটা ছোট্ট কোষের

fertilization থেকে। এই কোষগুলোতে ছিল ডিএনএ, যাতে লেখা *Genetic Code* অনুযায়ী পরবর্তীতে টিস্যু এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তৈরি হয়েছে। সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একত্র হয়ে এক একটা সিস্টেম বা তন্ত্র তৈরি করেছে। যেমন, নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তথা পরিপাকতন্ত্র, ইউরিনারি সিস্টেম অর্থাৎ রেচনতন্ত্র ইত্যাদি। সবগুলো সিস্টেম আবার একত্র হয়ে একসাথে অর্থপূর্ণভাবে কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করার ফলেই তৈরি হয়েছে আমার পুরো শরীর। এই শরীরটা ব্যবহার করে আমি এখন লিখছি আর আপনি পড়ছেন।

এই যে ডিএনএ-তে *Genetic Code* লেখা আছে, যেটা আমার শরীরের গঠন কেমন হবে না হবে তার পুরোটাই ঠিক করে দিচ্ছে, এটা কি প্রথম কোষটাতে এমনি এমনি চলে এসেছে? অর্থবোধক একটা মেসেজ, একটা প্রোগ্রামিং কোড এবং একটা গোছানো রচনা নিজে নিজে আসতে পারে না এটা আপনি জানেন। ডিএনএ কিন্তু প্রোগ্রামিং কোডের মতোই *Genetic Code* বহন করে। বহন করে অর্থপূর্ণ মেসেজ, যে মেসেজ বলে দেয়, একটা শরীর কীভাবে রচিত হবে। একটা প্রাণীর শরীর তো অনেক অনেক জটিল ব্যাপার। সেটার কথা বাদ দিয়ে যদি তার ভেতরে থাকা ডিএনএ'র ভাষা, সজ্জা এবং অর্থবহতার দিকে তাকাই, তাহলে এই ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে, অবশ্যই অবশ্যই এর পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্তা (*Intelligence*) রয়েছেন।

সেই বুদ্ধিমান সত্তা কিন্তু নিজেকে সবকিছুর স্রষ্টা দাবি করে আরও একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন আমাদের ম্যানুয়াল হিসেবে, চলার পথ হিসেবে, জীবনকে যাপনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে। সেই পদ্ধতি যে শুধু থিওরিটিক্যাল না, প্র্যাকটিক্যালও, সেটারও প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর বার্তাবাহকের (ﷺ) মাধ্যমে।

আচ্ছা, এবার নিজেকে একটা প্রশ্ন করি। আমরা সেই মেসেজ অনুযায়ী পুরো জীবনটাকে যাপন করছি তো?

অবিশ্বাসের বিশ্বাস

আসিফ আদনান

দুটো প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক।

১) যে বইটার দিকে তাকিয়ে আপনি এই মুহূর্তে এই বাক্যটা পড়ছেন, তার আয়তন কতো?
২) একজন মানুষের মূল্য কতোটুকু?

এই দুটো প্রশ্নের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে করেন?

প্রথম প্রশ্নটার একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর আছে। নির্দিষ্ট ও সুসংজ্ঞায়িত পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর বের করা সম্ভব। আর কোনো উত্তর পাওয়া গেলে সেই উত্তর সঠিক কি না, তা যাচাই করারও সুযোগ আছে।
এই একই কথাগুলো কি দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে খাটবে?

আপনার মূল্য কতো?

একজন কেমিস্ট হয়তো দেখবে আপনার দাঁতে কয়টা গোল্ড ফিলিং আছে, আর যদি থাকে, তবে সম্ভবত সেটাই তার দৃষ্টিতে আপনার শরীরের সবচেয়ে দামি অংশ হবে। একজন সাইকোলজিস্ট হয়তো আপনার আইকিউ মাপার চেষ্টা করবেন। একজন সোশিওলজিস্ট হয়তো আপনার সামাজিক গুরুত্ব মাপার চেষ্টা করবেন। রাজনৈতিক হিসেব অনুযায়ী নির্বাচনের বছর আপনার দাম বাড়বে, বাকি সময়টা শূন্যের কাছাকাছি থাকবে। ঢাকার রাস্তার ভাসমান পতিতারা হয়তো আপনাকে ঘণ্টা ধরে রেইট বলতে পারবে। সবাই নিজ নিজ

অবস্থান থেকে, নিজ নিজ মাপকাঠি অনুযায়ী, নিজ নিজ মূল্যবোধের আলোকে বিভিন্ন উত্তর দেবে। এর মধ্যে কোনো একটি উত্তর সঠিক কি না—সেটা যাচাই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। ইন ফ্যাক্ট, এই প্রশ্নের আদৌ কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর আছে কি না—সেটাও আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। একজনের মানুষের জীবনের মূল্য কি সব সময় ধ্রুব থাকে? সব মানুষের জীবনের মূল্য কি সমান? একজন ঘুষখোর সরকারি কর্মকর্তা আর একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবনের মূল্য কি সমান? যদি সমান না হয়, তাহলে কার জীবনের মূল্য বেশি? কীসের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা হবে?

এই প্রশ্নগুলো আর প্রথম প্রশ্নটি মৌলিকভাবে আলাদা। বিজ্ঞান একটির জবাব দিতে পারে। আরেকটির জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ কি মানবজীবন মূল্যহীন? তার অর্থ কি আপনার অস্তিত্ব মূল্যহীন? তার অর্থ কি এই প্রশ্নগুলো অগুরুত্বপূর্ণ? বিজ্ঞান কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারার অর্থ কি ওই প্রশ্নের উত্তর নেই বা ওই প্রশ্ন মূল্যহীন? নিঃসন্দেহে যেকোনো সুবিবেচক মানুষ স্বীকার করবে, এই প্রশ্নগুলো এবং এদের উত্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বিজ্ঞানের পক্ষে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া সম্ভব না। আর যারা নিজেরা বিজ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানকে পছন্দ করেন, তাদেরও এখানে অখুশি হবার কোনো কারণ নেই। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না, কারণ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া বিজ্ঞানের কাজ না; দর্শনের কাজ। এই প্রশ্নগুলো মেটাফিযিকাল-দার্শনিক।[৩৪] বিজ্ঞানের একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডি আছে। বিজ্ঞানের কাজ সেই গণ্ডির ভেতরে। বৈজ্ঞানিক গ্রহণযোগ্যতা এই গণ্ডির ভেতরের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যা কিছু এই গণ্ডির বাইরে, সেসবের ব্যাপারে বিজ্ঞানের বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক, প্রমাণিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করার কোনো উপায় নেই। যেমনভাবে মানবজীবনের দামের ব্যাপারে কেমিস্ট,

---

[৩৪] এখানে দর্শন ও মেটাফিযিক্স বলতে গ্রিক দর্শন বা এর সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলোকে বোঝানো হচ্ছে না। মানুষের অস্তিত্বের সাথে জড়িত প্রশ্নগুলোর (*Existential Questions*) উত্তর খোঁজার জন্য মানবমনের যে সাধারণ চিন্তার (দার্শনিক) প্রবণতা—সেটাকে বোঝানো হচ্ছে।

বায়োলজিস্ট, ফিযিসিস্ট কিংবা ফিযিশিয়ানের বক্তব্যকে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব না।

এবার আসুন অন্য কিছু প্রশ্নের দিকে তাকানো যাক।

- কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কোনো কিছু আছে?
- মানুষের আত্মা কোথা থেকে আসলো?
- বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতা[৩৫] (*Consciousness*) কীভাবে সৃষ্টি হলো?
- মহবিশ্বের শুরু কেন হলো?

এই প্রশ্নগুলোর বেশ কিছু উত্তর প্রচলিত আছে। আস্তিক ও নাস্তিকরা নিজ নিজ আদর্শিক অবস্থান থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে। তবে আপনি যে উত্তরই গ্রহণ করেন না কেন, এর কোনোটাকেই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক প্রমাণিত করা সম্ভব না। আপনি আস্তিক হন কিংবা নাস্তিক। সেটা পাথরের স্তূপ থেকে সচেতনতা, বুদ্ধিমত্তা আর আত্মা সৃষ্টি হবার কথা বলুন, স্ট্যান্ডার্ড বিগ ব্যাং মডেলের কথা বলুন, কিংবা একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কথা বলুন। কোনোটাই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, সংশয়ের ঊর্ধ্বে থাকা সত্য না।

সুতরাং দিনশেষে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব না। আস্তিক ও নাস্তিকরা নিজ নিজ বিশ্বাসের জায়গা থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়। কারও অবস্থানই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক বা ভুল প্রমাণ করা সম্ভব না। তাহলে কেন এই প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু উত্তরকে সায়েন্টিফিক বা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে ধরে নেয়া হবে, প্রচার করা হবে, আর বাকিগুলোকে অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দেয়া হবে? অথচ এই প্রশ্নগুলোই

---

[৩৫] বাংলাতে *Consciousness* এর কোন জুতসই প্রতিশব্দ না থাকায় "সচেতনতা" ব্যবহার করা হল। যদিও *Consciousness* দিয়ে যা বোঝানো হয় তা সম্পূর্ণভাবে "সচেতনতা"'র মধ্যে ধরা পড়ে না।

বিজ্ঞানের আওতার বাইরে এবং বিজ্ঞান এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে অক্ষম। এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আস্তিক ও নাস্তিক দুই দলের অবস্থানই বিশ্বাসের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো। আস্তিকদের বিশ্বাসের মতো নাস্তিকদের অবিশ্বাসও বিশ্বাসপ্রসূত। কিন্তু নাস্তিকরা তাদের ফেইথ-বেইসড এই উত্তরগুলোকে বিজ্ঞানের পোশাক পরিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রচার করতে চায়।

নাস্তিকরা কেন মনে করে তাদের এমন কোনো বিশেষ মর্যাদা আছে, যে কারণে তারা তাদের বিশ্বাসকে মানুষের সামনে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে উপস্থাপন করবে, আর তাদের এই বিশ্বাসকে বাকিদের সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে? আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই যদি বিশ্বাসের জায়গা থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়, তাহলে কেন নাস্তিকদের বিশ্বাসকে সত্য বলে ধরে নিতে হবে আর আস্তিকদের বিশ্বাসকে মিথ্যা? নাস্তিকরা কেন মনে করে তারা প্রেফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্ট পাবার যোগ্য?

“*কেউ কি স্রষ্টার অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে? কোয়ান্টাম কসমোলজি কি মহাবিশ্বের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পেরেছে? কেনই-বা এর উদ্ভব—সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছে? মহাবিশ্বের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মহাবিশ্ব এমনভাবে তৈরি* (fine tuned) *যাতে করে এতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হয়—এর কারণ কি কেউ ব্যাখ্যা করতে পেরেছে? কেন ফিযিসিস্ট আর বায়োলজিস্টরা শুধু ধর্ম ছাড়া অন্য যেকোনো কিছু বিশ্বাস করতে রাজি? র‍্যাশনালিযম আর বিজ্ঞান কি পেরেছে ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে? রক্তাক্ত গত শতাব্দীতে সেক্যুলারিযম কি ভালোর পক্ষের শক্তি হিসেবে কাজ করেছে? বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের দর্শনে এমন কিছু কি আছে, যা তাদের এই দাবিকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে পারে যে, ধর্মীয় বিশ্বাসমাত্রই অযৌক্তিক* (irrational)?”[৩৬]

যদি আমরা ধরেও নিই যে, অধিকাংশ বিজ্ঞানী নাস্তিকদের বিশ্বাসকে সমর্থন করেন, সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন হলো, এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সমর্থন কি আলাদা

---

[৩৬] David Berlinski, *The Devil's Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions*

কোনো গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে? একজন পদার্থবিদের মানবতাবোধকে কি আমরা একজন রিকশাওয়ালার মানবতাবোধের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য? একজন বিজ্ঞানী যে বিষয়ে তার স্পেশালাইযেশান, তা নিয়ে যা বলবেন সেটা আমরা বিশেষজ্ঞের মত হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু কেবল বিজ্ঞানী হবার কারণে সব বিষয়ে কি তাদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়া হবে?[৩৭] যদি বিজ্ঞানী হবার কারণে সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা প্রেফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্ট চায়, যদি তারা চায় "বিজ্ঞানীরা বলেছে"—এটাই সবার জন্য প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যাক, তাহলে রাজনীতিবিদ, একনায়ক আর কাল্ট লিডারদের দোষ কী? এ কেমন বিজ্ঞানমনস্কতা?

---

[৩৭] *আর্গুমেন্ট ফ্রম অথোরিটি (argumentum ad verecundiam – Argument from Authoriyt/Apeeal toAuthority. A Logical Fallacy.)*–প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে দাবির সত্যতা প্রমাণের বদলে, কোনো বিশেষজ্ঞ (*authority*) ব্যক্তির সমর্থনকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা। অথচ বিশেষজ্ঞ বলেই তার অবস্থান সঠিক হবে, এমন ভাবার কারণ নেই। আর এমনও হতে পারে সেই ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ বটে কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে না। অন্য কোনো বিষয়ে। যেমন : একজন পদার্থবিদ, পদার্থবিদ্যার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তার মানে এই না যে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপারে তিনি যা-ই বলেন, তা-ই সঠিক। একই সাথে এমন মনে করাও সঠিক না যে পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হবার কারণে দর্শনের ব্যাপারে তার কথাকে বিশেষজ্ঞ মতামত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ 'অমুক বিজ্ঞানী এমন মনে করেন'–এটি কোনো দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহনযোগ্য না। উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ ছাড়া একজন বিজ্ঞানীর দাবি আর একজন সাহিত্যিক কিংবা চাষির দাবির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এই ব্যাপারে বিখ্যাত অ্যামেরিকান নাস্তিক কার্ল স্যাইগানের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক-- "বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটি হলো, আর্গুমেন্ট ফ্রম অথোরিটিকে অবিশ্বাস করা!। কারণ এ ধরনের অনেক দাবি অনেক বার দুঃখজনকভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অন্য সবার মতো অথোরিটিদেরও তাদের দাবি প্রমাণ করতে হবে।" *["One of the great commandments of science is, "Mistrust arguments from authority." ... Too many such arguments have proved too painfully wrong. Authorities must prove their contentions like everybody else." (Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark)]*

বর্তমান সময়ে নাস্তিকরা যেসব বৈজ্ঞানিক 'সত্য'-কে ব্যবহার করে আস্তিকদের সাব-হিউম্যান-জাতীয় কিছু একটা প্রমাণ করতে চায়, সেগুলোর অধিকাংশ অপ্রমাণিত থিওরি ছাড়া আর কিছুই না। এছাড়া বিজ্ঞানীরা যখন এসব থিওরি বা মডেল তৈরি করেন, তখন তারা সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষভাবে করেন না। এমনকি গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ডাটাকে ব্যাখ্যা করার কাজটাও বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে করেন না। যদিও অধিকাংশ বিজ্ঞানী এটা স্বীকার করেন না, আর স্বাভাবিকভাবেই নাস্তিকরা এটা চেপে যায়। হাজার হোক নিজেদের বিশ্বাস আর সে বিশ্বাসের দেবতাদের ব্যাপার। তবুও কালেভদ্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ এবং অতি দুর্লভ ক্ষেত্রে নাস্তিকদের মধ্যে কেউ কেউ এ সত্যটা স্বীকার করেন। যেমন জর্জ এলিস ও স্টিফেন হকিং-এর *The Large Scale Structure of Space-Time*, এ সত্যটা স্বীকার করে বলেছেন—

"We [scientists] are not able to make cosmological models without some admixture of ideology."[৩৮]

"আমরা (বিজ্ঞানীরা) যে মহাজাগতিক মডেলগুলো তৈরি করি, সেগুলো (আমাদের) আদর্শের মিশ্রণ থেকে মুক্ত না।"

নাস্তিক বিজ্ঞানী, পপুলেশান জেনেটিক্স এর পুরোধা, এভোলিউশানারি বায়োলজিস্ট রিচার্ড সি লিউইনটনের স্বীকারওক্তি আরও আন্তরিক। কার্ল স্যাইগানের *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark* বইয়ের এর রিভিউতে তিনি স্বীকার করেছেন—

"বিজ্ঞান ও অতিপ্রাকৃতের মাঝে আসল যে দ্বন্দ্ব, সেটাকে বোঝার চাবি হলো, সাধারণ বিবেচনাবোধের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমাদের (বিজ্ঞানীদের) সদিচ্ছার দিকে তাকানো। জীবন ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে নানা উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হবার পরও, বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মধ্যে (বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যায়) নানা অপ্রমাণিত

---

[৩৮] Ellis & Hawkings, *The Large Scale Structure of Space-Time*, (p. 34).

শিশুতোষ গল্প প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, স্পষ্টতই অসম্ভাব্য কিম্ভূতকিমাকার নানা ব্যাখ্যা আমরা মেনে নেই কেবল বিজ্ঞানের পক্ষ নেয়ার জন্য। কারণ আমরা আগে থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা বস্তুবাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যাপারটা এমন না যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমাদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মেনে নিতে বাধ্য করে। বরং বস্তুবাদ ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের আনুগত্যের কারণে আমরা বাধ্য হই অনুসন্ধানের এমন একটি কাঠামো এবং এমন কিছু ধারণাকে তৈরি করতে, যা শেষপর্যন্ত একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ফলাফল দেবে। সেই ব্যাখ্যা যতই কাউন্টার-ইন্টুইটিভ হোক না কেন, অদীক্ষিতের কাছে যতই দুর্বোধ্য লাগুক না কেন। আর আমাদের এই বস্তুবাদ আমরা পূর্ণ ও শর্তহীনভাবে ধারণ ও প্রয়োগ করি। কারণ কোনো ঐশ্বরিক ব্যাখ্যাকে অনুমোদন দেয়া সম্ভব না।"[৩৯]

অর্থাৎ আস্তিকদের মতোই নাস্তিকরা একটি বিশ্বাসের জায়গা থেকে তর্ক করে, যদিও তারা তাদের অবিশ্বাসের বিশ্বাসকে 'বিজ্ঞান" হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। এটা সাধারণ নাস্তিকদের ক্ষেত্রে সত্য, নাস্তিক বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও সত্য। অধিকাংশ নাস্তিক হয় এটা বোঝে না অথবা স্বীকার করার সৎ সাহস রাখে না। তবে নাস্তিকদের মধ্যে যারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সৎ, তারা এই সত্যকে স্বীকার করে যে নাস্তিকরা নিজেদের এই অযৌক্তিক বিশ্বাসকে বিজ্ঞানসম্মত

---

[৩৯] *"Our willingness to accept scientific claims that are against common sense is the key to an understanding of the real struggle between science and the supernatural. We take the side of science in spite of patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for unsubstantiated just-so-stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism. It is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept any material explanation of the phenomenal world, but, on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counter-intuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Morever, that materialism is absolute, for we cannot allow a Divine Foot in the door."* [Billions and Billions of Demons, New York Review of Books, 1st September 1997]

সূচীপত্র

প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন অদ্ভুত ব্যাখ্যার অবতারণা করে, যা বিজ্ঞানসম্মত তো না-ই বরং সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনার সাথেও সাংঘর্ষিক। লিউইনটনের ভাষায় *"just-so-stories"*. তাই আমরা দেখি নাস্তিকদের রূপকথার রাজ্য এমনই এক অদ্ভুত জগৎ, যেখানে সময়কে কাল্পনিক সংখ্যা (যেমন—১ এর স্কয়াররুট) দিয়ে প্রকাশ করা হয়[৪০], কোনো কিছু না *(nothing)* কোনো কিছুতে *(something)* পরিণত হয়[৪১], পাথরের স্তূপ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুদ্ধিমত্তা, সচেতনতা *(consciousness)* আর আত্মার *(soul)* উদ্ভব হয়[৪২], যা সংজ্ঞাগতভাবে প্রমাণ ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব না সেই মাল্টিভার্সের *(Multiverse)* রূপকথায় বিশ্বাস করা যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিকও।

আর তাদের কথা অনুযায়ী তাদের এসব হাস্যকর ব্যাখ্যা সারা পৃথিবী মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু কেন? কেন তাদের এই ধর্মবিশ্বাসকে অন্য ১০টা ধর্মের চাইতে অটোম্যাটিকালি বেশি সম্মান করতে আমরা বাধ্য? কেন তারা স্পেশাল? নাস্তিকরা অতিপ্রাকৃত শক্তি আর সত্তায় বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা করার চেষ্টা করে, কিন্তু ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটার কী? এই অতিপ্রাকৃত, অপ্রমাণিত, কল্পনাপ্রসূত সত্তাগুলোকে ছাড়া তাদের বিশ্বাস কি টেকা সম্ভব? তারা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি নিয়ে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করে, কিন্তু কোপার্নিকান আর কসমোলজিকাল প্রিন্সিপালের ব্যাপারে কেন তারা চুপ? এগুলো কি প্রমাণিত সত্য? নাকি অপ্রমাণিত বিশ্বাস? কুসংস্কার? বিপরীত প্রমাণ পাবার পরও তারা যেগুলোকে অন্ধ বিশ্বাসে আঁকড়ে আছে?

নাস্তিকরা শত শত, হাজার হাজার গালগল্পে বিশ্বাস করতে পারবে, এগুলো তাদের কাছে যৌক্তিক, বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু মহাবিশ্বের একজন অতুলনীয় সৃষ্টিকর্তা আছেন, এই মহাবিশ্বে মানবজাতির অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মানবজীবনের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে এবং একটি বিচারের দিন

---

[৪০] Hartle–Hawking Model

[৪১] লরেন্স ক্রউস, *A universe from Nothing*

[৪২] ডারউইনিজম (৩৩ নং ফুটনোট দ্রষ্টব্য)

আসছে—মানুষের প্রকৃতিগত (ফিতরাহ/*Natural Disposition*) এই বিশ্বাসগুলো তাদের কাছে যৌক্তিক না। না, এগুলো মানা যাবে না। দেবতারা রাগ করবেন। অবিশ্বাসের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে যাবে। ধর্মদ্রোহী হয়ে যাবার চান্স আছে।

বস্তুত বিজ্ঞানমনস্কতার পোশাকের আড়ালে নাস্তিকরা একটি আবেগপ্রসূত এবং অপ্রমাণিত বিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠা আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে। তারা অন্ধবিশ্বাসী এবং সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, সবচেয়ে জঘন্য ধরনের অন্ধবিশ্বাসী। আর তাদের অবিশ্বাসের বিশ্বাস একটি মিথ্যা, বাতিল ধর্ম ছাড়া আর কিছুই না। এছাড়া আর যা কিছু আছে তা হলো উইন্ডো ড্রেসিং, প্রিটেনশান আর বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই।

“তারা ধারণা-অনুমান ছাড়া অন্য কিছুরই অনুসরণ করে না, আর তারা শুধু মিথ্যাই বলে।”[৪৩]

---

[৪৩] আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০ : ১০

সূচীপত্র

যুক্তির আঘাতে মুক্ত করি চেতনার জট

আশিক আরমান নিলয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মূল এজেন্ডা গোপন রেখে ধাপে ধাপে কাজ করাটা শয়তানের একটা কমন হাতিয়ার। যেমন আদমকে (আ.) নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর জন্য সে বলেনি, "যাও আল্লাহকে অমান্য করো।" সে বলেছে "এটা খেলে তুমি ফেরেশতা হয়ে যাবে, অমর হয়ে যাবে।"[৪৪] এছাড়া মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটাতে শয়তান প্রথমে পূর্ববর্তী নেক ব্যক্তিদের সম্মানার্থে মূর্তি তৈরি করায়, কালক্রমে এসবের পূজা শুরু হয়। সুরা নূহ (৭১) এর ২৩ নং আয়াতে আছে এমনই কিছু ব্যক্তি তথা মূর্তির নাম—ওয়াদ্দ, ইয়াগুস, নাসর[৪৫]।

নাস্তিকতা নামক ধর্মটি তার ভ্রূণাবস্থায় এমনই ছিল। ধর্মের কথাগুলোকেই অদ্ভুতভাবে ঘোরাতো তারা। রবার্ট ব্রাউনিং রচিত *"Fra Lippo Lippi"* শিরোনামের একটা কবিতায় দেখা যায়, লিপো একজন চার্চ-সন্ন্যাসী যাকে জোর করে চার্চে আনা হয়েছে। ধর্মীয় চিত্রকর্ম আঁকা তার কাজ। একসময় সে

---

[৪৪] অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিলো, সে বললো, তোমাদের রব এই বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা যেন মালাইকা/ফেরেশতা হয়ে না যাও, অথবা এখানে (এই জান্নাতে) চিরন্তন জীবন লাভ করতে না পারো।

[আল কুরআন, সুরা আল-'আরাফ, ০৭ : ২০]

[৪৫] আর তারা বলে, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন কোরো না ওয়াদ সুওয়া'আকে, আর না 'ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাসরকে। [আল কুরআন, সুরা নূহ, ৭১ : ২৩]

বেশ্যালয়ে গমন করে, সাধু-সন্ত না এঁকে নারী আঁকতে শুরু করে। যুক্তি দেয়—নারীদেহ তো গডেরই সৃষ্টি। নারীদেহ এঁকে আমি গডের মহিমা খুঁজে পাই।" (উল্লেখ্য, এমনটা ধরে নেয়া ঠিক না যে, কবির নিজস্ব মতও এটাই)

এভাবেই শুরু। তারপর এই ধারণা প্রচারিত হতে শুরু করে যে পরম সত্য বলে কিছু নেই, সবই আপেক্ষিক (খেয়াল করবেন, নিজেকেই সঠিক বলে দাবি করাটা কিন্তু ধর্মের বৈশিষ্ট্য)। ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার একটা ভিত্তি এভাবে দাঁড়ালো। কিছু বৈজ্ঞানিক অনুমান যখন নাস্তিকতার পক্ষে এলো, তখন থেকে আত্মবিশ্বাসের সাথে নাস্তিকতা একটি ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, নাস্তিকতা একসময় ধরেই নিলো যে, সে-ই সত্য। অন্যান্য যেকোনো ধর্মের মতো সে নিজেও যে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়, তা বেমালুম চেপে গেলো। নাস্তিকদের কথাবার্তা থেকেই তা স্পষ্ট হয়। ধরুন কেউ বললো, "আমি ফেমিনিজম নিয়ে একটা লেকচার দিচ্ছিলাম, কিন্তু শ্রোতা তার ধর্মান্ধতার জন্য শুনতেই চাইলো না।" হতেও তো পারে বক্তার কথা ভুল, শ্রোতার ধর্মবিশ্বাসই ঠিক। কিন্তু বক্তা ধরেই নিয়েছে নাস্তিক হওয়ার কারণে সে-ই সঠিক। (উল্লেখ্য, ফেমিনিজম মানেই নাস্তিকতা নয়। কেবল উদাহরণ দেওয়া হয়েছে)।

মুসলিমরা যদি নিজেদের 'শান্তিকামী' পরিচয় দেয়, তাহলে সেটা 'মুসলিমে'র প্রতিস্থাপক হবে না। কারণ এতে পক্ষপাতিত্ব হয়। মুসলিমরা শান্তিকামী হলে অমুসলিমরা কি অশান্তিকামী? অথচ নাস্তিকরা দিব্যি নিজেদের 'প্রগতিশীল', 'মুক্তমনা' বলে বেড়ায়। ধর্মগুরুদের নিয়ে চটি লিখে অনলাইন ভরিয়ে ফেলা নাস্তিকেরাও নাকি প্রগতিশীল। এমনকি মিডিয়াতেও এসব শব্দই ব্যবহৃত হয়! এসব শব্দ বলতে হয় কারণ 'নাস্তিক' কথাটাই গালির মতো শোনায়।

'প্রতিবন্ধী' বা *disable*-কে যেভাবে শুদ্ধ করে বলা হয় "*specially able*", নাস্তিকদের প্রগতিশীলতাও এমনই। নাস্তিকতার যেহেতু লিখিত বিধিবিধান নেই, এটা একেক জায়গায় একেকটা ঢাল ব্যবহার করে; যেমন বিজ্ঞান। এদের ধারণা, বিজ্ঞান বাই ডিফল্ট নাস্তিকতাকে সত্যায়ন করে। মরিস

বুকাইলির লেখা *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান* বইটা পড়ে তসলিমা নাসরিন দাঁত কিড়মিড়িয়ে লিখেছিল “মোল্লারাও আজকাল বিজ্ঞান চর্চা করে।” এতজন নাস্তিকের মাঝে কয়জন আর বিজ্ঞানী? অনেকেই আর্টস কমার্স পড়ে। বিজ্ঞানের ব্যাপারে এদের জ্ঞান খুব সরলীকৃত। বৈজ্ঞানিক সত্য আর তত্ত্বের পার্থক্য অনেকেই করতে পারে না। কিছু শুনলেই বলে “বিজ্ঞান বলে...।” আচ্ছা বিজ্ঞান তো কোনো ব্যক্তি না। বিজ্ঞান বলে মানে বিজ্ঞানীরা বলেন। বিবর্তনবাদের জটিল আলাপে গেলাম না। একজন মুসলিম বলবে “শয়তানের প্ররোচনায় হাই ওঠে।”[৪৬] নাস্তিক বলবে, “কিন্তু বিজ্ঞান তো বলে অক্সিজেনের অভাবে হাই ওঠে।” উইকিপিডিয়ায় গিয়ে দেখুন, এই তত্ত্ব বহু আগেই ভুল প্রমাণিত। হাই ওঠার আসল কারণ কী, একজনের দেখাদেখি আরেকজনের হাই ওঠে কেন এসব আজও এক রহস্য।

এবার আসুন নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে। এটা নাস্তিকদের জন্য সবচেয়ে অস্বস্তিকর ফিল্ডগুলোর একটি। এখানে তারা দেখে কোনটা মানলে ধর্মীয় বিধানের বিপরীতটা করা যায়। তাই তারা ইসলামের প্রাণের বদলে প্রাণ নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে এসে লেগেছে প্যাঁচ। অনেকে বলেছিল, এই একটা ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ড তারা চায়, তারপর আর না।

তসলিমা নাসরিন বলেছিল, সে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চায় না। বাঙালিরা তখন আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে তাকে ধুয়েছে। আরজ আলী আর হুমায়ুন আজাদরা মরে গিয়ে বেঁচে গেছে। কখনো ভেবে দেখেছেন সব নাস্তিক কেন ‘মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি’? কারণ, পাকিস্তান ইসলামকে ঢাল বানিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করলে তাই ধর্মকে পচানোর একটা সুযোগ পাওয়া যায়।

নরওয়ে বা জার্মানি আর বাংলাদেশ মিলে যদি এক দেশ হতো, তারপর ভাষার প্রশ্নে বাংলাদেশ যদি আলাদা হতো, তখন রাজাকারদের দাড়ি টুপি না-ও থাকতে পারতো। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে নৈতিকতার কথাও ধরুন। সমকামিতা তাদের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা কেন? কারণ ধর্ম এটা নিষিদ্ধ

---

[৪৬] সহীহ বুখারী, সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, ৩২৮৯

করেছে। অপেক্ষা করুন। অজাচার, মৃতকামিতা, পশুকামিতাও শীঘ্রই ব্যক্তিস্বাধীনতা হয়ে যাবে।

নাস্তিকদের অন্ধবিশ্বাসের আরেকটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। ধার্মিকদের তারা বলে, জন্মগত ধার্মিক, বাবা-মা আস্তিক বলে সন্তানও আস্তিক। আর তারা বুদ্ধি-বিবেচনা করে নাস্তিক। বাবা-মা থেকে আলাদা হওয়াটাই যদি বুদ্ধি বিবেচনার লক্ষণ হয়, তাহলে তো হুমায়ুন আজাদের ছেলেও অন্ধবিশ্বাসী, বাপের দেখাদেখি নাস্তিক। বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়েই কি কেউ বাপ-মায়ের ধর্ম বেছে নিতে পারে না?

'প্রগতিশীলতা'র তাসের ঘর ফুঁ দিলেই পড়ে যায়। চটকদার শব্দশৈলীতে ঘাবড়ে না গিয়ে ফুঁ-টা দিতে হয়। শয়তানের চক্রান্ত অতিশয় দুর্বল।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ও আয়িশা (রা.)-কে নিয়ে যতো মিথ্যাচার

শিহাব আহমেদ তুহিন

মক্কার লোকগুলো প্রচণ্ড অতিষ্ঠ। আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ (ﷺ) কী এক নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে, বলছে সব দেব-দেবী ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতে। শত অত্যাচার করেও তাঁকে একটুও দমানো গেলো না। কুরাইশরা তখন একটা মাস্টারপ্ল্যান হাতে নিলো। তারা ভেবে দেখলো, সাধারণত অর্থ আর নারীর জন্যই মানুষ এত হাঙ্গামা করে পৃথিবীতে। তাই কুরাইশদের প্রতিনিধি হয়ে উতবাহ ইবন রাবিআহ, মুহাম্মাদ (ﷺ) কে বললো, "*যদি তুমি তোমার দারিদ্র্যের কারণে এমনটা করে থাকো, আমাদের বলো—আমরা টাকা তুলে তোমাকে সমগ্র কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দেবো। আর যদি তুমি নারী চাও, কুরাইশদের মধ্যে যাকে খুশি পছন্দ করো। আমরা তাকে তোমার হাতে দেবো।*"[৪৭]

বর্তমান ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণার একটা অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে নারীলোভী হিসেবে উপস্থাপন করা। কারণ, তাঁর ঘোর বিরুদ্ধাচারীরাও জানে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সম্পদের প্রতি কোনো আসক্তি ছিল না। মৃত্যুর সময় তিনি একটা দিরহামও রেখে যাননি।[৪৮] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যদি

---

[৪৭] মুসনাদ আবু ইয়া'লা : ১০১

[৪৮] *সিরাতুর রাসূল,* মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা : ৭৪৮

সত্যিই নারীলোভী হতেন, তবে কুরাইশের সেরা সেরা নারীদের বিয়ে করার জন্য এর চেয়ে মোক্ষম সুযোগ আর ছিল না। কিন্তু তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করেননি।

মক্কার মুশরিকরা তাঁকে পাগল বলেছে, বলেছে জাদুকর। কিন্তু কখনোই নারীলোভী কিংবা শিশুকামী বলেনি। কারণ, তারা তাঁকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে। যখন তাদের সংস্কৃতিতে অবৈধ যৌনাচার একদম স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, তখনও তিনি কোনো নারীর নিকট কখনো গমন করেননি। মক্কার সবচেয়ে সুদর্শন পুরষ হয়েও মাত্র ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করেন ৪০ বছর বয়সী খাদিজাকে (রা.)। খাদিজার (রা.) মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে ঘর করেছেন একটানা ২৫ বছর। এরপর বিয়ে করেন পঞ্চাশ বছর বয়সী সাওদাকে (রা.)। তারপর আল্লাহর নির্দেশেই বিয়ে করেন ছয় বছর বয়সী আয়িশাকে (রা.)। তারপরও তাঁর ঘোর শত্রুরা তাঁকে কখনো নারীলোভী কিংবা শিশুকামী বলেনি। আর তাঁর শত্রুরা হয়তো ভুলেও কল্পনা করেনি যে, প্রায় চৌদ্দ শ বছর পর তাদেরই মতো কিছু ইসলামের শত্রুরা এটা নিয়ে এত জল ঘোলা করবে।

সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, কিছু তথাকথিত মুসলিম বলার চেষ্টা করে যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আয়িশা (রা.)-কে বিয়ে করে ঠিক কাজ করেননি।

এই হাদিসটি লক্ষ করুন- আয়িশা (রা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, *“তোমাকে বিয়ে করার আগে আমাকে দুই বার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। আমি দেখেছি একজন ফেরেশতা তোমাকে এক টুকরো রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে আসছেন। আমি বললাম—আপনি নিকাব উন্মোচন করুন! যখন তিনি নিকাব উন্মোচন করলেন তখন আমি দেখতে পেলাম যে ঐ আবৃতা তুমিই। আমি তখন বললাম—এটি যদি আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন।”*[৪৯]

[৪৯] সহীহ বুখারী : অধ্যায় ৮০, হাদীস নং : ৬৫৪০ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

আমরা জানি, নবীদের স্বপ্ন হচ্ছে ওহীর মতো। তাই আল্লাহ তা'আলাই এই বিয়ে ঘটিয়েছিলেন। তাই এই বিয়ের পেছনে অবশ্যই একটা হিকমাহ ছিল। এরপরও কোনো মুসলিম যদি এই বিয়ে নিয়ে আপত্তি তোলেন, তবে অবশ্যই ঈমানহারা হবেন।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিয়ে ইসলামবিদ্বেষীদের একটি প্রধান অভিযোগ হলো:

"মুহাম্মাদ (ﷺ) *pedophile* বা শিশুকামী ছিলেন"

যারা *pedophilia*-তে ভোগেন তাদের IQ লেভেল এবং স্মৃতিশক্তি অনেক কম থাকে।[৫০] যিনি পুরো কুরআন মুখস্থ বলে যেতে পারতেন, তাঁকে আমরা অবশ্যই স্মৃতিশক্তির দোষে দুষ্ট বলতে পারি না। আর মেধার প্রয়োগ এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি যে জিনিয়াস ছিলেন তা পাশ্চাত্যের অনেক লেখকই স্বীকার করেছেন।[৫১,৫২] *Pedophilia*-তে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রধান যেসব উপসর্গে ভোগেন, তার কোনোটাই তাঁর মধ্যে ছিল না। আসুন দেখি উইকিপিডিয়াতে *pedophilia-এর* সংজ্ঞা হিসেবে কী বলা হয়েছে:

"Pedophilia or paedophilia is a psychiatric disorder in which an adult or older adolescent experiences a primary or exclusive sexual attraction to prepubescent children. The manual defines it as a paraphilia involving intense and recurrent sexual urges towards and fantasies about prepubescent children." [৫৩]

---

[৫০] Cantor JM, Blanchard R, Christensen BK, Dickey R, Klassen PE, Beckstead AL, Blak T, Kuban ME (2004). *Intelligence, memory, and handedness in pedophilia*. Neuropsychology 18 (1): 3–14.

[৫১] Michael Hart in 'The 100, *A Ranking of the Most Influential Persons In History*, New York, 1978.

[৫২] Sir George Bernard Shaw in *The Genuine Islam*, Vol. 1, No. 8, 1936.

[৫৩] *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th Edition. American Psychiatric Publishing. 2013

এখানে *pubescent* বা বয়ঃপ্রাপ্তির বিষয়টা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনায় একেক অঞ্চলের মেয়েরা একেক সময় বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। যেমন, মরুভূমি অঞ্চলের মেয়েরা শীতপ্রধান অঞ্চলের মেয়েদের চেয়ে দ্রুত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। মরুভূমির মেয়েরা যেখানে ১০ বছর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্তি লাভ করে, সেখানে অনেক শীতপ্রধান অঞ্চলের মেয়েরা ১৩-১৫ বছর হয়ে গেলেও বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না।

ফ্রেঞ্চ দার্শনিক *Montesqueu* তার *Spirit of Laws* বইটিতে[৫৪] উল্লেখ করেছেন, উষ্ণ অঞ্চলে মেয়েরা ৮-৯-১০ বছর বয়সেই বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যায়। বিশ বছর বয়সে তাদের বিয়ের জন্য বৃদ্ধ ভাবা হয়। আমেরিকার সংবিধান তৈরিতে যেসব বইয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে *Spirit of Laws* বইটি অন্যতম।

আয়িশা (রা.) নিজেই মেয়েদের জন্য বিয়ের বয়স নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, “মেয়ে যখন নয় বছরে উপনীত হয়ে যায়, তখন সে মহিলা হয়ে যায়।”[৫৫] তাই সে সময়কার আরব মেয়েদের জন্য যে নয় বছর বিয়ের জন্য উপযুক্ত ছিল, তার প্রমাণ ছিলেন স্বয়ং আয়িশা (রা.)।

নিচের তালিকাটি[৫৬] ভালোভাবে লক্ষ করুন—তালিকাটিতে তিনটি ভিন্ন শতকে মেয়েদের বিয়ের জন্য অনুমোদিত বয়স কতো ছিল, সেটি উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৫৪] *Montesqueu, The spirit of Laws*, Book-16, Page 264

[৫৫] তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ

[৫৬] http://chnm.gmu.edu/cyh/primary-sources/24

Age Limit in Age of Consent Laws in Selected Countries

	1880	1920	2007
Austria	14	14	14
Belgium	-	16	16
Bulgaria	13	13	14
Denmark	12	12	15
England & Wales	13	16	16
Finland	-	12	16
France	13	13	15
Germany	14	14	14
Greece	-	12	15
Italy	-	16	14
Luxembourg	15	15	16
Norway	-	16	16
Portugal	12	12	14
Romania	15	15	15
Russia	10	14	16
Scotland	12	12	16
Spain	12	12	13
Sweden	15	15	15
Switzerland	various	16	16
Turkey	15	15	18
Argentina	-	12	13
Brazil	-	16	14
Chile	20	20	18
Ecuador	-	14	14
Canada	12	14	14
Australia			
New South Wales	12	16	16
Queensland	12	17	16
Victoria	12	16	16
Western Australia	12	14	16

United States			
Alabama	10	16	16
Alaska	-	16	16
Arizona	12	18	18
Arkansas	10	16	16
California	10	18	18
Colorado	10	18	15
Connecticut	10	16	16
District of Columbia	12	16	16
Delaware	7	16	16
Florida	10	18	18
Georgia	10	14	16
Hawaii	-	-	16
Idaho	10	18	18
Illinois	10	16	17
Indiana	12	16	16
Iowa	10	16	16
Kansas	10	18	16
Kentucky	12	16	16
Louisiana	12	18	17
Maine	10	16	16
Maryland	10	16	16
Massachusetts	10	16	16
Michigan	10	16	16
Minnesota	10	18	16
Mississippi	10	18	16
Missouri	12	18	17
Montana	10	18	16
Nebraska	10	18	17
Nevada	12	18	16
New Hampshire	10	16	16
New Jersey	10	16	16
New Mexico	10	16	17
New York	10	18	17

ভালোভাবে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাবো, ১৮৮০ সালের দিকে অধিকাংশ জায়গায় বিয়ের জন্য অনুমোদিত বয়স ছিল ১০-১২ এর মধ্যে। আমরা যদি ইতিহাসে আরও পেছনে যেতে পারি, তাহলে আরও কম বয়স লক্ষ করবো। আবার সামনে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, অনুমোদিত বয়সের সীমা ক্রমাগত বাড়ছে। এর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

Pedophilia'র সংজ্ঞায় আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হয়েছে- *"intense and recurrent sexual urges towards and fantasies about prepubescent children."* অর্থাৎ, বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি এমন শিশুদের প্রতি একজন *pedophile* বার বার প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। মুহাম্মাদ (ﷺ) কি এমন কিছু প্রদর্শন করেছিলেন? তিনি কি বাছাই করে শুধু শিশুদের বিয়ে করেছিলেন? নিচের তালিকাটি লক্ষ করুন। এখানে আমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বিভিন্ন বিয়ের সময় তাঁর স্ত্রীদের বয়স উল্লেখ করেছি:

ক্রম	নাম	বিয়ের সময় বয়স
১	খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.)	৪০
২	সাওদা বিনতে যাম'আহ (রা.)	৫০
৩	**আয়িশা বিনতে আবু বাকর (রা.)**	**৬ (স্বামীগৃহে ৯)**
৪	হাফসাহ বিনতে উমার (রা.)	২২
৫	যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.)	৩০
৬	উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়্যাহ (রা.)	২৬
৭	যয়নাব বিনতে জাহশ (রা.)	৩৬
৮	জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস (রা.)	২০
৯	উম্মে হাবিবাহ রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)	৩৬
১০	সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রা.)	১৭
১১	মায়মুনা বিনতুল হারিস (রা.)	৩৬

অর্থাৎ, তাঁর স্ত্রীদের যখন বিয়ে করেছিলেন, তাদের মধ্যে ৯০ ভাগেরই বয়স ছিল ১৭ কিংবা তার চেয়েও বেশি। একমাত্র আয়িশা (রা.) এর বয়স ছিল দশের নিচে। যারা আয়িশা (রা.) এর বয়স দেখে খুশিতে *"Yes, we got it. All moslems are pedophile"* বলে চিৎকার করে ওঠেন, তারা অবশ্য খাদিজা (রা.), উম্মে হাবীবাহ (রা.) ও সাওদা (রা.) এর বয়স দেখলে যথাক্রমে বোবা, বধির ও অন্ধ হয়ে যান।

"তারপরেও ছয় বছর বয়স স্বামী-সংসারের জন্য উপযুক্ত না"

যারা ৬ বছর বয়সে[৫৭] আয়িশা (রা.) এর বিয়ে নিয়ে আপত্তি তোলেন, তারা অবশ্য ইতিহাসের একটা সত্য এড়িয়ে যান। সেটা হচ্ছে রাসুল (ﷺ) এর পূর্বেই আয়িশা (রা.), জুবাইর ইবন মুতিম এর সাথে *engaged* ছিলেন।[৫৮] পরবর্তীতে, আবু বকর (রা.)[৫৯] ইসলাম গ্রহণ করলে এ বিয়ে ভেঙে যায়। এ

---

[৫৭] ছয় বছর বয়সে যে আয়িশা (রা.) এর বিয়ে হয়েছিল, তা অনেক মুসলিমই স্বীকার করেন না। তারা বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.) এর বয়স ছিল বারো বছর অথবা ষোলো বছর কিংবা তার চেয়েও বেশি। এই দাবি মেনে নিলে বেশ কয়েকটি সহীহ হাদিসকে অস্বীকার করতে হয়। 'বিয়ের সময় আয়িশা (রা.) এর বয়স ষোলো বছর ছিল'—এ সংক্রান্ত দাবিগুলো খণ্ডন করেছেন সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবি (র)। আগ্রহীরা তাঁর বিখ্যাত বই "*সীরাতে আয়েশা*" পড়লে সেগুলো জানতে পারবেন (পৃষ্ঠা : ৪০৪-৪৪৬)।

[৫৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪৯ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[৫৯] আয়িশা (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। অনেক ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ আর খ্রিষ্টান গবেষকদের দাবি হচ্ছে , যেহেতু আরবিতে بكر বলতে কুমারী মেয়েদের বুঝানো হয়, তাই সেই সম্মানের খাতিরেই তাঁর পিতা ইসলামে "আবু বকর" উপনামে খ্যাত হন। একই ভুল করেছেন ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ স্যার সৈয়দ আমির আলি তার "*লাইফ অফ মুহাম্মাদ*" গ্রন্থের ১৪ নং অধ্যায়ে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আয়িশা (রা.) এর জন্মের বহু পূর্বেই তাঁর পিতা "আবু বকর" উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আর এই পণ্ডিতদের কে জানাবে যে, আরবি ভাষায় কুমারীকে بَكْر (ফাতহা দিয়ে-বকর) বলা হয় না; বরং بِكْر (কাসরা দিয়ে-বিকর) পড়া হয়?

থেকে আমরা বুঝতে পারি, সে সময় এই বয়সেই বিয়ে করা আরবে একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশে মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁকে বিয়ে করেন। ছয় বছর বয়স স্বামী-সংসারের জন্য উপযুক্ত নয় বলেই তিনি নয় বছর বয়সে স্বামীগৃহে ওঠেন। *Pedophilia*-তে আক্রান্তরা যেমন শিশুদের পাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে, মুহাম্মাদ (ﷺ) কখনোই এমন কিছু প্রদর্শন করেননি। তাই নয় বছর বয়সে আয়িশা (রা.) উপযুক্ত হলে আয়িশা (রা.) এর পরিবারই তাঁকে স্বপ্রণোদিত হয়ে স্বামীগৃহে উঠিয়ে দেন। হিজরতের পর আবু বকর (রা.), রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আরজ করলেন,

"হে আল্লাহর রাসুল! আপনার স্ত্রীকে ঘরে আনছেন না কেন?" প্রিয়নবী বললেন, "এই মুহূর্তে মোহর পরিশোধ করার মতো অর্থ আমার কাছে নেই।" আবু বকর (রা.) অনুরোধ করলেন, "যদি আমার অর্থ কবুল করতেন।" তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আবু বকর (রা.) এর কাছ থেকে অর্থ ঋণ নিয়ে আয়িশা (রা.) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[৬০]

আজ থেকে ২০০ বছর আগে মেয়েরা দশ বছর বয়সে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হলে তা মেনে নিতে যদি আমাদের আপত্তি না থাকে, তাহলে ১৪০০ বছর আগে একজন নারীর নয় বছর বয়সে সংসার করা নিয়ে অভিযোগ তোলা কি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এর মধ্যে পড়ে না? কমনসেন্স, পরিসংখ্যান আর বিজ্ঞান এই তিনটাই সাক্ষ্য দেয় যে, স্বামীগৃহে ওঠার সময় আয়িশা (রা.) "*Pre-pubescent*" স্টেজে ছিলেন না।[৬১] যারা এমনটা বলে, তারা অবশ্যই মিথ্যাচার করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১৯০৫ সালের আগ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে আয়িশা (রা.) এর বিয়ে কোনো ইস্যুই ছিল না। ১৯০৫ সালে জোনাথন ব্রাউন সর্বপ্রথম

---

[৬০] *তাবাকাত*, ইবন সা'দ, পৃষ্ঠা : ৪৩

[৬১] Al-Dawoodi said: 'Aa'ishah (may Allaah be pleased with her) was reached physical maturity (at the time when her marriage was consummated). (Sharh Muslim, 9/206)

https://islamqa.info/en/22442

এটা নিয়ে জল ঘোলা করেন। কারণ, এর আগে এটা সবার কাছে একদম স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

যাদের এরপরেও ব্যাপারটা হজম করতে কষ্ট হয়, তাদের ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে বলবো। আপনার দাদি কিংবা নানি বেঁচে থাকলে তাদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সম্ভব হলে তাদের কাছ থেকে জেনে নিন, আপনার বড়-দাদি এবং বড়-নানির বিয়ে কতো বছর বয়সে হয়েছিল। দেখবেন বয়সটা ৯-১৫ এর বেশি না। এখন পারবেন কি নিজেদের পূর্বপুরুষদের শিশুকামী বলতে? আল্লাহ তা'আলা এভাবেই মানুষের মিথ্যাগুলোকে মানুষের দিকেই ফিরিয়ে দেন।

এবার সভ্য দেশগুলোর দিকে তাকাই। মেক্সিকোতে ছেলে-মেয়ের দৈহিক সম্পর্কের জন্য এই আধুনিক সময়ে ন্যূনতম বয়স মাত্র ১৩। খোদ অ্যামেরিকার ভিন্ন ভিন্ন স্টেটে মেয়েদের বিয়ের বয়সের ভিন্নতা আছে। যেমন, *New Hampshire*-এ বয়স ১৩, *New York*-এ ১৪, *South Carlonia*-তে বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫। আপনি কোন বয়সটাকে সঠিক বলবেন?

তবে এটা ঠিক যে, অপরিপক্ক বয়সে বিয়ে হলে, মেয়েরা আত্মগ্লানিতে ভোগেন এবং স্বামীর প্রতি ততোটা অনুরক্ত হন না। আয়িশা (রা.) এর সাথে কি এমনটা হয়েছিল?

কেমন ছিল আয়িশা (রা.) ও রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দাম্পত্যজীবন?

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর অন্তরে আয়িশা (রা.) এর প্রতি যে মহত্ত্ব ও মর্যাদা ছিল, তা অন্য কোনো স্ত্রীর জন্য ছিল না। তাঁর প্রতি এ ভালোবাসা তিনি কারও থেকে গোপন পর্যন্ত করতে পারেননি, তিনি তাঁকে এমন ভালোবাসতেন যে, আয়িশা (রা.) যেখান থেকে পানি পান করতেন, তিনিও সেখান থেকে পানি

পান করতেন। আয়িশা (রা.) খাবার সময় যেই হাড় মুখে নিতেন, তিনিও (ﷺ) সেই হাড় মুখে নিতেন।[৬২]

তার মানে এই না যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) স্ত্রীদের সাথে সমতা পালন করতেন না। তিনি অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতেন। তবে হৃদয় তো আর ভারসাম্য মানে না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এই বলে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন—

"হে আল্লাহ! যা আমার নিয়ন্ত্রণে (অর্থাৎ স্ত্রীগণের প্রতি আচার-ব্যবহার ও লেনদেন) তাতে অবশ্যই সমতা বিধান করি; কিন্তু যা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই (অর্থাৎ আয়িশা (রা.) এর প্রতি ভালোবাসা) তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।"[৬৩]

- 'আমর ইবনুল আস (রা.) একবার জিজ্ঞাসা করেন, *"হে আল্লাহর রাসুল, আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে?" তিনি বললেন, "আয়িশা।" আমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, "পুরুষদের থেকে?" তিনি বললেন, "তার পিতা।"*[৬৪]

- রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাথে খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন। কোনো এক সফরে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায়ও অংশ নেন।[৬৫]

- আয়িশা (রা.) আরও বর্ণনা করেন, যার দ্বারা তাঁর প্রতি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর স্নেহ, মমতা প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, *"আল্লাহর শপথ, আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখেছি, তিনি আমার ঘরের দরজায় দাঁড়াতেন, হাবশিরা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলাধুলা করতো, আর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে ঢেকে নিতেন, যেন আমি তাদের খেলা উপভোগ করি তাঁর কাঁধ ও কানের মধ্য*

---

[৬২] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : ৩, হাদীস নং : ৫৮৫ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[৬৩] সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : ৯, হাদীস নং : ১৯৭১

[৬৪] সহীহ বুখারী, অধ্যায় : ৫০, হাদীস নং : ৩৪০০ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[৬৫] সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায় : ৯, হাদীস নং : ১৯৭৯

দিয়ে। তারপর তিনি আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতোক্ষণ না আমিই প্রস্থান করতাম।”[৬৬]

- তাঁর প্রতি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ভালোবাসার আরেকটি আলামত হচ্ছে, মৃত্যুশয্যায় তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট অনুমতি নিয়ে আয়িশা (রা.) এর কক্ষে অবস্থান করেন। আর আয়িশা (রা.) এর কোলে মাথা রেখেই তিনি আপন প্রভুর সমীপে আত্মনিবেদন করেন।[৬৭]

- আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেন, *“তুমি কখন আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকো আর কখন রাগ করো, আমি তা বুঝতে পারি।” আমি বললাম, “কীভাবে আপনি তা বোঝেন?” তিনি বললেন, “তুমি যখন আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকো, তখন বলো, ‘এমন নয়—মুহাম্মদের রবের কসম,’ আর যখন আমার ওপর রাগ করো, তখন বলো, ‘এমন নয়—ইবরাহিমের রবের কসম!’ আমি বললাম, “অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল, তবে আমি শুধু আপনার নামটাই ত্যাগ করি।”*[৬৮]

- কোনো এক সফরে আয়িশা (রা.) এর সওয়ারি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। এটা দেখে, রাসুল (ﷺ) এতটাই অস্থির হয়ে পড়েন যে, তাঁর পবিত্র জবান থেকে বের হয়ে গেলো— *“হায় হায়! আমার স্ত্রীর কী হবে!”*[৬৯]

- একশ্রেণির মানুষ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে নারীলোভী আর সম্পদলোভী হিসাবে উপস্থাপন করতে চায়। অথচ আয়িশা (রা.) এর ভাষায়—*টানা তিন দিন নবী পরিবারে খাবার জুটেছে কখনো এমনটা হয়নি।*[৭০]

---

[৬৬] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : ৯, হাদীস নং : ১৯৩৭ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[৬৭] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : ২৬, হাদীস নং : ৪০৮৫ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[৬৮] সহীহ বুখারী, অধ্যায় : ৬৭, হাদীস নং : ৫২২৮ [তাওহীদ পাবলিকেশন্স]

[৬৯] মুসনাদে আহমাদ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫৮

[৭০] সহীহ বুখারী, অধ্যায় : ৭০, হাদীস নং : ৫৪২৩ [তাওহীদ পাবলিকেশন্স]

তিনি আরও বলেছেন—মাসের পর মাস চুলোয় আগুন জ্বলতো না।[৭১] *শুকনো খেজুর আর পানিতেই দিন কাটতো।*[৭২]

উম্মুল মুমিনিনরা সব সময় দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু তাঁরাও মানুষ ছিলেন। তাই সংসারের খরচ বাড়াতে তাঁরা বার বার রাসুল (ﷺ)-কে পীড়াপীড়ি করতেন। এ নিয়ে কিছুটা মনোমালিন্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল (ﷺ) এক মাস স্ত্রীদের সাথে দেখা করবেন না বলে শপথ করেন। ইতিহাসে এটি "ঈলার ঘটনা" নামে পরিচিত। এ সময়ে রাসুল (ﷺ)-কে দেখতে না পাবার বিরহের কথা বলতে গিয়ে আয়িশা (রা.) বলেন, "আমি শুধু দিন গুনতাম।" বিরহের পালা শেষ করে রাসুল (ﷺ) সর্বপ্রথম আয়িশা (রা.) এর সাথে দেখা করেন। আয়িশা (রা.) অভিমান করে বলেন, *"হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন। অথচ সবে উনত্রিশ দিন হয়েছে।" রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জবাবে বলেন, "আয়িশা! মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়।"*[৭৩]

- আয়িশা (রা.), রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি এতটা আত্মসম্মান বোধ করতেন যে, তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "কেন আমার মতো একজন নারী, আপনার মতো একজন পুরুষকে নিয়ে আত্মসম্মান বোধ করবে না?"[৭৪]

এরপরও যারা এই বিয়ে নিয়ে জলঘোলা করে তাদের বলবো,

"If A'isha (RA) was happy and satisfied with her marriage, who are you to point your finger at her marriage?"

বিয়ের পেছনে হিকমাহ

---

[৭১] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : ৫৬, হাদীস নং : ৭১৮৩ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[৭২] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : ৫৬, হাদীস নং : ৭১৮৬ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[৭৩] *সীরাতে আয়িশা*, সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবি (র.), পৃষ্ঠা : ১৪৯

[৭৪] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : ৫৩, হাদীস নং : ৬৮৫০ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

- মুহাম্মাদ (ﷺ) ও আয়িশা (রা.) এর বিয়ের কারণে মুসলিম উম্মাহ নানা দিক থেকে লাভবান হয়েছিল। আয়িশা (রা.), মুহাম্মাদ (ﷺ) এর স্ত্রীদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন।[৭৫]

- সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারীদের মাঝে তিনি ছিলেন সপ্তম, নারীদের মধ্যে থেকে প্রথম।

- হাদিস এবং তাফসিরের এমন কোনো বই নেই, যাতে আয়িশা (রা.) নামটি জ্বলজ্বল করে না।

- রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর তিরোধানের পর লম্বা একটা সময় আয়িশা (রা.) তাঁর জ্ঞান সাহাবী ও তাবিয়িদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তিরমিযিতে আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, "আমাদের, সাহাবীগণের কাছে কোনো হাদিস অস্পষ্ট লাগলে, আমরা আয়িশা (রা.) এর শরণাপন্ন হতাম। তাঁর কাছে অবশ্যই কোনো না কোনো ধারণা পাওয়া যেতো।"[৭৬]

এক নজরে উম্মাহাতুল মুমিনিন বর্ণিত হাদিসসমূহ

ক্রমিক	নাম	মুত্তাফাক আলাইহ	এককভাবে বুখারি	এককভাবে মুসলিম	অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ	মোট
১	সাওদা বিনতে যাম'আহ (রা.)	**	১	**	৪	৫
২	**আয়িশা বিনতে আবু বাকর (রা.)**	**১৭৪**	**৫৪**	**৯**	**১৯৭৩**	**২২১০**
৩	হাফসাহ বিনতে উমার (রা.)	৪	**	৬	৫০	৬০
৪	উম্মে সালামাহ (রা.)	১৩	৩	১৩	৩৪৯	৩৭৮
৫	যয়নব বিনত জাহশ(রা)	২	**	**	৯	১১

[৭৫] *সিরাতুর রাসূল*, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা : ৭৬৮

[৭৬] জামে তিরমিযি, মানাকিব আয়িশা (রা.)

৬	জুওয়াইরিয়া (রা.)	**	২	২	৩	৭
৭	উম্মে হাবিবাহ (রা.)	২		১	৬২	৬৫
৮	সাফিয়্যাহ (রা.)	১			৯	১০
৯	মায়মুনাহ (রা.)	৭	১	৫	৬৩	৭৬
	সর্বমোট	২০৩	৬১	৩৬	২৫২২	২৮২২

- ইমাম যুহরি (র) তাবিয়িদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। অনেক সাহাবীর সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, “সবচেয়ে ভালো জ্ঞান ছিল আয়িশা (রা.) এর। বড় বড় সাহাবীগণ তাঁর কাছে জানতে চাইতেন।”[৭৭]

ইমাম যুহরি আরও বলেন, “যদি সকল মানুষের জ্ঞান এবং পবিত্র স্ত্রীগণের জ্ঞান একত্র করা হয়, তারপরেও আয়িশা (রা.) এর জ্ঞান বেশি হবে।”[৭৮]

আবার মক্কার মুশরিক কুরাইশদের কাছে ফিরে যাই। নানাভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রলোভন দেখিয়েও তারা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে কোনো সমঝোতা করতে পারেনি। মুহাম্মাদ (ﷺ) যদি নারীলোভী হতেন, তবে তখনকার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারীদের বিয়ে করতে পারতেন। শিশুকামী হলে পারতেন বেছে বেছে শিশুদের ভোগ করতে। তিনি তার কিছুই করেননি। কারণ, তাঁর মিশন ছিল সত্যের পথে আজন্ম সংগ্রামের। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ‘সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্ব’ এর দিকে নিয়ে যাওয়া। তাই তো সত্য প্রচারের জন্য অনমনীয় থেকে তিনি বলেছিলেন,

“আমার এক হাতে সূর্য আরেক হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমার ধর্ম থেকে আমি বিরত হবো না। হয় আল্লাহ আমাকে জয়ী করবেন, নতুবা আমি শেষ হয়ে যাবো। কিন্তু এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো না।”[৭৯]

---

[৭৭] তাবাকাত, ইবন সা‘দ

[৭৮] মুসতাদরাক হাকিম

[৭৯] সীরাত ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ : ৩১৪

তাকদির আগে থেকে নির্ধারিত হলে মানুষের বিচার হবে কেন? যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছেনি তাদের কী হবে?

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

নাস্তিক প্রশ্ন : মানুষ জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে যাবে, তা তো আগে থেকেই তাকদিরে লেখা। আর এর ব্যতিক্রমও ঘটবে না। আল্লাহর হুকুম ছাড়া নাকি কোনো গাছের পাতাও পড়ে না; পৃথিবীর সব অপরাধ তো তাহলে আল্লাহর হুকুমেই হয়। অমুসলিমরা অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আর মুসলিমরা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। কেউ যদি হিন্দু বা নাস্তিক হওয়ার জন্য জাহান্নামে যায়—এটা তো সেই ব্যক্তির দোষ না। এটা সৃষ্টিকর্তারই দোষ।

উত্তর : আরবি 'তাকদির' (تقدير) শব্দটি 'কদর' (قدر) শব্দের সাথে সম্পর্কিত। শাব্দিকভাবে 'কদর' এর অর্থ : পরিমাপ, পরিমাণ, মর্যাদা, শক্তি। আর 'তাকদির' এর অর্থ : পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি।[৮০] তাকদির হচ্ছে, সর্বজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ তা'আলার পূর্ব জ্ঞান ও হিকমতের দাবি অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য সবকিছু নির্ধারণ।[৮১]

---

[৭৯] ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৫/৫৬;

'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা', খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র); পৃষ্ঠা : ৩৩৯

[৮০] 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা', শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (র), পৃষ্ঠা : ৮২ (islamhouse);

আল-কুরআন আমাদের জানাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছুর ব্যাপারে জানেন। বলা হয়েছে :

“আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে রয়েছে।...”[৮২]

“তুমি কি জানো না, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন? ***এ সব বিষয় একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে।*** *নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।”*[৮৩]

“আর তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের কুঞ্জি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা-কিছু আছে—সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। কোনো গাছের এমন কোনো পাতা ঝরে না—যে সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত নন। মাটির অন্ধকারে কোনো শস্যদানা অথবা আর্দ্র বা শুষ্ক ***এমন কোনো জিনিস নেই—যা এক উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।”***[৮৪]

“এগুলো অদৃশ্যের খবর, যা ওহীর মাধ্যমে আমি তোমার [মুহাম্মাদ (ﷺ)] কাছে প্রেরণ করি। তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছিল।”[৮৫]

“তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন যথোচিত। যেদিন তিনি বলবেন, ‘হয়ে যাও!’ তখন হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন

---

[৮১] আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৭৭

[৮২] আল-কুরআন, সুরা হাজ, ২২ : ৭০

[৮৩] আল-কুরআন, সুরা আন‘আম, ৬ : ৫৯

[৮৪] আল-কুরআন, সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০২

শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন আধিপত্য হবে তাঁরই। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।’[৮৬]

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।’[৮৭]

“তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।’[৮৮]

পৃথিবীর সব অপরাধ কি আল্লাহর হুকুমেই হয়?

হুকুম মানে নির্দেশ। আল্লাহ তা’আলা কখনোই অপরাধ বা খারাপ কাজের নির্দেশ দেন না। আল্লাহ বলেন :

*“... **আল্লাহ মন্দ কাজের আদেশ দেন না**। তোমরা এমন কথা আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ করো, যা তোমরা জানো না?’*[৮৯]

আল্লাহ তা’আলা সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। পাপ কিংবা পুণ্য মানুষের সকল কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি। পৃথিবীতে যা ঘটে এবং মানুষ যা করে, এগুলোর সবগুলোই আল্লাহর অনুমতিক্রমে বা ইচ্ছায় হয়।

আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছা ২ প্রকারের।[৯০] যথা :

---

[৮৫] আল-কুরআন, সুরা আন‘আম, ৬ : ৭৩

[৮৬] আল-কুরআন, সুরা লুকমান, ৩১ : ৩৪

[৮৭] আল-কুরআন, সুরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৮

[৮৮] আল-কুরআন, সুরা আ’রাফ, ৭ : ২৮

১। কাউনিয়্যাহ
২। শারইয়্যাহ

১। কাউনিয়্যাহ : এ ধরনের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হয়। তবে জিনিসটি আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হওয়া জরুরি নয়। আর এটা দ্বারাই 'মাশিয়াত' বা ইচ্ছা বোঝানো হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"...আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো না। কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।"[৯১]

২। শারইয়্যাহ : এ ধরনের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য নয়। তবে এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত জিনিস বা বিষয়টি তাঁর পছন্দনীয়। আর এটা দ্বারাই 'মাহাব্বাত' বা পছন্দ বোঝানো হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিতে চান।... "[৯২]

উদাহরণ :

আবু বকর (রা.) এর ঈমান আনা : এই ঘটনাটি একই সাথে আল্লাহর কাউনিয়্যাহ ও শারইয়্যাহ ইচ্ছার উদাহরণ। এটি কাউনিয়্যাহ ইচ্ছা এ জন্য যে, এটি সংঘটিত হয়েছিল। শারইয়্যাহ ইচ্ছা এই জন্য যে, এটি আল্লাহর পছন্দনীয় ছিল।

---

[৮৯] 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা', শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (র), পৃষ্ঠা : ২০-২২ (*islamhouse*)

[৯০] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ, ২ : ২৫৩

[৯১] আল-কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ২৭

আবার ফিরআউনের কুফরী : এটি শুধু আল্লাহর কাউনিয়্যাহ ইচ্ছার উদাহরণ। এটি কাউনিয়্যাহ ইচ্ছা এই কারণে যে, এটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এটি শারইয়্যাহ ইচ্ছা নয় কেননা এর পেছনে আল্লাহর কোনো অনুমোদন বা সন্তুষ্টি ছিল না। আল্লাহ মুসা (আ.)-কে তার নিকট ঈমানের দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন।[৯৩]

আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যাকাত আদায় করার, তিনি মানুষকে চুরি করতে নিষেধ করেছেন। এ নির্দেশগুলো পালন করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। মানুষকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যা দ্বারা সে এ আদেশগুলো মানতেও পারে আবার ভঙ্গও করতে পারে। মানুষ যদি নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যাকাত আদায় না করে কিংবা চুরি করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে যাকাত আদায় করতে বাধ্য করেন না কিংবা চুরি করা আটকে দেন না; যদিও আল্লাহর এ ক্ষমতা আছে, পরিপূর্ণরূপেই আছে। মানুষ যদি যাকাত আদায় না করে কিংবা যদি চুরি করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা হতে দেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নেই।

যেহেতু মানুষের সকল কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি, কাজেই পুণ্যের সাথে সাথে পাপও আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে হয়। তবে তা কেবল এ অর্থে যে, আল্লাহ এগুলোকে (পাপ) নির্ধারিত করেছেন; এ অর্থে নয় যে, আল্লাহ এগুলো অনুমোদন করেন বা আদেশ দেন। পৃথিবীতে যত খারাপ কাজ বা অপরাধ সংঘটিত হয়, এগুলোর ওপর আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তুষ্টি নেই। আল্লাহ এগুলো ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন এবং এগুলো থেকে বিরত হবার আদেশ দেন।[৯৪]

---

[৯৩] 'Are we Forced or do we have a Free Will' by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; page:27-29;

ডাউনলোড লিঙ্ক: https://islamhouse.com/en/books/373557

[৯৩] 'শারহ আকিদা আত ত্বহাওয়ী' – ইবন আবিল ইজ্জ হানাফী(র); পৃষ্ঠা : ৩৮ (ইংরেজি অনুবাদ)

পৃথিবীতে যত অপরাধ সংঘটিত হয়, এগুলোর ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি না থাকা সত্ত্বেও কেন আল্লাহ এগুলো সংঘটিত হতে দেন এর উত্তরে বলা যেতে পারে : কুফর যদি না থাকত, তাহলে মু'মিন ও কাফির আলাদা করা যেত না বরং সবাই মু'মিন হতো।[৯৫] একই ভাবে, পাপ যদি না থাকতো, তাহলে পুণ্য বলে কিছু থাকতো না, সৎকর্ম ও মহত্ত্বেরও কোনো মানে থাকতো না। যদি অশুভ শক্তি না থাকতো, তাহলে শুভ ও কল্যাণকর জিনিসের কোনো মূল্য থাকতো না। অন্ধকার আছে বলেই আলোর গুরুত্ব আছে। পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতা বা নৃশংসতা না থাকলে মানবতারও কোনো আলাদা অস্তিত্ব বা অর্থ থাকতো না। কাজেই পৃথিবীতে অন্যায়, পাপ ইত্যাদির অস্তিত্বও আল্লাহর সৃষ্টির অসামান্য হিকমতের পরিচায়ক।

এ ব্যাপারে একটি কবিতা খুবই প্রাসঙ্গিক :

"আলো বলে, "অন্ধকার তুই বড় কালো,"
অন্ধকার বলে, "ভাই তাই তুমি আলো।""

মানুষের কর্ম তার পরিণতির কারণ

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা এটি সাব্যস্ত হয়েছে : মানুষ যে কর্ম করবে ঠিক সে অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। মানুষের প্রতিদান নির্ধারিত হবে তার কর্মের ভিত্তিতে।

*"নিশ্চয়ই আমি [আল্লাহ] **মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।**"*[৯৬]

---

[৯৪] '**Are we Forced or do we have a Free Will' by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen;** page : 32

[৯৫] আল-কুরআন, সুরা বালাদ ৯০:৪

*"সেখানে প্রত্যেকে **যাচাই করে নিতে পারবে, যা-কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল** এবং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর যেসব মিথ্যা উপাস্য তারা বানিয়ে রেখেছিলো, তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে।"*[৯৭]

*"আর নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক প্রত্যেককেই তাদের আমলের প্রতিফল অবশ্যই পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের খবর রাখেন।....."আর ধৈর্যধারণ করো, **নিশ্চয়ই আল্লাহ পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।**"*[৯৮]

*"আজকের দিনে [শেষ বিচারের দিন] কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং **তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে।**"*[৯৯]

*"যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল **তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে,** আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের বেহিসাব রিযিক দেয়া হবে।"*[১০০]

আল কুরআন আমাদের জানাচ্ছে, মানুষ তার সৎকাজের জন্য পুরস্কার পাবে। মানুষ দুনিয়াতে যে কর্ম করে, পরকালে তার প্রতিফলস্বরূপ জান্নাত লাভ করবে।

---

[৯৬] আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০ : ৩০

[৯৭] আল-কুরআন, সুরা হুদ, ১১ : ১১১, ১১৫

[৯৮] আল-কুরআন, সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৫৪

[৯৯] আল-কুরআন, সুরা মু'মিন (গাফির), ৪০ : ৪০

*“তাদেরই জন্য **প্রতিদান হলো** তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা **আমল করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান।**”*[১০১]

*“আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে **যে সৎকাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মু’মিন** (বিশ্বাসী), তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং **তাদের প্রতি খেজুর বিচির আবরণ পরিমাণ জুলুমও করা হবে না।**”*[১০২]

*“তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনো তা শেষ হবে না। **যারা ধৈর্য ধরে, আমি তাদের প্রাপ্য প্রতিদান দেবো তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ, যা তারা করতো।** যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং যে ঈমানদার—সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক—আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং **প্রতিদানে তাদের তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো যা তারা করতো।**”*[১০৩]

*“**যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে।** নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ববাসীর ওপর প্রাচুর্যশীল। আর **যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেবো এবং তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবো।**”*[১০৪]

“নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের প্রভু আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী।

---

[১০০] আল-কুরআন, সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৬

[১০১] আল-কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ১২৪

[১০২] আল-কুরআন, সুরা নাহল, ১৬ : ৯৬-৯৭

[১০৩] আল-কুরআন, সুরা আনকাবুত, ২৯ : ৬-৭

তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। ***তারা যে কর্ম করতো, এটা তারই প্রতিদান।”***[১০৫]

“এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।”[১০৬]

পক্ষান্তরে, মানুষ তার কর্মের জন্যই পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হবে।

“বস্তুত যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূকে এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় আমল ধ্বংস হয়ে গেছে। ***তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করতো।”***[১০৭]

*“পার্থিব জীবনে সামান্যই লাভ, এরপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদের আস্বাদন করাবো কঠিন আযাব—****তাদেরই কৃত কুফরির বদলাতে।”***[১০৮]

“যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি উম্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্র করবো, তারপর তাদের কাউকে ছাড়বো না। তারা তোমার প্রভুর [আল্লাহ] সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে—তোমরা আমার কাছে এসে গেছো; যেমন তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোনো প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করবো না। ***আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে, তার কারণে*** *তুমি অপরাধীদের ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে। তারা বলবে : “হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা!* ***এ যে ছোট বড়***

---

[১০৪] আল-কুরআন, সুরা আহকাফ, ৪৬ : ১৩-১৪

[১০৫] আল-কুরআন, সুরা দাহর (ইনসান) ৭৬ : ২২

[১০৬] আল-কুরআন, সুরা আ’রাফ, ৭ : ১৪৭

[১০৭] আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০ : ৭০

কোনো কিছুই বাদ দেয়নি; বরং সবকিছুই সংরক্ষিত রেখেছে!” তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রভু কারও প্রতি জুলুম করবেন না।”[১০৯]

“হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। হে আদমসন্তান! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের দাসত্ব করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার দাসত্ব করো। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বোঝোনি? এই সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হতো। ***তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ করো।***”[১১০]

তাদের কর্মই তাদের জিম্মাদার। এবং এই কর্ম আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে হয়ে থাকে। এই আয়াত ও হাদিসগুলোতে পুরো ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

“এখন মুশরিকরা বলবে, ***‘যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা; আর না আমরা কোনো বস্তুকে হারাম করতাম।’*** *এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা* ***মিথ্যারোপ করেছে,*** *পরিশেষে তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। বলো,* ***তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা আমাকে দেখাতে পারো? তোমরা যে-সবের পেছনে চলছো, তা ধারণা-অনুমান ছাড়া কিছু না। তোমরা শুধু অনুমান করেই কথা বলো।*** *বলে দাও : অতএব, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহরই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথপ্রদর্শন করতেন।”*[১১১]

---

[১০৮] আল-কুরআন, সুরা কাহফ, ১৮ : ৪৭-৪৯

[১০৯] আল-কুরআন, সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৫৯-৬৪

[১১০] আল-কুরআন, সুরা আন‘আম, ৬ : ১৪৮-১৪৯

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একখণ্ড কাঠ হাতে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তা দ্বারা যমিনে টোকা দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি তার মাথা উঠালেন। তখন তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকানা পরিজ্ঞাত (নির্ণীত) নয়। তাঁরা বললেন, ***ইয়া রাসুলুল্লাহ (ﷺ)! তাহলে আমরা কাজ-কর্ম ছেড়ে কি ভরসা করে বসে থাকবো না? তিনি বললেন, না, বরং আমল করতে থাকো।*** *যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে তার জন্য সহজ করা হয়েছে।*

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : ***"সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকি হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেবো সহজ পথ। এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, এবং যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেবো কঠোর পরিণামের পথ।"*** *(আল কুরআন, সূরা লাইল, ৯২ : ৫-১০)*[১১২]

আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ), আমি কি আমার উট বেঁধে আল্লাহর ওপর ভরসা করবো, নাকি আমি ওটাকে না বেঁধে ছেড়ে রেখেই আল্লাহর ওপর ভরসা করবো?" তিনি [রাসুল (ﷺ)] বললেন, ***"ওটাকে বাঁধো এবং [এরপর আল্লাহর ওপর] ভরসা করো।"***[১১৩]

কাজেই—"আল্লাহ না চাইলে তো পাপ কাজ করতাম না, তাকদিরে আছে বলেই পাপকাজ করেছি"—এ জাতীয় কথা বলার কোনো মানে নেই। কারণ, এরূপ কথা বলার অর্থ হচ্ছে—গায়েবের জ্ঞান থাকার দাবি করা। "তাকদিরে পাপ করার কথা আছে"—এটা তো কেউ আমাদের বলে দেয়নি। এই জ্ঞান

---

[১১১] সহীহ মুসলিম, হাদিস : ৬৪৯২

[১১২] সুনান তিরমিযি, হাদিস : ২৫১৭, হাসান

সূচীপত্র

তো আমাদের কারও নেই। কাজেই এ ধরনের কথা বলার অর্থ হচ্ছে, আন্দাজের অনুসরণ করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপকাজে লিপ্ত হওয়া।

মানুষের কি আদৌ কোনো ইচ্ছাশক্তি আছে, নাকি তাকে বাধ্য করা হচ্ছে? আল্লাহ কি কাউকে জোর করে জাহান্নামে পাঠাবেন?

কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে এটা আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিকভাবেই আগে থেকে জানেন।

"আল্লাহ কিছু মানুষকে জান্নাত এবং কিছু জাহান্নামের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যাদের জান্নাতের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা করেছেন তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে। যাদের জাহান্নামের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা করেছেন তাঁর ন্যায়বিচার অনুযায়ী।"[১১৪]

তবে এটা এ অর্থে নয় যে আল্লাহ জোর করে কাউকে জাহান্নামে পাঠাবেন। এটা আল্লাহ কর্তৃক সকল কিছুর নির্ধারণ অর্থে। আল্লাহ কারও প্রতি যুলুম করেন না, কারও প্রতি অবিচার করবেন না। মানুষের কর্ম ও বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের বিচার করা হবে।

কুরআন ও হাদিসে বলা হয়েছে—

*"...**আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন।** নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।"*[১১৫]

*"তিনিই (আল্লাহ) প্রথম বার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। **তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, মহান আরশের অধিকারী।**"*[১১৬]

---

[১১৪] ৮৩ নং আকিদা; 'আকিদা আত ত্বহাওয়ী', ইমাম আবু জাফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আত-ত্বহাওয়ী (র)

[১১৪] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ, ২ : ১৪৩

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী (ﷺ)-এর নিকট কিছুসংখ্যক বন্দি আসে। বন্দিদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলো। তার স্তন দুধে পূর্ণ ছিল। সে বন্দিদের মধ্যে কোনো শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিতো এবং দুধ পান করাতো। নবী (ﷺ) আমাদের বললেন, ***"তোমরা কি মনে করো, এ মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে?" আমরা বললাম, "না। ফেলার ক্ষমতা রাখলেও সে কখনো ফেলবে না।" তারপর তিনি বললেন, "এ মহিলাটি তার সন্তানের ওপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়ালু।"***[১১৭]

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করে অথচ এখনো তা সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়। আর যে ইচ্ছা করার পর কার্য সম্পাদন করে, তবে তার ক্ষেত্রে দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যেকোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা না করে, তবে কোনো গুনাহ লেখা হয় না; আর তা করলে (একটি) গুনাহ লেখা হয়।"[১১৮]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া (র) মানুষের কর্মের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন : *মানুষ প্রকৃতই কর্ম করে এবং আল্লাহ তাদের কর্মের স্রষ্টা। কোনো ব্যক্তি মু'মিন অথবা কাফির হতে পারে, পুণ্যবান কিংবা পাপী হতে পারে, সলাত আদায় ও সিয়াম পালন করতে পারে–* ***মানুষের তার কর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি রয়েছে।*** *আর আল্লাহ তার এ নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছাশক্তির স্রষ্টা। যেরূপ আল্লাহ বলেছেন—"[এটা] তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়। তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি*

---

[১১৫] আল-কুরআন, সুরা বুরুজ, ৮৫ : ১৩-১৫

[১১৬] সহীহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদিস : ২৭৫৪

[১১৭] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, হাদিস : ২৩৬

জগৎসমূহের প্রভু আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।” (আলকুরআন, সুরা তাকওয়ির, ৮১ : ২৮-২৯) [১১৭]

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (র.) বলেছেন : *“...যেসব কাজ মানুষের ইচ্ছাধীন সেগুলোর ক্ষেত্রে মানুষের **সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আছে।** যেমন মানুষের খাওয়া ও পান করার ক্ষমতা আছে। যেমন : ফজরের আযান শুনতে পেলে কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় (ওযু করতে) পানির দিকে যায়। একইভাবে যখন ঘুম আসে, মানুষ স্বেচ্ছায় বিছানায় যায়।...*

*এভাবে প্রতিটি কর্মের ক্ষেত্রেই মানুষকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দেয়া আছে। **যদি তা না হতো, তাহলে পাপীকে শাস্তি দেয়া অন্যায্য হতো। কীভাবে মানুষকে এমন কিছুর জন্য শাস্তি দেয়া যেতে পারে যার ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই? যদি তা না হতো, তাহলে কীভাবে পুণ্যবানকে পুরস্কার দেয়া যেতে পারে, যেখানে ঐ কর্মের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না?** ...*

*কাজেই মানুষের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আছে, তবে সে এমন কোনো কিছু করে না যা আল্লাহর নির্ধারণকৃত তাকদিরের বাইরে। কেননা, তার (মানুষের) কর্তৃত্বের ওপর আরও একটি কর্তৃত্ব (আল্লাহ্র কর্তৃত্ব) আছে। **কিন্তু আল্লাহ মানুষকে বাধ্য করেন না। সুতরাং মানুষের সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার আছে এবং এ অনুযায়ী মানুষ কাজ করে।***

তাই, যদি মানুষের ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কাজ সংঘটিত হয়, তবে এ কাজ তার ওপর আরোপ করা হয় না। আল্লাহ গুহাবাসীদের (আসহাবে কাহফ) ব্যাপারে বলেছেন : “তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি

---

[১১৮] আল ওয়াসিতিয়া মা’আ শারহ হাররাস, পৃষ্ঠা : ৬৫;

“Is man’s fate pre-destined or does he have freedom of will?” (islamqa)
https://islamqa.info/en/20806

[আল্লাহ] তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডান দিকে ও বাম দিকে। ...” (আল কুরআন, সুরা কাহফ, ১৮ : ১৮)

এখানে তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করার কর্মটি আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা হয়েছে; কারণ, তারা ছিল ঘুমন্ত এবং নিজেদের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেছেন, “যদি কেউ ভুলক্রমে খায় ও পান করে তবে সে যেন তার সিয়াম (রোজা) পূর্ণ করে নেয়; কেননা, আল্লাহ তা‘আলাই তাকে এ পানাহার করিয়েছেন।” [বুখারী : ১৯৩৩; মুসলিম : ১১৫৫]

এখানে খাওয়া ও পান করার কর্মগুলো আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা হয়েছে; কারণ, মানুষ রোজা অবস্থায় ভুলবশত এ কাজগুলো করে ফেলে। সে নিজে থেকে খেয়ে বা পান করে নিজের রোজা নষ্ট করবার সিদ্ধান্ত নেয়নি।’[১২০]

ইসলামবিরোধীরা অভিযোগ করতে চায় : ইসলাম বলে মানুষের কর্মের কোনো ভূমিকা নেই; বরং শুধু পূর্বনির্ধারণের জন্যই মানুষ জান্নাত লাভ করে বা জাহান্নামে যায়। তাদের মতে সবকিছু পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী সংঘটিত হয়, এতে মানুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। প্রচণ্ড বাতাসে কারও ছাদ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া আর সিঁড়ি বেয়ে স্বেচ্ছায় নিচে নেমে আসা একই কথা। অথচ এগুলো ছিল একটি বাতিল ফির্কা (*heretic*) ‘জাবারিয়াহ’দের আকিদা।[১২১] মুসলিম আলিমগণ এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে

---

[১১৯] **‘Are we Forced or do we have a Free Will’ by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen;** page : 54-55;
মূল আরবির জন্য দেখুন: শারহ হাদিস জিব্রীল [শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন(র)] ডাউনলোড লিঙ্ক: https://goo.gl/mGrWGn

[১২০] ‘ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম’, শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (র); পৃষ্ঠা : ১০৫-১০৬;
‘তাক্বদীর—আল্লাহর এক গোপন রহস্য’, আব্দুল আলীম ইবন কাওছার; পৃষ্ঠা : ৩১

কলম ধরেছেন। যে ধরনের বিশ্বাস ইসলামে নেই এবং যে বিশ্বাসকে খণ্ডন করে মুসলিম আলিমগণ কলম ধরেছেন, সেই বিশ্বাস ইসলামের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ তুলে যারা ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ নয়।

পার্থিব জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষা

আল্লাহ মানুষকে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, ভালো-খারাপ উভয় পথই মানুষের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, এবং এটিই মানুষের জন্য পরীক্ষা।

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, ***তাকে পরীক্ষা করার জন্য।*** *এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথনির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।"*[১২২]

"আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুই চক্ষু? আর জিহ্বা ও দুই ঠোঁট? এবং ***আমি কি তাকে দুইটি পথই দেখাইনি?***"[১২৩]

তাকদিরের এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, মুসলিমরা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। আবার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানরা নিজ নিজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। আবার অনেকের কাছে হয়তো আদৌ ইসলামের দাওয়াতই পৌঁছেনি। এদের কী হবে? ইসলাম এসব ব্যাপারে খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের অবহিত করেছে।

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারীরা মুসলিম আর অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারীরা অমুসলিম; মানুষের পরিণতি কি তবে জন্মের ভিত্তিতে?

---

[১২১] আল-কুরআন, সুরা দাহর (ইনসান), ৭৬ : ২-৩

[১২২] আল-কুরআন, সুরা বালাদ, ৯০ : ৮-১০

যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা জন্মের জন্য জান্নাতে যাবে না; বরং তাদের বিশ্বাস ও কর্মের জন্য জান্নাতে যাবে। অনেক মানুষ আছে, যারা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও সলাত (নামায) আদায় করে না, অথচ সলাত ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী।[১২৪] আবার অনেকেই মুসলিম পরিবারে জন্মেও ইসলাম ত্যাগ করে। মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া অবশ্যই জান্নাতের গ্যারান্টি নয়। আর যে অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, তার জন্য সেটি একটি পরীক্ষা। সে যদি সঠিক ও অবিকৃতভাবে ইসলামের দাওয়াত পায়, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে।

"যিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, ***যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।*** *তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।"*[১২৫]

"...তারপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার ওপর না কোনো ভয় আসবে, না (কোনো কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে।"[১২৬]

এ প্রসঙ্গে ইবন আবিল ইজ্জ হানাফী(র) {১৩৩১-১৩৯০ খ্রি./৭৩১-৭৯২ হি.} বলেছেন, *"...কেউ যদি সত্যের প্রমাণ সন্ধান ছাড়াই অন্ধভাবে বাবা-মা'কে অনুসরণ করে এবং তার সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়া সত্যকে অগ্রাহ্য করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করছে। এ থেকে সতর্ক করে আল্লাহ বলেছেন, "এবং যখন তাদের বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো, তখন তারা বলে : বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃ-*

---

[১২৩] সুনান তিরমিযি, হাদিস : ২৬১৯-২৬২৩

[১২৪] আল-কুরআন, সুরা মুলক, ৬৭ : ২

[১২৫] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ, ২ : ৩৮-৩৯

পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামীও ছিল না।” (আল কুরআন, সুরা বাকারাহ, ২ : ১৭০)

এই একই ব্যাপার মুসলিম পরিবারে জন্মানো অনেকের জন্যও সত্য। তারা বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে তাদের বাপ-দাদাদেরই অনুসরণ করে যায়। এগুলো যদি ভুলও হয় তবুও তারা সে ব্যাপারে সচেতন হয় না। এরা পরিবেশের দ্বারা মুসলিম, পছন্দের দ্বারা নয়। যখন এমন কাউকে কবরে জিজ্ঞেস করা হবে : “কে তোমার প্রভু?” সে বলবে : “হায়, আমি জানি না। আমি জানি না। আমি লোকজনকে কিছু জিনিস বলতে শুনতাম এবং আমিও তা-ই বলতাম।”[১২৭]

যাদের কাছে পৌঁছেনি সত্য ধর্মের দাওয়াত

এক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন আসে যে, অনেকের কাছে তো ইসলামের দাওয়াতই পৌঁছায় না। পৃথিবীতে অনেক দুর্গম জায়গা আছে যেখানে হয়তো ইসলামের দাওয়াত যায়নি। আবার অনেকে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার জন্য (যেমন বার্ধক্য, জ্ঞান লোপ হওয়া) ইসলামের দাওয়াত থেকে বঞ্চিত হয়। এসব ব্যাপারেও ইসলাম আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে অভিহিত করে। আল্লাহ কারও প্রতি সামান্যতম অন্যায় করবেন না। এটি আল্লাহর সিফাত বা গুণ নয় যে তিনি বান্দার প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করেন।

*“**নিশ্চয়ই আল্লাহ কারও প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করেন না;** আর যদি তা (মানুষের কর্ম) সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন।”*[১২৮]

“...বস্তুত আল্লাহ তাদের ওপর কোনো অন্যায় করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করছিলো।”[১২৯]

---

[১২৬] ‘শারহ আকিদা আত ত্বহাওয়ী’ – ইবন আবিল ইজ্জ হানাফী(র); পৃষ্ঠা : ১৯০ (ইংরেজি অনুবাদ)

[১২৭] আল-কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ৪০

[১২৮] আল-কুরআন, সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১১৭

*“তারপর এদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের কারণে আমি পাকড়াও করেছিলাম; তাদের কারও ওপর আমি পাথরকুচির ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট আওয়াজ, কাউকে আবার মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছি আর কাউকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি। **আল্লাহ এমন নন যে, তাদের ওপর জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম করতো।**”*[১৩০]

“আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদের এবং নিজের ওপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন, ‘আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?’ তারা বললো, ‘অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি।’ আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।”[১৩১]

“কোনো রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।”[১৩২]

“চার প্রকারের লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার সাথে কথোপকথন করবে। প্রথম হলো বধির লোক, যে কিছুই শুনতে পায় না। দ্বিতীয় হলো সম্পূর্ণ নির্বোধ ও পাগল লোক, যে কিছুই জানে না। তৃতীয় হলো অত্যন্ত বৃদ্ধ, যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। চতুর্থ হলো ঐ ব্যক্তি, যে এমন যুগে জীবন যাপন করেছে যে যুগে কোনো নবী আগমন করেননি বা কোনো ধর্মীয় শিক্ষাও বিদ্যমান ছিলো না। বধির লোকটি বলবে, “ইসলাম এসেছিলো, কিন্তু আমার কানে কোনো শব্দ পৌঁছেনি।” পাগল বলবে, “ইসলাম এসেছিলো বটে, কিন্তু আমার অবস্থা তো এই ছিলো যে শিশুরা আমার ওপর গোবর নিক্ষেপ করতো।” বৃদ্ধ বলবে, “ইসলাম এসেছিলো, কিন্তু আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিলো, আমি কিছুই বুঝতাম না।” আর যে লোকটির কাছে কোনো রাসুল আসেনি এবং সে তাঁর কোনো শিক্ষাও পায়নি সে বলবে, “আমার কাছে

---

[১২৯] আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪০

[১৩০] আল-কুরআন, সুরা আ‘রাফ, ৭ : ১৭২

[১৩১] আল-কুরআন, সুরা বনী ইসরাইল (ইসরা), ১৭ : ১৫

কোনো রাসুল আসেননি এবং আমি কোনো সত্যও পাইনি। সুতরাং আমি আমল করতাম কীভাবে?"

তাদের এসব কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা তাদের নির্দেশ দেবেন—"আচ্ছা যাও, জাহান্নামে লাফিয়ে পড়ো।" রাসুল (ﷺ) বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! ***যদি তারা আল্লাহর আদেশ মেনে নেয় এবং জাহান্নামে লাফিয়ে পড়ে, তবে জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য ঠান্ডা আরামদায়ক হয়ে যাবে।"*** *অন্য বিবরণে আছে যে,* ***যারা জাহান্নামে লাফিয়ে পড়বে তা তাদের জন্য হয়ে যাবে ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক। আর যারা বিরত থাকবে, তাদের হুকুম অমান্যের কারণে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"***

ইমাম ইবন জারির (র) এই হাদিসটি বর্ণনা করার পরে আবু হুরাইরা (রা.) এর নিম্নের ঘোষণাটি উল্লেখ করেছেন, "এর সত্যতা প্রমাণ হিসেবে তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলার وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا *(কোনো রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।) বাক্যও পাঠ করতে পারো।'*[১৩৩,১৩৪]

"কিয়ামতের দিন অজ্ঞ ও বোধহীন লোকেরা নিজেদের বোঝা কোমরে বহন করে নিয়ে আসবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সামনে ওজর পেশ করে বলবে, ***"আমাদের কাছে কোনো রাসুল আসেননি এবং আপনার কোনো হুকুমও পৌঁছেনি। এরূপ হলে আমরা মন খুলে আপনার কথা মেনে চলতাম।"***

তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "আচ্ছা, এখন যা হুকুম করবো তা মানবে তো?" উত্তরে তারা বলবে, "হ্যাঁ, অবশ্যই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবো।" তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন, "আচ্ছা যাও, জাহান্নামের পার্শ্বে গিয়ে তাতে

---

[১৩২] মুসনাদ আহমাদ, তাফসির ইবন কাসির {তাফসির পাবলিকেশন কমিটি (ড. মুজিবুর রহমান)}, সুরা বনী ইসরাইল ১৫ নং আয়াতের তাফসির

[১৩৩] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া যাহলী (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে নবীশূন্য যুগের লোক, পাগল ও শিশুর কথাও এসেছে

প্রবেশ করো।" তারা তখন অগ্রসর হয়ে জাহান্নামের পার্শ্বে পৌঁছে যাবে। সেখানে গিয়ে যখন জাহান্নামের উত্তেজনা, শব্দ এবং শাস্তি দেখবে তখন ফিরে আসবে এবং বলবে, "হে আল্লাহ! আমাদের এর থেকে রক্ষা করুন।" আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "দেখো, তোমরা অঙ্গীকার করেছো যে, আমার হুকুম মানবে। আবার এই নাফরমানি কেন?" তারা উত্তরে বলবে, "আচ্ছা, এবার মানবো।"

অতঃপর তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নেয়া হবে। তারপর এরা ফিরে এসে বলবে, "হে আল্লাহ, আমরা তো ভয় পেয়ে গেছি। আমাদের দ্বারা তো আপনার এই আদেশ মান্য করা সম্ভব নয়।" তখন প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলবেন, "তোমরা নাফরমানি করেছো। সুতরাং এখন লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামী হয়ে যাও।" রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন যে, ***"প্রথমবার তারা যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জাহান্নামে লাফিয়ে পড়তো, তবে তার অগ্নি তাদের জন্য ঠান্ডা হয়ে যেতো এবং তাদের দেহের একটি লোমও পুড়তো না।"***[১৩৫]

আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা যা জানতে পারি তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে—যারা আদৌ ইসলামের দাওয়াত পাবে না, তাদের প্রতি পরকালে যে পরীক্ষা হবে তা মোটেও তাদের সাধ্যাতীত কিছু হবে না। অনেক লোকই আগুনের সেই পরীক্ষাতেও নিজ যোগ্যতায় পাশ করে যাবে এবং অনেকে নিজ অযোগ্যতায় ব্যর্থ হবে।

"**আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না**; সে তা-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তা-ই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।..."[১৩৬]

---

[১৩৪] মুসনাদ বাযযার, ইমাম ইবন কাসির (র) এর মতে ইমাম ইবন হিব্বান (র) নির্ভরযোগ্যরূপে বর্ণনা করেছেন; তাফসির ইবন কাসির {তাফসির পাবলিকেশন কমিটি (ড. মুজিবুর রহমান)}; সুরা বনী ইসরাইল ১৫ নং আয়াতের তাফসির, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (র) ও নাসাঈ (র) এর মতে এতে (সনদের ব্যাপারে) ভয়ের কোনো কারণ নেই।

[১৩৫] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ, ২ : ২৮৬

ইসলাম বলে—মানবজাতির কাছ থেকে তাদের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন। আল্লাহ আদি যুগ থেকে নবী-রাসুল প্রেরণ করে মানুষকে একত্ববাদের ধর্মের দিকে আহ্বান করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মাধ্যমে এই ধর্মের প্রচার আজও আছে। যুগে যুগে প্রত্যেকের কাছেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দূত এসেছে। যারা তাদের নিজ যুগের নবীকে মেনেছে বা মানবে, তারা মুক্তি পাবে। আর যাদের কাছে আদৌ এই আহ্বান পৌঁছেনি, তাদের ফয়সালার কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

"(শুরুতে) সকল মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলো, তখন) আল্লাহ তা'আলা নবীদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্যসংবলিত কিতাব, যাতে তারা মানুষের মধ্যে সেসব বিষয়ে মীমাংসা করে দেন, যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিলো। আর (পরিতাপের বিষয় হলো,) অন্য কেউ নয়; বরং যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারাই সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলি আসার পরও কেবল পারস্পরিক রেষারেষির কারণে তাতেই (সেই কিতাবেই) মতভেদ সৃষ্টি করলো। তারপর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো, সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সঠিক পথে পৌঁছে দেন। আর আল্লাহ যাকে চান, তাকে সরল-সঠিক পথে পৌছে দেন।"[১৩৭]

"আমি তোমার [মুহাম্মাদ (ﷺ)] পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসুল প্রেরণ করেছি।"[১৩৮]

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত (আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করা হয়) থেকে নিরাপদ থাকো। এরপর তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেলো।

---

[১৩৬] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ, ২ : ২১৩

[১৩৭] আল-কুরআন, সুরা হিজর, ১৫ : ১০

সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যারোপকারীদের কীরূপ পরিণতি হয়েছে।”[১৩৯]

“যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোনো রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।”[১৪০]

“তোমরা কুফর অবলম্বন করলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন; তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে তিনি তা তোমাদের জন্য পছন্দ করবেন। আর কোনো ভারবাহী অন্যের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রভুর নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করে যাচ্ছিলে। নিঃসন্দেহে অন্তরের ভেতরে যা আছে, সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।”[১৪১]

এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ফতোয়ার ওয়েবসাইট *islamqa* থেকে শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ (হাফিজাহুল্লাহ) এর এই ফতোয়াটি দেখা যেতে পারে :

“The fate of kuffaar who did not hear the message of Islam”[১৪২]

অমুসলিমদের মারা যাওয়া শিশু সন্তানদের পরিণতি কী হবে?

প্রত্যেক মানুষকেই স্রষ্টা আল্লাহ সঠিক ফিতরাত বা স্বভাবধর্মের ওপর সৃষ্টি করেন। আর সেটি হচ্ছে একত্ববাদ, স্রষ্টার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ বা ইসলাম। পরবর্তীতে মানুষ পিতামাতা ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস

---

[১৩৮] আল-কুরআন, সুরা নাহল, ১৬ : ৩৬

[১৩৯] আল-কুরআন, সুরা ইসরা, ১৭ : ১৫

[১৪০] আল-কুরআন, সুরা যুমার, ৩৯ : ৭

[১৪১] https://islamqa.info/en/1244

লাভ করে। বিভিন্ন অমুসলিম সম্প্রদায় (হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি) এর শিশু-সন্তানের ব্যাপারে ইসলাম যা বলে :

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, "প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিতরাতের ওপর। এরপর তার মা-বাপ তাকে ইহুদি বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারিরূপে গড়ে তোলে। যেমন : চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও?" পরে আবু হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন—

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

"আল্লাহর দেয়া ফিতরাতের (অর্থাৎ, ইসলামের) অনুসরণ করো, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন।" (আল কুরআন, সুরা রূম, ৩০ : ৩০)[১৪৩]

সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) প্রায়ই তাঁর সাহাবীদের (রা.) বলতেন, তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছো কি? রাবি বলেন, যাদের বেলায় আল্লাহর ইচ্ছা, তারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতো। তিনি [রাসুলুল্লাহ (ﷺ)] একদিন সকালে আমাদের বললেন, গত রাতে আমার কাছে দু-জন আগন্তুক আসলেন। তাঁরা আমাকে উঠালেন। আর আমাকে বললেন, চলুন। ......তাঁরা আমাকে বললেন, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং একটা সজীব-শ্যামল বাগানে উপনীত হলাম, যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চতুষ্পার্শে এত বিপুলসংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত বেশি আর কখনো আমি দেখিনি। আমি

---

[১৪২] সহীহ বুখারি, হাদিস: ৯৫৩১

[মুহাম্মাদ (ﷺ)] তাদের বললাম, উনি কে? এরা কারা? তাঁরা আমাকে বললেন, চলুন, চলুন।

.... আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি, যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন, ইবরাহিম (আ.)। ***আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিতরাত (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কিছুসংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! মুশরিকদের(বহু ঈশ্বরবাদী/পৌত্তলিক) শিশু সন্তানরাও কি? তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও।*** *...”*[১৪৪]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে।” মানুষেরা তখন উচ্চস্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, “মুশরিকদের শিশুরাও কি?” উত্তরে তিনি বলেন, ***“মুশরিকদের শিশুরাও।”***[১৪৫]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, ***মুশরিকদের শিশুদের জান্নাতবাসীদের খাদেম বানানো হবে।***[১৪৬]

এ ব্যাপারে আরো ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত আছে। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদিস পর্যালোচনা করে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইবন হাজার আসকালানী(র.) এর অভিমত হচ্ছেঃ প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে অমুসলিমদের যে শিশুসন্তানরা মারা যায়, তারা জান্নাতী হবে। [১৪৭]

---

[১৪৩] সহীহ বুখারি; খণ্ড : ৯, অধ্যায় : ৮৭ (স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান অধ্যায়), হাদিস নং : ১৭১

[১৪৪] হাফিজ আবু বকর বারকানি (র), আল মুস্তাখরিজ ‘আলাল বুখারি

[১৪৫] তাবারানি, তাফসির ইবন কাসির {তাফসির পাবলিকেশন কমিটি (ড. মুজিবুর রহমান)}, সুরা বনী ইসরাইল ১৫ নং আয়াতের তাফসির

[১৪৬] "They will be from amongst the dwellers of Jannah (paradise) according to the nature of Islam that every child is created upon. In the famous Hadith, Rasoolullah Sallahu alaihi wasallam has said: ‘ Every born child is created upon the fitrah (natural religion of Islam in which there is

শিশু অবস্থায় মারা গেলে সেটি তাদের জন্য ওজর হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যে কোনো মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক থাকে। এই সময়ে যদি তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায় এবং সে যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা নাস্তিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা তার জন্য অজুহাত হতে পারে না। নিজ কর্মের জন্যই সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়। তার জন্য নির্ধারিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার দ্বারা। পৃথিবীতে বহু মানুষ এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হচ্ছে, অমুসলিম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে।

উপসংহার:

আমরা উপসংহারে বলতে পারি : দুনিয়াতে যার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে এবং সে তা অস্বীকার করেছে, পরকালে তার আর কোনো ওজর পেশ করার সুযোগ নেই। যাদের নিকট দুনিয়াতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, পরকালে তাদের একপ্রকারের পরীক্ষা হবে এবং তাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা মুক্তিলাভ করবে। সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে, কারও প্রতি

---

inclination to Tawhid, the oneness of Allah). Thereafter, his/her parents make him Jew, Chistian or a Fire-Worshipper.'

From this Hadith we learn that every child is born Muslim, so according to it, if a child dies before reaching the age of understanding, then he should be granted entry into Paradise. Hafiz Ibn Hajar, one of the leading Hadith Scholars of all tme is inclined towards this view. He states: ' The Hadith mentioned above was narrated by the Prophet before anything concrete was revealed to him about the dying children of the non-believers. This is why the Prophet left it to Allah's knowledge and didn't make a judgement."

From: "Do All Kids Go To Heaven - IslamQA Hanafi"

http://islamqa.org/hanafi/muftisays/9358

সামান্যতম জুলুমও করা হবে না। পৃথিবীতে অন্যায় আছে বলেই ন্যায়ের মহিমা প্রকাশ পায়। পাপ না থাকলে পুণ্য বলে কিছু থাকতো না, পুণ্যবানের পুণ্যের কোনো মূল্য থাকতো না। পৃথিবীতে যত অন্যায়-অপরাধ হয়, এর কোনোটির ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। আল্লাহ মানুষের তাকদির নির্ধারণ করেছেন। মানুষকে ইচ্ছাশক্তিও দিয়েছেন, মানুষের বিশ্বাস ও কর্ম দ্বারা সে জান্নাত বা জাহান্নামের উপযোগী হয়। আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুমও করেন না। পরিণতি জানা সত্ত্বেও আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার পরীক্ষাক্ষেত্রে পাঠান, তার ভালো-মন্দ পরীক্ষা করার জন্য। মানুষের কর্ম অনুযায়ী আল্লাহ এর প্রতিদান দেন। আল্লাহ সব থেকে বড় ন্যায়বিচারক। মানুষকে চেতনা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি এজন্য দিয়েছেন যেন মানুষ তা ব্যবহার করে। সুনির্দিষ্টভাবে সাহাবীদের—“তাহলে আমরা কাজ-কর্ম ছেড়ে কি ভরসা করে বসে থাকব না?”—প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (ﷺ) এটি করতে নিষেধ করেছেন এবং সাধ্যানুযায়ী সৎকর্মের উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ যদি এরপরেও তাকদিরের ওপর দোষ দিয়ে বসে থাকে ও সৎকর্ম না করে, তবে এজন্য আল্লাহ মোটেও দায়ী নন। কারণ তাকে তো তার তাকদির জানিয়ে দেয়া হয়নি। কে তাকে বলে দিয়েছে যে, সে জাহান্নামেই যাবে? বরং এই বসে থাকাটাই তার জন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

ইসলামে দাসপ্রথা

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

দাসপ্রথা—এই শব্দটি শুনলেই মনের আয়নায় ভেসে ওঠে একজন জাঁদরেল লোক অনেকগুলো দাসকে পেটাচ্ছে, কাজ করতে বাধ্য করছে, বৃদ্ধ বা নারী-শিশু কাউকেই ছাড় দিচ্ছে না, আর এতে সেই লোক পাশবিক আনন্দ নিয়ে হাসছে, ইত্যাদি ছবি। দাসপ্রথা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই চলছে বিতর্ক। এই সামাজিক ব্যাধি নিয়ে বিতর্কের কূল-কিনারা পাওয়া বেশ মুশকিল। তবে ইসলামকে আঘাত করার জন্য পূর্বের প্রাচ্যবিদ আর বর্তমানে খ্রিষ্টান মিশনারি, নাস্তিক-মুক্তমনা, আর কম্যুনিস্টদের অন্যতম এক হাতিয়ার হলো দাসপ্রথা ও ইসলামের সম্পর্ক। তারা তাদের কথার মাধ্যমে সন্দেহের বীজ বুনে দিতে চায়, যাতে মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান করা যায়। এর ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে প্রাচ্যবিদদের দ্বারা, যারা রাসুলুল্লাহর (ﷺ) জীবনী লেখার নামে তাঁর (ﷺ) বিরুদ্ধে অতীব সুকৌশলে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। *J.J. Pool, William Muir* এসব কুখ্যাতদের নাম এই ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। তাদের যোগ্য উত্তরসূরি খ্রিষ্টান মিশনারি, নাস্তিক-মুক্তমনা এবং কম্যুনিস্ট। ইসলামকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আঘাত করার জন্যে যাদের খুব বিখ্যাত চাল হলো, ইসলামের দাসপ্রথা। এদের জবাবের আগে অতি সংক্ষেপে দাসপ্রথার ইতিহাস জেনে নেয়া যাক।

দাসপ্রথা ও ইসলাম

প্রাচীন রোম আর গ্রিসে দাসপ্রথার জঘন্যতম পাশবিকতার বর্ণনা দেয়া আসলেই কঠিন। তারা সারা বছরই ধন-সম্পদের লোভে যুদ্ধে লেগে থাকতো। যুদ্ধে জয়ী হলে তারা নারী-পুরুষ সবাইকে দাস বানিয়ে পশুর মতো খাটাতো

আর নারীদেরকে ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার করতো। তাদের জীবনের অন্যতম ভোগ্য বস্তুই ছিল নারী। দাসরা তাদের প্রভুর ওপর সামগ্রিকভাবে নির্ভর করতো পিতার মতোই। এমনকি কোনো প্রভুরা দাসদের নিজেদের সন্তান বলে পরিচয় দিতো, যাকে গ্রিক ভাষায় পাই এবং ল্যাটিন ভাষায় পুয়ের বলা হতো।[১৪৮] দাসদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতো না। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য তাদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার নিপীড়নও চলতো। সামান্য কাচের দামি পানপাত্র ভেঙে ফেলার অপরাধে তাদের কখনো কখনো ছেড়ে দেয়া হতো হিংস্র সব মাছভর্তি চৌবাচ্চায়।[১৪৯] কখনো কখনো রোমান দর্শকদের আনন্দ দানের জন্য দাসদেরকে বা যুদ্ধবন্দিদেরকে ভয়ানক হিংস্র প্রাণীর সাথে বা কখনো মারাত্মক অপরাধীদের সাথে লড়তে বাধ্য করা হতো, যাদের গ্ল্যাডিয়েটর বলা হতো।[১৫০] দুর্ভিক্ষের দিনে খাবার বাঁচানোর জন্যে গ্ল্যাডিয়েটরদের নগর থেকে বিতাড়িত করা হতো। তাদের মানুষ বলেই বিবেচনা করা হতো না। আর তাই দাসদের কোনোপ্রকার মানবিক অধিকার ছিল না। তাদের ওপর অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচারের তালিকা অনেক বড়, যা বর্ণনা করা মূলত এখানে উদ্দেশ্য নয়।

মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। ইসলাম কেন দাসপ্রথাকে সমর্থন করে বা এই ধরনের হাজারো প্রশ্নের আগে চলুন একটু ঘুরে আসি ইসলামপূর্ব যুগে। সেই সময়ে দাসপ্রথার কী অবস্থা ছিল?

সেই সময়ে কয়েক উপায়ে দাস বানানো যেতো:

(১) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হতো, তাহলে তাকে দাস বানানো হতো;

---

[১৪৮] রেদওয়ানুর রহমান, দাস বিদ্রোহ ও স্পার্টাকাস (সমতট, ২০১৫), পৃ : ১৪

[১৪৯] ঐ, পৃ : ১৬

[১৫০] https://www.ancient.eu/gladiator/

(২) অভাবের তাড়নায় বাবা-মা সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য ধনীদের কাছে দিয়ে দিতো আর ক্রয়কারীরা তাদের দাস করে রাখতো নিজেদের কাছে;

(৩) যেহেতু অবকাঠামোগত তেমন সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিল না, তাই অর্থনৈতিক কারণে সমাজের অনগ্রসর ব্যক্তিরা নিজেদের সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দাস হয়ে যেতো;

(৪) ছিনতাই বা অপহরণের মাধ্যমে কাউকে বন্দি করে দাস বানানো;

(৫) অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সাথে অসদ্ব্যবহার করার জন্যে কাউকে দাস বানানো;

(৬) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ। আরবে সব সময় গোত্রভিত্তিক যুদ্ধ লেগেই থাকতো। এই সময়ে যুদ্ধের কারণে বিজিত জাতির নারী-পুরুষকে অনিবার্যভাবে দাস হয়ে যেতে হতো। মূলত যুদ্ধই প্রাচীনকাল থেকে দাস হওয়ার মূল কারণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। হোক তা গ্রিক, রোমান, আরবীয় বা ভারতীয় সমাজ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে দাস-দাসী রাখা বা থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, বলা যেতে পারে সেই সময়কার সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এই দাসপ্রথা। এটি এমন এক ব্যাপার ছিল, যা কেউই অপছন্দ করতো না বা একে পরিবর্তনের চিন্তাও করতো না। সেই সময়ে তা ছিল সভ্যতার একেবারে অস্থি-মজ্জাগত বিষয়, যাকে একেবারে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে অনেকে অভিযোগ করেন যে, কেন ইসলাম দাসপ্রথাকে একেবারে গোড়া থেকেই উচ্ছেদ করে দেয়নি। যেখানে মদ খাওয়াকে ধীরে ধীরে হারাম করা হয়েছে, দাসপ্রথাকে কেন পর্যায়ক্রমিকভাবে একেবারে হারাম করে দেয়া হয়নি?

সে সময়ে আরবের লোকেরা ছিল মদের জন্য পাগলপ্রায়। তবে মদ যতোটা তাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল, তার তুলনায় দাসব্যবস্থার প্রভাব ও প্রসার ছিল

আরও অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক— অনেকদিক থেকেই দাসপ্রথার সুগভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাই ইসলাম দাসব্যবস্থাকে একেবারে বিলুপ্ত না করে বরং কিছু অভূতপূর্ব বাস্তবমুখী নিয়মে দাসদের মুক্ত করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে বা কখনো আবশ্যক করেছে। সাথে সাথে দাস বানানোর (*Enslaving*) সকল প্রথাকে বন্ধ করে দিয়ে শুধু একটি উপায়কে উন্মুক্ত রেখেছে, যা নিয়ে একটু পরেই আলোচনা আসছে। তার আগে ইসলাম কী কী উপায়ে দাসমুক্তির ব্যবস্থা করেছে তা আলোচনা করা হবে।

ইসলামে দাসমুক্তির উপায়

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যার অর্থই হল বিশ্বজগতের এক এবং একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট নিজেকে সমর্পণ করা। প্রতিটি মানুষই আল্লাহর দাস বা গোলাম, যিনি তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা। গর্ভধারিণী মায়ের থেকেও যিনি তাঁর দাসকে অনেক বেশি ভালোবাসেন। ইসলামের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো প্রতিটি মানুষ —হোক সে ধনী বা গরিব, বড় বা ছোট, স্বাধীন বা দাস, সে যে পর্যায়েরই হোক না কেন— সকলকে সর্বপ্রকার মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বমনা করতে পারা। সকল প্রকার গোলামির পিঞ্জর থেকে বের করে এনে, তাওহিদ ও ইসলামের ছায়াতলে এনে আল্লাহর দাস হিসেবে নিজেকে চিনতে পারাই দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রথম উপায়। হয়তো শারীরিক দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য আব্রাহাম লিংকন চুক্তি করেছিল। তবে সত্যিকারের দাসত্ব থেকে মুক্তি মেলেনি। ইসলাম প্রথমেই যেই জিনিসের শিক্ষা দিলো, তা হলো সকলেই আল্লাহর বান্দা। কারও ওপর কারও কোনোপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই শুধু ঈমান ও তাকওয়া ছাড়া।[১৫১] এই এক শিক্ষাই এতদিনের দাসত্বের শক্ত খাঁচা থেকে মুক্তি দিলো। তাই তো কৃষ্ণাঙ্গ সম্মানিত সাহাবী বিলাল ইবন রাবাহ (রা.)-ও

[১৫১] আল-কুরআন, সুরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩

ইসলামের তাওহিদের দাওয়াত পেয়ে হয়ে গেলেন মুক্ত, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাঁকে আর আল্লাহর দাস হতে বাধা দিতে পারেনি। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে চিত করে শুইয়ে বুকে পাথর রেখে দিলেও কখনো “আহাদ!! আহাদ!!” বলতে ভুল হয়নি। কেননা ইসলাম তাঁকে সত্যিকারের মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। এখন আর তিনি আল্লাহ ছাড়া কারও গোলাম নন, আর কারও দাসত্বে তিনি আর বন্দি নন। এই বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভেজাল মুক্তমনারা কখনোই সত্যিকার মুক্তমনের স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম নয়। তবে ইসলাম শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি। ইসলাম দাসদের মুক্ত করার ব্যাপারে কিছু যুগান্তকারী পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) ইতক বা স্বেচ্ছায় মুক্তিদান;

(২) গুনাহের কাফফারা;

(৩) মুকাতাবাহ; এবং

(৪) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা

(১) ইতক বা স্বেচ্ছায় মুক্তিদান:

কোনো মনিব যদি চান, তাহলে সরাসরি এবং স্বেচ্ছায় দাস-দাসীকে মুক্তি দিতে পারেন। কুরআন ও হাদিসে এর অনেক ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ সৎকর্মের উল্লেখের সময় মুক্তিকামী ক্রীতদাসের জন্য ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছেন। (সুরা বাকারাহ ২ : ১৭৬)

এছাড়াও আল্লাহ বলেন, *“আপনি কি জানেন সেই ঘাঁটি কী? তা হলো দাসমুক্তি।”* [১৫২]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

[১৫২] আল-কুরআন, সুরা বালাদ, ৯০ : ১২-১৩

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে, তাকে তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।” [১৫৩]

এছাড়াও স্বেচ্ছায় দাসমুক্তি বা ইতকের অনেক ফযিলত রয়েছে। এই কারণেই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীরা এই ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হয়ে অনেক দাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-ও অনেক দাসকে ইতক বা স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছিলেন। এছাড়া আবু বাকর (রা.) যিনি বেশ ধনী ছিলেন, তিনিও দাসমুক্তির জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। ইতিহাসে এর নজির দ্বিতীয়টি নেই যে, স্বেচ্ছায় কেউ এত পরিমাণে দাস মুক্ত করেছে। এর একমাত্র কারণ আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর জান্নাত লাভের খালিস ইচ্ছা। আর কিছুই নয়।

(২) গুনাহের কাফফারাহ:

ইসলামে কিছু গুনাহের জন্য দাসমুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন :

(ক) কোনো মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করে ফেললে (সুরা নিসা, ৯২)

(খ) আল্লাহর নামে কৃত শপথ ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করে ফেললে (সুরা মায়িদাহ, ৮৯)

(গ) যিহার।[১৫৪]

(ঘ) রোযার সময় ভুলবশত স্ত্রী মিলন করে ফেললে।[১৫৫]

(৩) মুকাতাবাহ বা লিখিত চুক্তি:

---

[১৫৩] সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কিতাবুল ইতক, হা : ২৩৫১

[১৫৪] যিহার হলো স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বলা যে তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো হারাম এই কথা বললে সে-ই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে যেমন তার মা তার জন্য হারাম।

[১৫৫] সহীহ বুখারি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩/২৫৮, হা : ১৮১৩

মুকাতাবাহ বলতে এমন চুক্তিকে বোঝায়, যার দ্বারা দাস নিজেই নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধের শর্তে তার মুক্তির জন্য তার মনিবের সাথে এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যাতে মনিব ও দাস উভয়েই ঐকমত্যে পৌঁছায়। শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম আত-তুওয়াইজিরি (র) বলেন, "এটি হচ্ছে দাস-দাসীর পক্ষ থেকে মনিবকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আজাদ করার নাম।"[১৫৬]

আল্লাহ বলেন, "*তোমাদের অধিকারভুক্ত যারা চুক্তিবদ্ধ হতে চায়, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও, যদি তাতে কল্যাণ থাকে।*"[১৫৭]

ইসলাম মুকাতাবাহকে সহজ করে দিয়েছে। যেহেতু :

১) যাকাতের একটি খাত ইসলাম নির্ধারণ করেছে দাসমুক্তি। (সুরা তাওবাহ, ৬০);

২) গোলামের জন্য এই ছাড় আছে যে সে মনিবকে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করবে;[১৫৮]

৩) মনিবের কর্তব্য হলো দাসকে অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে সহায়তা করা;

৪) দাস চুক্তি মোতাবেক অর্থ পরিশোধ করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্তি লাভ করবে;

(৪) ইসলামি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়:

ইসলামি সরকার যাকাতের খাত থেকে দাসমুক্তিতে ব্যবহার করতে পারে যেমনটা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর মুকাতাবাহ চুক্তি সম্পাদন করার পরে দাসের এই নিয়ে মোটেও চিন্তা করা লাগতো না যে, তার মনিব এই কারণে

---

[১৫৬] কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামি ফিকহ, ২/৪৪৬

[১৫৭] আল কুরআন, সুরা নূর, ২৪ : ৩২

[১৫৮] সহীহ বুখারি, কিতাবুল ইতক, হা : ২৩৯৩

তার ওপর অত্যাচার করতে পারে। কেননা ইসলামি সরকার তখন তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে যান। এমনকি সরকার চাইলে বাড়তি অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দিতে পারে।

ইসলাম দাস বানানোর প্রায় সকল রাস্তাকে (একটি ব্যতীত) বন্ধ করে দিলেও মুক্তির অভিনব পদ্ধতি দিয়েছে, যা সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক। এমন সব উপায়ের সন্ধান দিয়েছে, যার ধারেকাছে কোনো তথাকথিত আধুনিক রাষ্ট্র ভাবতেও পারেনি। যেখানে কম্যুনিস্ট আর সোশ্যালিস্টরা সবকিছুকেই অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে চায়, সেখানে ইসলাম দাস ও স্বাধীন সকলকেই সত্যিকার মানসিক ও বাহ্যিক অর্থেও মুক্তির পথের দিশা দেয়। যেখানে আমেরিকার মতো রাষ্ট্র একের পর এক দাস বিদ্রোহে জর্জরিত হয়ে দাস মুক্তির পথ অন্বেষণ করে, তখন ইসলাম কালোত্তীর্ণ সমাধান ১৪০০ বছর আগেই দিয়ে গেছে।

ইসলামে দাসপ্রথার স্বরূপ

দাসপ্রথা ও দাসমুক্তির ব্যাপারে ইসলামের যুগান্তকারী উপায়সমূহের ব্যাপারে অতি সংক্ষেপে আলোচনার পর ইনশাআল্লাহ আমরা এখন ইসলামে দাসপ্রথার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করবো। দাসদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে, কুরআন কারিমে তার আলোচনা আছে, কিন্তু কোথাও দাস বানানোর বিষয়ে উল্লেখ নেই। কুরআন কারিমের কোথাও স্বাধীন মানুষকে দাস বানানোর ব্যাপারে আদেশসূচক কোনো আয়াতও নেই। তবে যেহেতু সরাসরি কুরআনে দাস বানানোর ব্যাপারে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো আয়াত নেই, তাই একে সরাসরি নিষেধ করারও কোনো উপায় নেই।

ইসলামপূর্ব সময়ে যে যে উপায়ে দাস বানানো যেতো, ইসলাম সেই সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে শুধু একটি বাদে। তা হলো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যুদ্ধবন্দিদের দাস বানানো। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দি ছাড়া ইসলামে দাস বানানোর আর কোনো উপায় বাকি নেই। তবে তা-ও বেশ শর্তসাপেক্ষে, যা একটু পরেই উল্লেখ করা হবে। তার আগে জেনে নিই যে, ইসলামে মূলত জিহাদ কী ও

কেন। ইসলামে জিহাদ বলতে আল্লাহর রাস্তায় কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করাকে বোঝায়।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আত-তুওয়াইজিরি (র) বলেন, "আল্লাহর কালেমা তথা তাওহিদকে উড্ডীন করার নিমিত্তে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বলে।"[১৫৯]

জিহাদ মূলত বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

১) ফিতনা দূরীভূত করা এবং দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। (আল কুরআন, সুরা-আনফাল, ৮ : ৩৯); এখানে ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক ও কুফর।

২) ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য।

৩) মজলুম মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সাহায্য করা। (আল কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ৭৬)

৪) তাগুত অথবা জালিমের বিরুদ্ধে (আল কুরআন, সুরা নিসা, ৪ : ৭৬)

৫) আগ্রাসন রোধের জন্য (আল কুরআন, সুরা বাকারাহ, ২ : ১৯০)

মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর গোলামির দিকে নিয়ে যাওয়া, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যাওয়া, আর অন্যান্য দ্বীন বা মতবাদের অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম থেকে ইসলামের ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে যাওয়াই ইসলামের জিহাদের মূল উদ্দেশ্য, যেমনটি বিখ্যাত সাহাবী রিব'ঈ ইবন 'আমর (রা.) পারস্য সেনাপতি রুস্তমকে বলেছিলেন।[১৬০]

---

[১৫৯] কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকহ, ২/৭৮৫

[১৬০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৭/৭৭

ইসলামি শরিয়াতের অনুমোদিত জিহাদে যুদ্ধবন্দিদের দাস বানানো যেতে পারে—এই একটি রাস্তা ইসলাম খোলা রেখেছে, তবে সেটিও শর্তসাপেক্ষে। জিহাদে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থ ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা নিম্নের ৪টি সিদ্ধান্তের যেকোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন:

(১) অনুগ্রহ করে সব বন্দিকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া;[১৬১] যেমনটি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিন করেছিলেন। সেদিন সমস্ত ক্ষমতা, প্রতাপ, আধিপত্য মুসলিমদের হাতে থাকা সত্ত্বেও আরব ভূখণ্ডে ইসলাম পূর্ণতা পেলেও, মুসলিমদের পরিপূর্ণ বিজয়ের দিন, যেদিন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্যাথার দগদগে স্মৃতিগুলোর প্রতিশোধ না নিয়েই সমস্ত কাফিরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। ইসলাম ছাড়া আর কোথায় পাবেন এমন আদর্শ?

(২) মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া;[১৬২] যেমনটি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বদরের যুদ্ধের সময় করেছিলেন।

(৩) তাদের হত্যা করা। এ সম্পর্কিত সুরা আনফালের আয়াতটি[১৬৩] নাযিল হয়েছিল বদর যুদ্ধের সময়ে, যেখানে বন্দিদের হত্যা না করে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দিয়ে দেয়ার জন্য মুসলিমদের তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ বদর যুদ্ধ মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ ও অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলিমগণ আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় লাভ করেছিলেন। সেই সময়ে বদর যুদ্ধের অবাধ্য কাফিরদের শুধু মুক্তিপণ নিয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে আবার ষড়যন্ত্র করে ইসলামের দাওয়াতে বাধা সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়াটা কখনোই সুদক্ষ রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হতে পারে না। তাই আল্লাহ মুসলিমদের এহেন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ায় তাদের তিরস্কার করে সাবধান করে দিয়েছিলেন, যাতে প্রয়োজনের

---

[১৬১] আল কুরআন, সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪

[১৬২] আল কুরআন, সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৪

[১৬৩] আল কুরআন, সুরা আনফাল, ৮ : ৬৭

সময় দ্বীনের স্বার্থে মুসলিমরা কখনোই কঠোর হতে ভুলে না যায় এবং অবাধ্য কাফিরদের যাতে উপযুক্ত সাজা দেয়। তবে বার বার চুক্তি ভঙ্গ করে বিভিন্নভাবে মুসলিমদের কষ্ট দেয়া অবাধ্য ইহুদি কাফিরদেরকে গাযওয়ায়ে বানু কুরাইযাতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বন্দি করে হত্যা করেছিলেন।[১৬৪] তবে তা-ও শুধু দ্বীনের স্বার্থে।

(৪) তাদের দাস বানিয়ে রাখা;

ওপরের প্রথম তিনটি উপায়ের একটিও যদি মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থের উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য না হয়ে থাকে, তবে মুসলিম খলিফা চাইলে যুদ্ধবন্দিদের দাস বানিয়ে রাখতে পারেন। তাদের যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তাদের হক আদায় করে দাস হিসেবে রাখা যেতে পারে।

তো উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, শরীয়তসম্মত জিহাদে খলিফা চাইলে বন্দিদের ব্যাপারে পরিস্থিতি মোতাবেক উপর্যুক্ত ৪টি সিদ্ধান্তের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন। তবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ১ ও ২ নং এর যেকোনো একটি গ্রহণই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। ইসলাম কখনোই শত্রুদের রক্তপিপাসু না যে, পেলো আর মেরে গেলো। তবে দ্বীনের দাওয়াতে বাধাদানকারীদের ব্যাপারে দয়ার কোনো সুযোগও নেই। আর ৩টির একটিও যদি উপযোগী না হয়, তবে খলিফা চাইলে যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস বানিয়ে রাখতে পারেন।

এতে করে যা হবে :

(ক) যুদ্ধবন্দি যদি এমন হয় যে সে ফিরে গেলে পুনরায় মুসলিম উম্মাহর ও ইসলামের ক্ষতি করতে পারে বা ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাহলে তার ক্ষতি থেকে মুসলিমরা বেঁচে যাবে। এতে দ্বীনের দাওয়াত প্রসারিত হবে।

---

[১৬৪] আর রাহিকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে বানু কুরাইযাহ দ্রষ্টব্য

(খ) তাদের কারাগারে নিক্ষেপ না করে দাস বানিয়ে রাখা অধিক যুক্তিসম্মত, কেননা কারাগারে রেখে দিলে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আরও কিছু কর্মচারীর প্রয়োজন পড়তো। এতে করে নব্য ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর একটি অর্থনৈতিক চাপ পড়ে যেতো।

(গ) দাস বানিয়ে রাখলে কারাগারে নিক্ষেপ থেকে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব। এতে করে মনিবের প্রতি ক্রোধ বা আক্রোশ কম হবে। তাছাড়া মনিব যদি দাসের সাথে বিনয়ী, কোমল ও দয়ার্দ্র আচরণ করে তাহলে সেই ক্রোধ বা আক্রোশের আশঙ্কা অনেক কমে শূন্যের পর্যায়ে চলে আসবে।[১৬৫]

(ঘ) সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো, মুসলিমদের সাথে বসবাস করতে করতে যদি কেউ ইসলামের সুমহান আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয় আর আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে অনন্তকালের জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়, এর থেকে বড় সৌভাগ্যের ও মর্যাদার আর কিছুই হতে পারে না।

(ঙ) আর যদি তা না-ও হয়, তবুও দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দাস-দাসী মনিবের সাথে মুকাতাবাত বা লিখিত চুক্তি করে নিতে পারে। মনিব এতে কল্যাণ দেখতে পেলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে নিলে, সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলাম তাহলে কেন অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির মতো এই দাসপ্রথাকে চিরবিলুপ্ত করে দেয়নি?

পূর্বেই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ইসলামের আগমনই এমন সময় হয়েছে যখন দাসপ্রথার দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানের মতো ছিল না। দাসপ্রথার ওপর তখন অর্থনীতির ভিত্তি অনেকাংশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর শিকড় বিদ্যমান ছিল, আর তা ছিল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। তাই ইসলাম সেই সময়ে দাসপ্রথাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেনি। এতে করে পুরো সমাজব্যবস্থাই মুখ থুবড়ে পড়তো, যা ইসলামি দাওয়াত প্রসারের পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ

---

[১৬৫] আশরাফুল জাওয়াব, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃ : ৩১-৩৪

দেখা দিতে পারতো। তাই ইসলাম দাসপ্রথাকে পরিপূর্ণভাবে বাতিল না করে দিয়ে এর সমাধানের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে।

তাছাড়া ইসলামে জিহাদ যেহেতু চলমান প্রক্রিয়া, তাই সুদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যুদ্ধবন্দিদের দাসপ্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করেনি যাতে কাফিরদের মোকাবেলায় যুদ্ধনীতি বা রাজনৈতিক নীতিতে ইসলামে কোনো স্থবিরতা না থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন আর আমরা খুবই কম জানি।

ইসলাম কেন যুদ্ধবন্দিনী দাসীদের সাথে শারীরিক সম্পর্ককে বৈধ করেছে?

ইসলামকে আঘাত করার ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য কম্যুনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, নাস্তিক-মুক্তমনা, খ্রিষ্টান মিশনারি তথা ইসলামবিদ্বেষীদের অনেক মুখরোচক একটি অভিযোগ নিয়ে এখন আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আর তা হলো, ইসলাম কেন যুদ্ধবন্দিনী দাসীদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা বৈধ করেছে।

ইসলামের এই ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার পূর্বে এর ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। প্রাচীন গ্রিসে নারীদের সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হতো, আর যুদ্ধবন্দি নারীদের ধর্ষণ করা ছিল, "সামাজিকভাবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য যুদ্ধনীতি।"[১৬৬] রোম, গ্রিস ছাড়া অন্যান্য স্থানে নারীদের সাথে এর থেকে ভালো ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায় না। যেখানে যুদ্ধের পরে একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল ধর্ষণ, যেখানে দাসীরা ছিল সমাজের সবচেয়ে নীচু পর্যায়ের, তাদের সাথে যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করা যেতো, যেখানে তারা ছিল পুরুষের যৌনভোগের সস্তা বস্তু। তারা ছিল অবজ্ঞা-অবহেলার পাত্র। যার সামান্য বর্ণনা দিতে গেলেও পৃথক গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন।

---

[১৬৬] https://en.wikipedia.org/wiki/Wartime_sexual_violence

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, দীর্ঘদিনের সামাজিক ব্যাধি দাসপ্রথাকে ইসলাম পরিশীলিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। একদিকে যেমন শরীয়তসম্মত জিহাদের মাধ্যমে কাউকে দাস বানানোর (*Enslaving*) এই একটিমাত্র পথই ইসলাম খোলা রেখেছে, অন্যদিকে এর বিপরীতে দাসমুক্তির বেশ কিছু বাস্তবভিত্তিক ও যুগোপযোগী পথ উন্মোচন করেছে। আর তাই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হওয়ার কারণে সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসা দাসীদের সাথে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনতাকে বন্ধ করতে এবং পাশাপাশি দাসীদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য শুধু বৈধভাবে মালিকানায় প্রাপ্ত দাসীর সাথে শারীরিক সম্পর্ককে বৈধ করেছে।

দাসীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক আল্লাহ বৈধ করেছেন, যা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- সুরা নিসা'র আয়াত ২৪, সুরা মুমিনুনের আয়াত ৬, সুরা আহযাবের আয়াত ৫০, সুরা মা'আরিজের আয়াত ৩০।

আচ্ছা, তাহলে একজন কীভাবে কোনো দাসীর পরিপূর্ণ মালিকানা লাভ করতে পারে? তা দুটি উপায়ে :

১। নিজে কাফিরদের বিপক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিজের গনিমতের অংশ থেকে যদি কোন দাসী লাভ করে থাকে;

২। যিনি শার'ঈভাবে দাসীর মালিক, তার কাছ থেকে দাসীকে ক্রয় করে থাকে;

আর এখানে কিছু ব্যাপার লক্ষণীয়। তা হলো,

ক) উপর্যুক্ত দুই উপায় ছাড়া আর কোনোভাবেই দাসীর মালিকানা পাওয়া যায় না। তাই এই দুটি পন্থা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কেউ যদি চাকরানির সঙ্গে বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে উপপত্নীরূপে কারও সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে তা হারাম ও ব্যভিচার বলে গণ্য হবে;[১৬৭]

---

[১৬৭] https://islamqa.info/en/26067

খ) শার'ঈ জিহাদ যেহেতু শুধু কাফিরদের বিপক্ষে লড়া যায়, তাই মুসলিমদের দুই পক্ষের মধ্যকার রাজনীতি, ভাষা, অত্যাচার, নিপীড়ন, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির কারণে সংঘটিত যুদ্ধকে জিহাদের নাম দিয়ে সেখানে মুসলিম নারীদেরকে দাসী বানানো হারাম হবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অবশ্যই ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের মা-বোনদের সাথে যা করেছে তা স্পষ্ট ধর্ষণ ও যিনা। একে গনিমত বলার কোনোই ভিত্তি নেই। অনেক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী মুখোশের অন্তরালের ইসলামবিদ্বেষীরা ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাংলাদেশের মা-বোনের সাথে আচরণকে পুঁজি করে ইসলামকে কটাক্ষ করে থাকে, যা ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতাকে প্রমাণ করে;

গ) দাসীর সাথে এমন সম্পর্ক করা ইসলামই প্রথম শুরু করেনি বরং ইসলাম পূর্বেকার এই সম্পর্কিত যাবতীয় ঘৃণ্যতা ও বল্গাহীন পাশবিকতাকে বন্ধ করে দিয়ে একে নিয়ন্ত্রিত ও মানবিক করেছে;

ঘ) দাসীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা ইসলামের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বরং তা বৈধ;

দাসী মিলনের ব্যাপারে দৃষ্টিকোণ:

(১) নিজের গনিমতের অংশ হওয়া:

ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফা যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দেয়া হবে না, এমনকি মুক্তিপণের বিনিময়েও নয়, তাহলে মুজাহিদিন (যারা জিহাদে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন) যদি গনিমতের মাল হিসেবে দাসী তার নির্দিষ্ট অংশে (হিসসা) পেয়ে থাকেন, তাহলেই শুধু দাসী হালাল হবে; অন্যথায় নয়। আর গনিমত বণ্টন হওয়ার পূর্বে কোনোমতেই গনিমত থেকে কিছু নেয়া যাবে না।

সূচীপত্র

এটাই সাধারণ নিয়ম।[১৬৮] আর গনিমতের মাল বণ্টনের পূর্বে কিছু নেয়ার ব্যাপারে হাদিসে কঠিন নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হাদিসের ভাষ্যমতে, যে এমনটি করবে সে রাসুলুল্লাহর (ﷺ) উম্মাত বলে পরিগণিত হবে না বলে কড়া তিরস্কার আছে।[১৬৯] আর তাই যেহেতু গনিমত বণ্টনের পূর্বে কোনোমতেই গনিমত থেকে কিছু নেয়া যাবে না, তাই দাসীর সাথে মিলিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আর কেউ এমনটি করলে তা যিনা বলে বিবেচিত হবে এবং সে অবশ্যই রজমের যোগ্য হয়ে যাবে।

যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে যে,

খালিদ (রা.) যিরার ইবনুল আহওয়াজকে পাঠালেন। তাঁরা বনী আসাদকে আক্রমণ করেন। সেখানে এক সুন্দরী নারীকে তাঁরা বন্দি করলে তিনি বণ্টন হওয়ার পূর্বেই তাকে তার সঙ্গীদের নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে তার সাথে মিলিত হলেন। পরে তিনি অনুতপ্ত বোধ করে খালিদ (রা.) এর নিকট গিয়ে বললে খালিদ (রা.) উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) নিকট লিখে জানান। উমার বলেন, যিরার রজমের যোগ্য (যেহেতু তিনি গনিমতের মাল বণ্টনের পূর্বেই নিজের ইচ্ছামতো নারীকে বেছে নিয়ে মিলিত হয়েছেন), পরবর্তীতে রজম করার পূর্বেই যিরার ইবনুল আহওয়াজ মারা যান।[১৭০]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, গনিমত বণ্টনের পূর্বে কোনোমতেই দাসীদের স্পর্শও করা যাবে না। এই হাদিসটি অভিযোগকারীদের মুখে চপেটাঘাত। কারণ তারা অনেকে প্রোপাগান্ডা ছড়ায় মুসলিমরা নাকি যুদ্ধক্ষেত্রেই নারীদের ধর্ষণ করে! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

(২) গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিনীর সাথে মিলিত হওয়া যাবে না:

---

[১৬৮] তিরমিযি, হা নং : ১৫৬৩ এবং ১৬০০, শায়খ আলবানির মতে সনদ সহীহ

[১৬৯] তিরমিযি হা নং : ১৬০১, সনদ সহীহ

[১৭০] আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), পৃ: ১৭৭, হা নং : ১৮২২২, হাদিসটি হারুন ইবনুল আসিম নামক রাবির কারণে দুর্বল।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, *“কোনো গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে সন্তান প্রসবের পূর্বে ও কোনো নারীর সাথে হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পূর্বে মিলিত হবে না।”* এই বিষয়ে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত আছে।[১৭১]

(৩) বন্দিনী যদি গর্ভবতী না হয় তবে এক ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে:

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, *“কোনো গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে সন্তান প্রসবের পূর্বে এবং অন্য নারীর (বন্দিনী) সাথে এক হায়েজ হতে পবিত্র হওয়ার পূর্বে মিলিত হবে না।”*[১৭২] এই বিষয়ে অন্যান্য হাদিসও বর্ণিত হয়েছে।[১৭৩]

(৪) দুই ক্রীতদাসী বোনের সাথে একত্রে মিলিত হওয়া যাবে না:

সাহাবী উসমান ইবন আফফান (রা.), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.), অন্যান্য সাহাবী এবং ইমাম মালিক (র) এর মতে, দুই ক্রীতদাসী বোনের সাথে একত্রে (বোঝানো হচ্ছে, এক বোনের সাথে সম্পর্ক থাকাকালীন অন্য বোনের সাথে) সম্পর্ক রাখা যাবে না।[১৭৪] উমার (রা.) এর মতে, মা এবং কন্যার সাথেও একই সময়ে মিলিত হওয়া যাবে না।[১৭৫]

(৫) দাসী শুধুই তার মালিকের জন্য:

ইসলামে দাসী নারীকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হয় না। যেখানে প্রাচীন গ্রিসে ও রোমে দাসী নারীকে মনে করা হতো জনগণের সম্পত্তি,

---

[১৭১] সহীহ মুসলিম, ইসে : ৫/৮৫, হা : ৩৪২৬; সুনান আবু দাউদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৩/১৬১, হা : ২১৫৩-৫৫, তিরমিযি, হা : ১৫৬৪

[১৭২] সুনান আবু দাউদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩/১৬১, হা : ২১৫৪

[১৭৩] ঐ, হা : ২১৫৫-৫৬, তিরমিযি, ইবন হিব্বান।

[১৭৪] মুয়াত্তা মালিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ২/১৪৪-৪৫, রেওয়ায়েত : ৩৪-৩৫

[১৭৫] ঐ, রেওয়ায়েত : ৩৩

সেখানে ইসলাম শুধু মালিকের জন্যই দাসীকে বৈধ করেছে, আর কারও জন্য নয়। নিজের বাবার[১৭৬] বা এমনকি নিজের স্ত্রীর[১৭৭] দাসীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনও জায়েয নেই। যদি কেউ নিজ স্ত্রীর দাসীর সাথে সম্পর্ক করে আর তাতে স্ত্রীর সম্মতি থাকে, তবে পুরুষকে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি স্ত্রীর সম্মতি না থাকে, তবে তাকে যিনার দায়ে রজম করা হবে।

(৬) কৃতদাসীর বিয়ে দিয়ে দিলে সে মালিকের জন্য হারাম হয়ে যাবে:

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "*তোমাদের কেউ যদি পুরুষ দাসকে তার নারী দাসীর সাথে বিয়ে দেয়, তবে তার গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত হবে না।*"[১৭৮]

(৭) দাসীর বৈবাহিক সম্পর্ক:

কোনো মহিলাকে যদি স্বামীর পূর্বেই দারুল ইসলামে বন্দি করে নিয়ে আসা হয় এবং স্বামী যদি দারুল হারবে থেকে যায়, তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটবে। আর যদি স্বামী এবং স্ত্রীকে একত্রে বন্দি করা হয় (তবে স্বামীর পূর্বে স্ত্রীকে দারুল ইসলামে আনা যাবে না), তবে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকবে। যেমনটি ইমাম মুহাম্মাদ (র) বর্ণনা করেছেন তার আস-সিয়ারুস সাগির কিতাবে।[১৭৯] ইমাম সারাখসিও এমনটিই বলেন।[১৮০]

এখানে খুব মুখরোচক একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইসলাম কি বন্দিনীদের ধর্ষণ করার অনুমতি দেয়? কারণ একজন মেয়ে কীভাবে এমন কারও সাথে

---

[১৭৬] ঐ, ১/১৪৬-৪৭, রেওয়ায়েত : ৩৬-৩৮

[১৭৭] সুনান আবু দাউদ, হা : ৪৪৫৮-৫৯

[১৭৮] ঐ, হা : ৪১১৩

[১৭৯] কিতাবুস সিয়ারুস সাগীর (ইংরেজি অনুবাদ), অধ্যায় : ২, অনুচ্ছেদ : ৪৫, পৃ : ৫১

[১৮০] ঐ, ফুটনোট : ৪৬, পৃ : ৯৩

শারীরিক সম্পর্ক করতে রাজি হতে পারে, যে তার পরিবারের লোকদের হত্যা করেছে? সুতরাং মুসলিমরা নিশ্চয়ই তাদের ধর্ষণ করে (নাউযুবিল্লাহ)।

প্রথমত, তারা কোনো প্রমাণই দেখাতে পারবেন না যে, মুসলিম সৈন্যরা বন্দিনীদের ধর্ষণ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। কোনো প্রমাণই নয়। আর একজন মেয়ে কেন তার পরিবার-হন্তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে যাবেন এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এই অভিযোগকারীদের অনেকেই ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। জন ম্যাকক্লিনটক (মৃ-১৮৭০) লেখেন, *"Women who followed their father and husbands to the war put on their finest dresses and ornaments previous to an engagement, in the hope of finding favor in the eyes of their captors in case of a defeat.*[181]

"যে সকল নারীরা তাদের বাবা অথবা স্বামীদের সাথে যুদ্ধে যেতো তারা সবচেয়ে ভালো মানের পোশাক ও অলংকার পরিধান করতো যাতে বন্দি অবস্থায় বিজয়ীদের দয়া পাওয়া যায়।"

ম্যাথু বি শোয়ার্টজ লেখেন,

"The Book of Deuteronomy prescribes its own rules for the treatment of women captured in war [Deut 21:10-14]. Women have always followed armies to do the soldiers' laundry, to nurse the sick and wounded, and to serve as prostitutes.

They would often dress in such a way as to attract the soldiers who won the battle. The Bible recognizes the realities of the battle situation in its rules on how to treat female captives, though commentators disagree on some of the details.

The biblical Israelite went to battle as a messenger of God. Yet he could also, of course, be caught up in the raging tide of blood and violence. The Western mind associates prowess, whether military or athletic, with sexual success. The pretty girls crowd around the hero who scores the

---

[১৮১] John McClintock, James Strong, *"Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature"* [Harper & Brothers, 1894, p. 782

winning touchdown, not around the players of the losing team. And it is certainly true in war: the winning hero "attracts" the women."[১৮২]

"বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণে (বুক অফ ডিউট্রেনমি) (২১:১০-১৪) যেসব নারীরা যুদ্ধে বন্দি হয়েছে তাদের বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সঙ্গে যেতো তারা সাধারণত সৈন্যদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতো, অসুস্থ ও আঘাতপ্রাপ্ত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা করতো আর তাদের যৌন চাহিদা পূরণের জন্যে পতিতা হিসেবে কাজ করতো৷ তারা এমন কাপড় পরিধান করতো, যা বিজয়ী সৈন্যদের আকর্ষণ করবে...

যুদ্ধক্ষেত্রে সুন্দরী নারীরা পরাজিত সৈন্যদের নিকট নয় বরং বিজয়ী বীরদের নিকটই ভিড় জমাতো৷ আর এটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে চিরন্তন সত্য যে, বিজয়ী সৈন্যরাই নারীদের 'মন জয়' করে থাকে।"

স্যামুয়েল বার্ডার (মৃ. ১৮৩৬) লেখেন,

"It was customary among the ancients for the women, who accompanied their fathers or husbands to battle, to put on their finest dresses and ornaments previous to an engagement, in order to attract the notice of the conqueror, if taken prisoners."[১৮৩]

"এটি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল যে, যে সকল নারীরা তাদের বাবা অথবা স্বামীর সাথে রণক্ষেত্রে যেতো, তাদের সবচেয়ে উন্নতমানের কাপড় ও অলংকার পরিধান করানো হতো, যাতে বন্দি হলে বিজয়ী বন্দিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।" তাই বলা যায় যে, পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা মোটেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। এটা ইতিহাস দ্বারাই প্রমাণিত।

---

[১৮২] Matthew B. Schwartz, Kalman J. Kaplan, *"The Fruit of Her Hands: The Psychology of Biblical Women" Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007* , pp. 146-147

[১৮৩] Oriental Customs Or, an Illustration of the Sacred Scripture, Williams and Smith, London, 1807 vol.2 p.79, no. 753

দ্বিতীয়ত, আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি যে, বন্দিনীদেরকে ইদ্দত পালনের বা হায়েজ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সময় দেয়া আবশ্যক। এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিধান লক্ষ করা যায়, এই সময় দেয়াটা বন্দিনীদেরকে তাদের নতুন ইসলামি পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্য সহায়তা করে থাকে যেমনটি মোল্লা আলী কারি (র) বলেছেন।[১৮৪] এতে করে তারা নতুন ইসলামিক পরিবেশের সাথে পরিচিত হতে পারে, ইসলাম সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারে। ইসলাম সম্পর্কে জানার পরে তার ভুল ভাঙতে পারে ও তাদের পরিবার হন্তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনেও রাজি হতে পারে।

চতুর্থত, বন্দিনীরা দেখবে যে, তারা এমন কিছু মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছে যারা একেবারে আলাদা আর অনন্য, অসাধারণ। যারা বিশ্বমানবতাকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান করে। যারা সকলকে আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের দিকে আহ্বান করে। যাদের নিকট তাদের নবীর (ﷺ) কথা সর্বোচ্চে ও সর্ব ঊর্ধ্বে। যাদের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই জীবনের এক ও একমাত্র লক্ষ্য। যারা সেই মহান অধিপতির জন্য জীবন দেয়াকে জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসে। যাদের কাছে এই দুনিয়ার ধনসম্পদ, নারী, বাড়ি, সুদৃশ্য বাহন তুচ্ছ। মানুষ যখন ঘুমে বিভোর, দিনের বেলায় রোযা রাখা ওই জিহাদের ময়দানের বীর সেনানী তখন আরামের শয্যা ত্যাগ করে মহান সেই সত্তার কাছে সিজদায় অবনত হয়, নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চায়। তারা দেখবে তাদের নেতা খেজুর পাতার ওপরেই আরামসে ঘুম দেয়। তারা প্রত্যক্ষ করবে তারা দাসকে রুটি দিয়ে নিজেরা সন্তুষ্টির সাথে খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করে। নিজেরা তা-ই খায়, যা দাস-দাসীরা খায়। তারা তা-ই পরিধান করে, যা দাস-দাসীরা পরিধান করে। যাদের রাষ্ট্রনায়ক নিজে উটের রশি ধরে দাসকে উটের পিঠে বসায়। তারা যখন ইসলামের সৌন্দর্য ও স্বরূপ, ন্যায়বিচার, ক্ষমাপরায়ণতা দেখতে পাবে, তখন তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে রাজি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

[১৮৪] মিরকাতুল মাফাতীহ (দারুল ফিকর), ৫/২১৮৯

দাসীর সাথে সম্পর্কের লুক্কায়িত হিকমাহ ও যৌক্তিকতা :

তার আগে আমরা একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকাই। পূর্বে, দাসীর বিয়ের পরেও দাসী মালিকের চাহিদা মেটাতে বাধ্য ছিল। তাদের সম্পর্কের কারণে জন্ম নেয়া বাচ্চার পিতৃত্বও তারা স্বীকার করতো না।[১৮৫] দাসীর সন্তানও দাস হিসেবেই বিবেচিত হতো। আর পিতৃত্ব স্বীকার করতো না। এবং তাদের এই অমানবিক কাজকে প্রশাসনও সমর্থন করতো[১৮৬] ইহুদি সমাজে দাসীদেরকে পরিবারের ভেতরেই অথবা বাহিরে পতিতা হিসেবে ব্যবহার করা সাধারণ ব্যাপার বলে গণ্য করা হতো।[১৮৭] রোমান সমাজে বড় বড় ব্যবসায়ীদের দাসীদেরকে জোর করে পতিতা বানিয়ে রাখা হতো অন্য পুরুষের খায়েশ পূরণের জন্যে।[১৮৮]

আসুন ইসলামের দিকে ফিরে আসি। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ইসলামের দাসপ্রথার ভিত্তি কী এবং এখন পর্যন্ত দাসপ্রথাকে কেন ইসলাম বৈধ করেছে, এই বৈধতার সীমাই বা কতটুকু। এই পর্বে আরও আলোচনা করা হয়েছে ইসলামে দাসীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের ভিত্তি ও সীমা। এর যৌক্তিকতা ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও হিকমাহগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

(১) যুদ্ধ প্রাচীনকাল থেকেই মানবসমাজের অন্যতম ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সত্য এটাই যে, কখনও কখনও যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে, যার ব্যতিক্রম আজকের এই অতি আধুনিক সভ্যতাতেও দেখা যায় না। যুদ্ধে পুরুষদের মৃত্যু বা বন্দিত্বের পর নারীরা এক বিপজ্জনক বস্তুতে পরিণত হয়। ইতিহাস ঘাঁটলে এ

---

[১৮৫] https://www.bowdoin.edu/~prael/projects/gsonnen/page4.html

[১৮৬] http://www.womenintheancientworld.com/women%20and%20slavery%20in%20ancient%20rome.htm

[১৮৭] The Cambridge World History of Slavery, vol.1, (Cambridge University press) The ancient Meddeterrean World, pg-445

[১৮৮] *Roman Social-Sexual Interactions, A critical Examination of the Limitations of Roman Sexuality*, (University of Colorado, Undergraduate Honors Theses), pg-72

রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া সম্ভব, যেখানে বিজয়ীরা বিজিতদের নারীদের সাথে পাশবিক আচরণ করেছে। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ইত্যাদি ছিল বিজয়ীদের জন্যে এক অতি স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য আচরণ। বিজিত নারীদের সম্মান বা অধিকার বলতে কিছুই থাকত না। তারা হয় গণধর্ষণের শিকার হতো, না হয় জোর করে তাদের পতিতাবৃত্তিতে নামানো হতো। তাদের সুষ্ঠু জীবন, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার ছিল না কোনো নিশ্চয়তা। আমাদের মানতে হয়তো কষ্ট হতে পারে, কিন্তু একথা বর্তমান যুগের ক্ষেত্রেও সত্য। এ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই। আফগানিস্তান আর ইরাকে অ্যামেরিকান আর্মি, পশ্চিম তীর ও গাযায় ইসরাইলি আর্মি, কাশ্মীরে ভারতীয় আর্মি, ৭১-এ পাকিস্তানি আর্মি, বসনিয়াতে সার্ব আর্মি, কিংবা আরাকানে বার্মিজ আর্মির আচরণের মাধ্যমে বার বার এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ রকম উদাহরণের লিস্ট অনেক, অনেক লম্বা। এমনকি মানবতার কথিত ধারক-বাহক জাতিসংঘের অধীনস্থ শান্তিরক্ষা বাহিনীও হাইতি, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রসহ বিভিন্ন জায়গায় নারীদের ব্যাপকভাবে ধর্ষণ করেছে।[১৮৯,১৯০]

দুর্বলের প্রতি অস্ত্রধারী সবলের আচরণের এই ডায়নামিক্সকে আমরা তত্ত্বকথা বা গালভরা উচ্চাঙ্গের বুলি আওড়ে যতোই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি না কেন, এটাই অপ্রিয়, তিক্ত সত্য। মানবজাতির স্রষ্টা মানুষের এ দিকটির কথা জানেন বলেই এর একটি বাস্তবসম্মত সমাধান দিয়েছেন। বিজয়ীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও বন্দিনীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য, তাদের যেন রাস্তার কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর মতো গণ্য না করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, গনিমত বণ্টনের পর সবাইকে নির্দিষ্ট মালিকের অধীনে দেয়ার নিয়ম দিয়েছেন। এতে করে সেই নারীরা পায় যথাযথ অধিকার, মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা। এভাবে আল্লাহ মুসলিমদের পূর্বকাল থেকে চলে আসা এই মানবচরিত্রের এ অমানবিক পাশবিকতা ও নোংরামি থেকে বাঁচিয়েছেন।

---

[১৮৯] http://www.ibtimes.co.uk/central-african-republic-un-peacekeeping-accused-bestiality-sex-abuse-against-women-1552411

[১৯০] http://www.ibtimes.co.uk/un-peacekeeping-allegations-sexual-exploitation-abuse-20-year-history-shame-1547581

(২) পূর্বে দাসীদেরকে যে কেউই ব্যবহার করতে পারতো। এমনকি একই পরিবারের অনেক সদস্য তাদের ভোগ করতে পারতো। তবে ইসলাম শুধু মালিকের জন্যই দাসী-সম্ভোগ বৈধ করেছে। এতে প্রাচীনকালে যেমন যুদ্ধ শেষে নারীদেরকে ধর্ষণ করা হতো বা তাদের বিভিন্ন অনৈতিক কাজে বাধ্য করা হতো, ইসলাম সেই সুযোগকে নির্মূল করে দিয়েছে।

ইসলামে বৈধভাবে মালিকানাপ্রাপ্ত মালিকের সাথে দাসীর শারীরিক সম্পর্কের সুযোগ রেখে নারীকে বেইজ্জতি থেকে বাঁচিয়েছে, তাদের সম্মানিত করেছে, তাদের নতুন একটি পরিবার দিয়েছে, তাদের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিয়েছে;

(৩) মালিক ও দাসীর সম্পর্ক অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে। যাতে লোকমনে তাদের দুইজনের ব্যাপারে কোনোপ্রকার সন্দেহ ও সংশয় না থাকে। এতে করে নারীটি পায় যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা;

(৪) এর ফলে দাসীটির শারীরিক চাহিদা পূরণের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়। এতে একদিকে দাসীটির স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ হয়, অন্যদিকে দাসীটি চাহিদা পূরণ না করতে পেরে অবৈধ কোনো পন্থা বেছে নেয়ার শঙ্কাও দূরীভূত হয়। এতে রাষ্ট্রে চারিত্রিক পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে;

(৫) মালিকের জন্য দাসীকে বিয়ে করা জায়েয।[১৯১] যেমন হাদিসে এসেছে, *“যে ব্যক্তি দাসীকে উত্তমরূপে লালন-পালন, প্রতিপালন করে, তার প্রতি ইহসান করে, তাকে মুক্ত করে বিবাহ করে, তার জন্যে আছে দ্বিগুণ সওয়াব;”* [১৯২]

(৬) দাসীকে কোনোমতেই অন্য পুরুষের সাথে যৌনাচার করতে বাধ্য করা যাবে না, যেমনটা রোমান সমাজে প্রচলন ছিল;

(৭) দাসীকে অন্ন-বস্ত্রের নিশ্চয়তা দিতে হবে, সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে;

---

[১৯১] সুরা নিসা, ২৫

[১৯২] সহীহ বুখারি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হা : ২৩৭৬, ২৩৭৯

(৮) দাসী যদি উম্মুল ওয়ালাদ (ওই মালিকের সন্তানের জননী) হয়, তবে ওই দাসী বিক্রি হারাম হয়ে যাবে। হাদিসে এসেছে, “*তোমরা উম্মুল ওয়ালাদ বিক্রি করো না।*”[১৯৩] আর ওই দাসী মালিকের মৃত্যুর পরে মুক্ত হয়ে যাবে।[১৯৪] এতে যেমন দাসীর মুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে, তেমনই সন্তানের পিতৃপরিচয়ের নিশ্চয়তা আছে। আর সন্তানও মুক্ত বলে বিবেচিত হবে;

(৯) দাসীর জন্য এ সুযোগও রয়েছে সে মালিকের কাছে দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। দাসত্ব থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে;

(১০) সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এতে দাসী খুব কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে, বুঝতে, উপলব্ধি করতে পারে। এতে হয়তো সে ইসলাম গ্রহণ করে নিতে পারে, যা তার জন্যে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি আর চিরশান্তির জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারে;

কেন এত বিরোধিতা?

যারা ইসলামের দাসপ্রথা নিয়ে বিরোধিতা করেন, তাদের কাছে দাসপ্রথা অর্থই রোম আর গ্রিসের বর্বর আর অমানবিক ও পাশবিক এক সিস্টেম। যেখানে দাসদের নেই কোনো মর্যাদা, কোনো অধিকার, কোনো সুখ বা অনুভূতি। তবে তারা কি জানেন যে, ইসলাম এসব অভিযোগ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে?

তারা কি জানে যে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যে কথা বলছিলেন— (الصلاة الصلاة وما ملكات أيمانكم) “*সালাত!! সালাত!! তোমাদের দাস-দাসীগণ!!*”[১৯৫] ইসলামে একজন ক্রীতদাসও আমির বা শাসক হওয়ার

[১৯৩] সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ, ৫/৫৪০, হা : ২৪১৭

[১৯৪] আল-কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ড. আবু বকর জাকারিয়া, ১/৪০৬

[১৯৫] বুখারি

যোগ্যতা রাখেন।[১৯৬] এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা বিবেচিত হতো না। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) যখন কুফার বিচারপতি হিসেবে যান, তখন তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আম্মার ইবন ইয়াসির সেখানকার ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হন।[১৯৭] দাস যদি যথাযোগ্য হন, তবে তিনি ইমামতিও করতে পারেন।[১৯৮] আবু মায়সারা ইবন আবি খুসাইম আল-ফিহরির আযাদকৃত দাস ‘আতা ইবন আবি রাবাহ (র) মক্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেয়ি (যাঁরা সাহাবীগণকে (রা.) ঈমানের সাথে দেখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা করেছেন এবং ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের তাবেয়ি বলে) ছিলেন।[১৯৯] এছাড়াও আরও অনেক বিদগ্ধ তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িনই মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন।

এছাড়া ইসলামি শাসনে বিখ্যাত মামলুক সুলতানরা ছিলেন দাস। ইসলামের বিভিন্ন কীর্তিতে দাসদের অনেক বড় ভূমিকা আছে, যা অনস্বীকার্য। এর মূল কারণ হলো ইসলামি মূল্যবোধ, যা ঈমান ও তাকওয়ার মানদণ্ড ব্যতীত অন্য কোনো স্ট্যান্ডার্ডে মানুষকে দেখে না। কিন্তু কম্যুনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, নাস্তিক-মুক্তমনা, প্রাচ্যবিদ আর খ্রিষ্টান মিশনারিরা দাসপ্রথাকে দেখে সেই পশ্চিমাদের তৈরি করা চশমা দিয়ে, যার ভিত্তি হলো সেই অমানবিক গ্রিক-রোমান দাসব্যবস্থা, যার সাথে ইসলামের দাসব্যবস্থার মৌলিকতার দিক থেকে বিন্দু-বিসর্গও সাদৃশ্য নেই। তারা এখনো সেই কুসংস্কারপূর্ণ স্ট্যান্ডার্ডেই ইসলামকে মেপে থাকে, যাদের অধিকাংশই বিদ্বেষবশত কোনোপ্রকার জানা-শোনা ছাড়াই ইসলাম সম্পর্কে ঢিল ছুড়ে থাকে। আর এদের কেউ কেউ অতি সুপরিকল্পিতভাবেই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে।

---

[১৯৬] সহীহ মুসলিম, ইসে : ২/৪৪১, হা : ১৩৫২

[১৯৭] দাসপ্রথা ও ইসলাম, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃ : ৪৬

[১৯৮] http://seekershub.org/ans-blog/2009/06/17/can-an-illegitimate-son-lead-salat/

[১৯৯] তাবিঈদের জীবনকথা প্রথম খণ্ড, ড. মুহাম্মদ আবদুল মা’বুদ, পৃ : ১৩৯

যারা ইসলামের পোশাক পরে অন্তরে চরম বিদ্বেষ রেখে অতি সন্তর্পণে বিষদাঁত ঢুকিয়ে দেয়, এদের মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে প্রাচ্যবিদ (*Orientalists*), যারা রাসুলুল্লাহর (ﷺ) জীবনী লেখার ছলে তার পবিত্রতম জীবনে কালিমা লেপনের চেষ্টায় বিষবাষ্প ছড়িয়েছে। আর গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে হাল যুগের সর্বসাধারণের নিকটে সেসব রচনারই প্রচার-প্রসার ঘটানো হয়েছে। আর এর ফলে সন্তর্পণেই প্রাচ্যবিদদের স্ট্যান্ডার্ডে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র সীরাতকে মাপতে গিয়ে গোটা ইসলামকেই সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে। যার ফলাফল আজ আমাদের সামনে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সন্তান নাস্তিক-মুরতাদ ও ইসলামবিদ্বেষীরূপে বিদ্যমান। যদিও এদের কাছে বর্তমান যুগের নানা ছলে বলে কৌশলের দাসব্যবস্থা চোখে পড়ে না বা তারা নিজেরাই এর পৃষ্ঠপোষক। একটু দেখে নেয়া যাক :

আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে, সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ দাসপ্রথার শিকার হয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান *Walk Free Foundation* এর *The Global Slavery Index* ২০১৬ এর রিপোর্ট অনুযায়ী (যা ১৬৭টি দেশের ওপর চালানো হয়েছে), তাতে দেখা যায় ৪৫.৮ মিলিয়ন লোক বিভিন্নভাবে দাসত্বের শিকার হয়ে আছে।[২০০]

মানবপাচারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে পুরুষ, নারী, শিশুদেরকে নিয়ে আনা হয়। যার জন্য মানবপাচার বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সুসংগঠিত ও লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। *ILO (International Labor Organization)* এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মানবপাচার থেকে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থ উপার্জিত হয়।[২০১]

পাচারের পরবর্তী সময়ে তাদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয়। যেমন, জোরপূর্বক কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়, কখনো নারীদেরকে পতিতালয়ে কাজ করার জন্য বলপ্রয়োগ করা হয় বা যৌনদাসী/রক্ষিতারূপে রেখে দেয়া হয়,

---

[২০০] https://www.globalslaveryindex.org/findings/

[201] http://www.humanrightsfirst.org/resource/human-trafficking-numbers

কখনো বা অঙ্গহানি করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়। ২০১২ সালের *International Labor Organization* এর রিপোর্ট মতে, প্রায় ২০.৯ মিলিয়ন লোককে জোরপূর্বক কাজে (ফোর্সড লেবার) যুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৪.৫ মিলিয়নকে (২২%) যৌন নিপীড়ন, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি করানো হয়।[২০২] ১৫০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ৯৯ বিলিয়ন ডলারই সেক্সুয়াল এক্সপ্লোয়েটেশন খাত থেকে আসে!

অপরদিকে *UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)* এর ২০১১ এর রিপোর্ট মতে, পাচারকৃতদের মধ্যে প্রায় ৪৯%-ই হলো নারী।[২০৩] মোট পাচারককৃত নারীদের ৫৩%-ই যৌন হয়রানীর জন্য হয়ে থাকে।[২০৪] ২০১২ এর রিপোর্ট এর মতে, ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে।[২০৫]

এই ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থা দেখা নেয়া যাক—

যুক্তরাষ্ট্র

*The National Human Trafficking Resource Cen*ter এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার ২০১৬ সালের মানবপাচারের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো: সর্বমোট রিপোর্টেড কেসের সংখ্যা ৭৫৭২টি। যার মধ্যে ৬৩৪০ জনই নারী আর বাকি মাত্র ৯৭৮ জন পুরুষ। যার অধিকাংশই যৌন দাসত্বের জন্য হয়ে থাকে, যার সংখ্যা প্রায় ৫৫৫১টি।[২০৬]

---

[২০২] International Labour Organization, ILO global estimate of forced labour: results and methodology, 2012, p. 13

[২০৩] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons, 2014, p.29

[২০৪] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons, 2014, p.33

[২০৫] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons, 2012, p. 7

[২০৬] https://humantraffickinghotline.org/states

ব্রিটেন

National Referral Mechanism রিপোর্ট মতে, ২০১৫ সালে ব্রিটেনে ২৪৫% মানবপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে প্রায় ৩২৬৬ জন পাচারের শিকার হয়েছে যেখানে ২০১৪ ও ২০১১ সালে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩৪০ ও ৯৪৮ জন।[২০৭]

ভারত

বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের পাশের দেশ ভারতে লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশুরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। ভারতে নিজেদের রাজ্য থেকে তো বটেই, তাছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল, বার্মা, মধ্য এশিয়া এবং অন্যান্য স্থান থেকে ভারতে নারী ও শিশুদেরকে পাচার করা হয়ে থাকে।[২০৮]

The Ministry of Women and Child Development এর রিপোর্ট মতে, ২০১৬ সালে ১৯২২৩ জন নারী ও শিশু পাচার করা হয়েছে (এটা শুধু যতোটুকু রিপোর্ট করা হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেই পরিসংখ্যানকৃত। কারণ অধিকাংশই ভয়ে রিপোর্ট করে না) যেখানে ২০১৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৫৪৪৮ জন, এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বেশি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত মানবপাচারের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।[২০৯] ভারতের ছত্রিশগড়ে প্রতি বছর প্রায় ১,৩৫,০০০ শিশু নিখোঁজ হয়ে থাকে।[২১০] *National Crime Records Bureau (NCRB)* এর ২০১৩ এর রিপোর্ট মতে, ভারতে গত ৫ বছরে মানবপাচার সংক্রান্ত কেস প্রায় ৩৮.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে

---

[২০৭] (https://www.theguardian.com/law/2016/jul/10/modern-slavery-on-rise-in-uk) (http://ind.pn/2mZXslD)

[208] https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258784.htm

[209] http://timesofindia.indiatimes.com/india/almost-20000-women-children-trafficked-in-india-in-2016-govt-report/articleshow/57569145.cms

[210] https://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/28/child-trafficking-india-domestic-labour-chhattisgarh

এবং এখানে সর্বোচ্চ পাচার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই।[২১১] *Walk Free Foundation এর The Global Slavery Index* ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত শীর্ষে ছিল।[২১২]

ইসলামের দাসপ্রথার ব্যাপারে যারা প্রশ্ন তোলেন, তারা কি এইসব নব্য দাসব্যবস্থা দেখেন? এই অন্ধকার জগৎ সম্পর্কে তারা কিছু জানেন?? নাকি দেখেও না দেখার আর জেনেও না জানার ভান করেন? তথাকথিত মুক্তমনাদের তো এইগুলো নিয়ে তেমন সোচ্চার হতে দেখা যায় না। নাকি তাদের সকল আক্রমণের মূলে একমাত্র ইসলাম? তাও আবার নোংরা মিথ্যাচার দিয়ে!

যেই অন্ধকার জগতে হাজার হাজার নারী আটকা পড়েছে, যাদেরকে দিয়ে জোর করে পতিতাবৃত্তি করানো হচ্ছে, যৌনদাসী হিসেবে রেখে দিয়ে হাজার পুরুষ সানন্দে ভোগ করছে, তাছাড়া গ্লোবালি সকলের মোবাইলে মোবাইলে তাকে ভোগ করার জন্য আছে পর্নোগ্রাফি। এগুলো কি সেই পুরোনো দাসব্যবস্থার নয়া পোশাক নয়? এইসব ব্যাপারে তো কথিত মানবতাবাদীদের আনাগোনা নজরে পড়ে না! কেন?

প্রাচ্যবিদ, নাস্তিক-মুরতাদ, খ্রিষ্টান মিশনারিদের কলমে রাসুলুল্লাহর (ﷺ) যে চিত্র ভেসে ওঠে, তা নিজের হাতে লেখা আরবীয় উপকথাকে ওহীর নামে চালিয়ে দেয়া এক যুদ্ধপ্রিয়, রক্তপিপাসু, ক্ষমতালিপ্সু, যৌনতাপিপাসু, নৃশংস আর বর্বর এক লোক (তিনি (ﷺ) এইসব অভিযোগ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে)। হায় আফসোস তাদের জন্য যারা মিথ্যাচার করে এমন কারও ব্যাপারে, যিনি সেসব হতোভাগাদের দৃষ্টিতে নিজের বানানো কিতাবকে ওহী বলে চালিয়ে দিয়েছেন, সেই কিতাবের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কষ্টভোগ করে গেছেন কিন্তু সেই কিতাব ছাড়েননি, যিনি সারাটি জীবন কাটিয়ে দিলেন এমন

---

[২১১] http://indianexpress.com/article/india/india-others/the-numbers-story-a-human-trafficking-cases-rise-convictions-come-down/

[২১২] https://www.globalslaveryindex.org/findings/

ঘরে দাঁড়িয়েই যার ছাদের নাগাল পাওয়া যায়, যার পেট হয়তো কখনোই খাবার দ্বারা পূর্ণ হয়নি, যিনি মৃত্যুর সময় কিছুই রেখে যাননি!

হায়! পৃথিবী হয়তো এমন ক্ষমতালিপ্সু (!), রক্তপিপাসু (!) আর বর্বর (!) লোক দেখেনি কখনোই—যারা নিজেদের ইগো আর প্রবৃত্তিকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের কাছ থেকে এমনটি অস্বাভাবিক কি? না, মোটেই না!

নবী (ﷺ) এর ইসরা ও মিরাজ: ইসরার ঘটনার সত্যতা কতটুকু? মাসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) কি আসলেই সে সময়ে ছিল?

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর ইসরা(إسراء) ও মিরাজ (معراج) নিয়ে প্রশ্ন তোলে নাস্তিক-মুক্তমনা ও খ্রিষ্টান মিশনারিরা। তাদের বক্তব্য হচ্ছে—মুহাম্মাদ (ﷺ) ইসরা ও মিরাজের রাতে মক্কা থেকে জেরুজালেমের আল-আকসা মাসজিদ ভ্রমণ করার দাবি করেছেন। কিন্তু এটি আদৌ সম্ভব নয়, কারণ সেখানে তখন কোনো মাসজিদ বা অন্য কোনো উপাসনালয় ছিল না। তার বহু আগেই, ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস ইহুদিদের মহামন্দির *(Bet HaMikdash (Hebrew)/Temple Mount (English))* গুঁড়িয়ে দেয়।[২১৩] কাজেই ইসরা ও মিরাজের রাতে মহানবী (ﷺ) আকসা মাসজিদে যাবার যে দাবি করেছেন, তা মিথ্যা (নাউযুবিল্লাহ)।

চলুন দেখি, যুক্তি-প্রমাণ ও বিবেকের কষ্টিপাথরে, কার দাবি সত্য।

'মিরাজ' শব্দ এসেছে আরবি উরুজুন শব্দ থেকে। উরুজুন অর্থ সিঁড়ি আর মিরাজ অর্থ ঊর্ধ্বগমন। যেহেতু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা হয়, সেজন্য রাসুলের (ﷺ) ঊর্ধ্বগমনকে মিরাজ বলা হয়। 'ইসরা' মানে হলো রাতে পরিভ্রমণ করা।

---

[২১৩] https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Mount

পারিভাষিকভাবে এটি হলো রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালেমের মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ।

এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে [মুহাম্মাদ (ﷺ)] এক রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় [বাইতুল মুকাদ্দাস] যার চারপাশকে আমি করেছিলাম বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[২১৪]

প্রথমে আমরা জেনে নিই—ইসলামী পরিভাষায় 'মাসজিদ' কী। আরবি ভাষায় 'মাসজিদ' শব্দের মানে হচ্ছে 'সিজদা করার স্থান'। শব্দটি এসেছে 'সুজুদ' থেকে, যার মানে হচ্ছে 'সিজদা করা'। কাজেই মাসজিদকে কোনো বিশাল পিলার দ্বারা তৈরি ইসলামী শিল্পকর্মে ভরপুর স্থাপনা হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সীমানা দ্বারা ঘেরা যেকোনো ইবাদতের স্থানই মাসজিদ হতে পারে। আবার ছোট দেয়াল কিংবা পাথর দ্বারা তৈরি স্থাপনাও মাসজিদ হতে পারে। ওই এলাকাটিকে তাত্ত্বিকভাবে 'মাসজিদ' বা 'সিজদা করার স্থান' বলা যেতে পারে।

নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেন—

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورً اَو مَسْجِدًا وَ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَ خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

"পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের ওপর ছয়টি বিষয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। আমাকে দেয়া হয়েছে অল্প শব্দে অনেক বেশি অর্থবোধক কথা বলার যোগ্যতা, আমি অনেক দূর থেকে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ভয় সৃষ্টির মাধ্যমে বিজয়প্রাপ্ত হই।

---

[২১৪] আল-কুরআন, সুরা বনী ইসরাইল (ইসরা), ১৭ : ১

গনিমত তথা পরাজিত শত্রুবাহিনীর ফেলে যাওয়া সম্পদ আমার জন্যে বৈধ করা হয়েছে। ***আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং মাসজিদ বানানো হয়েছে।*** *সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য আমাকে নবী বানানো হয়েছে এবং আমার মাধ্যমেই নবী আগমনের ধারাকে সমাপ্ত করা হয়েছে।'*[২১৫]

মাসজিদুল হারাম; মক্কা, সৌদি আরব

হাদিস থেকে জানা গেলো যে, সমগ্র পৃথিবীই মসজিদের অন্তর্গত। শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল উসাইমিন (র) তার মাসজিদ ও নামাযঘর সংক্রান্ত এক ফতোয়ায় বলেছেন, *"সাধারণ অর্থ অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীই হচ্ছে মাসজিদ কারণ নবী (ﷺ) বলেছেন, "আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং মাসজিদ বানানো হয়েছে।" সুনির্দিষ্ট অর্থে, মাসজিদ হচ্ছে একটি*

---

[২১৫] সহীহ মুসলিম, হাদিস : ৭১২

সূচীপত্র

স্থান যেটিকে স্থায়ীভাবে সালাতের (নামাযের) জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং স্থায়ীভাবে বণ্টন করা হয়েছে, হোক সেটি পাথর, কাদা বা সিমেন্টে বানানো অথবা তা দ্বারা না বানানো। ...'[২১৬]

অতএব, মসজিদের জন্য স্থান হচ্ছে মুখ্য বিষয়। ছাদবিশিষ্ট ইমারত থাকুক বা না থাকুক, সেটি মুখ্য নয়। মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকসা এগুলো স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত স্থায়ী ইবাদতের জায়গা।

সূত্র : *https://goo.gl/431nZ2*

আবু যার গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন: মাসজিদুল হারাম। রাবি বলেন, আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন:

[২১৬] ফাতাওয়া শায়খ উসাইমিন : ১২/৩৯৪

তারপর মাসজিদুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন: চল্লিশ বছরের। ***এখন তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীই মাসজিদ। অতএব যেখানেই তোমার সালাতের ওয়াক্ত হয়, সেখানেই তুমি সালাত আদায় করতে পারো।***[২১৭]

হাদিস ও কুরআনে ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক নির্মিত হবার পূর্বে মাসজিদুল হারামের স্থানটিকেও 'আল্লাহর ঘর' বলে গণ্য করা হয়েছে। যদিও সেখানে তখন কোনো ইমারত ছিল না, ছাদবিশিষ্ট ঘর ছিল না। ইবরাহিম (আ.) কা'বা ঘর নির্মাণের বহু পূর্বেই সেই স্থানটিকে আল্লাহর সম্মানিত ঘর বলে অভিহিত করা হয়েছে *সুরা ইবরাহিমের ৩৭ নং আয়াতে।*

"... তারপর (আল্লাহর হুকুমে) ইবরাহিম (আ.) হাযেরা (আ.) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আ.)-কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হাযেরা (আ.) শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত, ইবরাহিম (আ.) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের ওপর অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নিচে তাদের রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ, না ছিল কোনোরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদের সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি।

এরপর ইবরাহিম (আ.) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আ.)-এর মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, "হে ইবরাহিম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদের এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোনো সাহায্যকারী আর না আছে (পানাহারের) ব্যবস্থা।" তিনি এ কথা তাঁকে

---

[২১৭] সুনান ইবন মাজাহ, হাদিস : ৭৫৩

সূচীপত্র

বার বার বললেন। কিন্তু ইবরাহিম (আ.) তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা (আ.) তাঁকে বললেন, "এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" হাযেরা (আ.) বললেন, "তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন।"

*আর ইবরাহিম (আ.)-ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, তখন কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে **আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট** এক অনুর্বর উপত্যকায় ....যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"*[২১৮]

ওই সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভাঙ্গন ধরেছিল। এরপর হাযেরা (আ.) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন...

*...যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেরূপ করে থাকে, তারা উভয়ে তা-ই করলেন। এরপর ইবরাহিম (আ.) বললেন, "হে ইসমাঈল, আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।" ইসমাঈল (আ.) বললেন, "আপনার প্রভু আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন।" **ইবরাহিম (আ.) বললেন, "আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।" এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন। এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে তখনই তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন।...***"[২১৯]

---

[২১৮] আল কুরআন, সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৩৭

[২১৯] সহীহ বুখারি, হাদিস : ৩৩৬৪

সব থেকে বড় কথা, যে আয়াতে (বনী ইসরাইল ১৭:১) মুহাম্মাদ (ﷺ) এর ইসরার কথা বলা আছে ও মাসজিদুল আকসার কথা এসেছে, ওই একই আয়াতে মাসজিদুল হারামের কথাও এসেছে।

"... যিনি নিজ বান্দাকে [মুহাম্মাদ (ﷺ)] এক রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় ..." [বনী ইসরাইল ১৭:১] এই আয়াতে মাসজিদুল হারামকে 'মাসজিদ' বলা হয়েছে অথচ এটিও তখন ছিল একটি খালি জায়গা, মাসজিদুল আকসার মতোই! সেখানে কা'বাঘর ছিল বটে, কিন্তু এর চারদিকে কোনো ছাদবিশিষ্ট 'মাসজিদ' ছিল না, বরং খালি জায়গা ছিল। সে সময়ে কা'বার খুব নিকটে মানুষজনের ঘরবাড়ি ছিল। মানুষজন কা'বার চারদিকে ওই খালি জায়গাতেই ইবাদত করতো এবং ওই খালি জায়গাকেই উক্ত আয়াতে 'মাসজিদ' বলা হয়েছে।

যেসব ছিদ্রান্বেষী ওই আয়াত দেখিয়ে বলতে চায় "খালি জায়গাকে কীভাবে আল-আকসা মাসজিদ বলা যেতে পারে?", তাদের এই তথ্যটি জেনে রাখা উচিত যে, মাসজিদুল হারামও "খালি জায়গা" ছিল এবং সিজদার ওই পবিত্র স্থানকেও আল্লাহ 'মাসজিদ' বলে অভিহিত করেছেন। ওই আয়াত থেকেই তাদের ভ্রান্ত দাবি খণ্ডন হয়ে যায়।

যে স্থানে সুলাইমান (আ.) এর মাসজিদ [ইহুদিদের পরিভাষায়: বাইত হা মিকদাশ, খ্রিষ্টানদের পরিভাষায়: মহামন্দির বা *Temple Mount*] ছিল এবং নবী-রাসুলদের অনুসারী ইহুদিরা উপাসনার জন্য জড়ো হতো, সেই এক সীমানার মধ্যেই বর্তমান আল-আকসা মাসজিদ স্থাপন করা হয়েছে। আর হুবহু সেই জায়গাটির ওপর স্থাপন করা হয়েছে সোনালি গম্বুজের 'কুব্বাতুস সাখরা' (*Dome of Rock*) মাসজিদটি।

কুব্বাতুস সাখরা মাসজিদ স্থাপন করা হয়েছে বনী ইসরাইলের কিবলাহ পাথরের ওপর। আর সীমানাদেয়াল দ্বারা ঘেরা পুরো এলাকাটিই মুসলিমদের কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস/বাইতুল মাকদিস/আল-আকসা/হারাম আশ-শারিফ। মক্কার মাসজিদুল হারাম যেমন একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে অবস্থিত, একই

ভাবে আল আকসাও একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে অবস্থিত। এই এলাকার মধ্যে সব জায়গাই 'মাসজিদ' বলে বিবেচিত হয়।
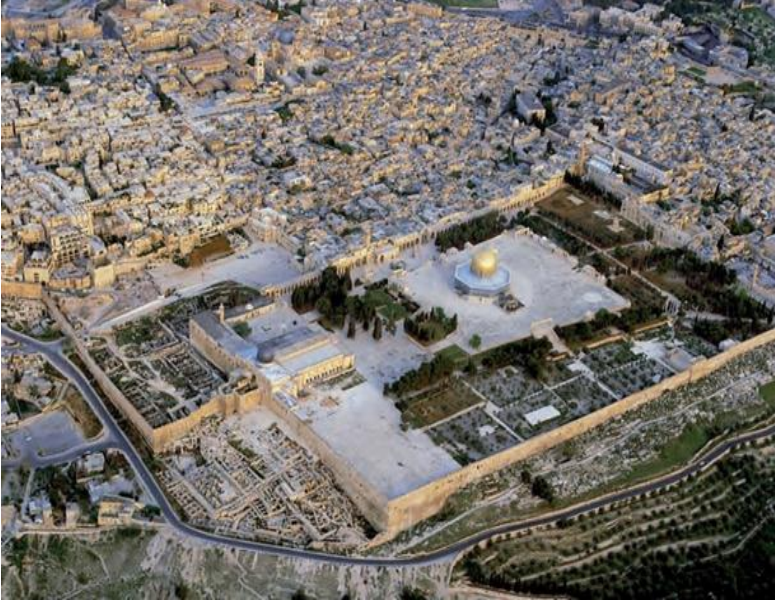
মাসজিদ আল-আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস); জেরুজালেম, ফিলিস্তিন

আগেই বলা হয়েছে যে—'মাসজিদ' মূলত সিজদা করবার স্থান। 'মাসজিদ' হবার জন্য কোনো ইমারত থাকা জরুরি নয়। আল-আকসায় সে সময়ে কোনো ইমারত না থাকলেও সীমানাসহ জায়গাটি চিহ্নিত ছিল। মুহাম্মাদ (ﷺ) ইসরার রাতে জেরুজালেমের সে স্থানে গিয়েছিলেন। কাজেই তিনি সেদিন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় গিয়েছেন—এ দাবির মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে কোনোই ভুল নেই বা মিথ্যা নেই। এমনকি কুরআন ও হাদিসের পরিভাষার সাথেও তা কোনোক্রমেই সাংঘর্ষিক নয়। বিরোধীরা এরপরেও দাবি করতে চায়—মুহাম্মাদ (ﷺ) আল আকসায় গমন বলতে শুধু ওই স্থানটিতে

যাওয়া বোঝাননি বরং তিনি ইমারতবিশিষ্ট একটি মাসজিদের কথাই বলেছেন। এর স্বপক্ষে তারা নিম্নোক্ত দলিলগুলো ব্যবহার করে—

*রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমি হাজরে আসওয়াদের কাছে ছিলাম। এ সময় কুরাইশরা আমাকে আমার মিরাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে। তারা আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, যা আমি ভালোভাবে দেখিনি। ফলে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম।" রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, **"তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার সম্মুখে বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন এবং আমি তা দেখছিলাম।** তারা আমাকে যে প্রশ্ন করছিল, তার জবাব দিতে লাগলাম। ..."*[২২০]

*"আমি হিজরে দাঁড়ালাম, বাইতুল মাকদিস দেখতে পেলাম এবং এর নিদর্শনগুলো বর্ণনা করলাম। **তাদের মধ্যে কেউ কেউ জানতে চাইলো, ওই মাসজিদে কতগুলো দরজা আছে? আমি (আগে) সেগুলো গুণিনি। কাজেই আমি এর দিকে তাকালাম এবং এক এক করে গুণলাম** এবং এগুলোর তথ্য তাদের দিলাম।"*[২২১]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমার জন্য বুরাক পাঠানো হলো। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু। যতোদূর দৃষ্টি যায়, এক এক পদক্ষেপে সে ততোদূর চলে।" রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমি এতে আরোহণ করলাম এবং বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। তারপর অন্যান্য নবীগণ তাঁদের বাহনগুলো যে রজ্জুতে বাঁধতেন, আমি সে রজ্জুতে

---

[২২০] সহীহ মুসলিম, খণ্ড : ১, কিতাবুল ঈমান, হাদিস : ৩২৮

[২২১] আত-তাবাকাত আল-কুবরা খণ্ড : ১, ইবন সা'দ, পৃষ্ঠা : ২৪৬-২৪৮ দ্রষ্টব্য

*আমার বাহনটিও বাঁধলাম। **তারপর মাসজিদে প্রবেশ করলাম ও দুই রাকাত নামায আদায় করে বের হলাম। ...”*** [২২২]

এই বর্ণনাগুলোয় দেখা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন, তাঁর সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করা হয়েছিল, তিনি মাসজিদে প্রবেশ করেছেন ও তা থেকে বের হয়েছেন, তিনি মসজিদের কিছু দ্বারের কথা বলছেন। এ থেকে নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিরা দাবি করে যে—তিনি ইমারতসহ একটি মসজিদের কথাই বলেছেন। কেননা তিনি যদি খালি স্থানের কথা বলতেন, তাহলে তাঁর সামনে কী উদ্ভাসিত করা হলো? খালি স্থান হলে তো দ্বার বা দরজা থাকার কথা না, খালি স্থানে কী করে তিনি প্রবেশ করলেন ও বের হলেন? কাজেই তিনি একটি ইমারতবিশিষ্ট মাসজিদের কথাই বলতে চেয়েছেন, যা একটি অসত্য কথা [নাউযুবিল্লাহ]। এর খণ্ডনে আমরা যা বলবো—

প্রথম কথা: উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য ইমারত থাকা জরুরি নয়। যেকোনো স্থানই কারও সামনে উদ্ভাসিত হয়ে বা ফুটে উঠতে পারে।

দ্বিতীয় কথা: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাসজিদুল হারাম যেমন একটা নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে গঠিত, বাইতুল মুকাদ্দাসও তেমনই একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে গঠিত। সেই এলাকাটি সীমানাপ্রাচীরে ঘেরা ছিল। সেই এলাকাতে ঢোকা ও বের হওয়া মাসজিদে ঢোকা ও বের হওয়া হিসাবে বলা হয়েছে।

তৃতীয় কথা: বিবরণের মধ্যে দ্বার বা দরজার কথাও বলা আছে। বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকাটি সীমানাপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল এবং তাতে কিছু প্রবেশদ্বার ছিল। এখানে এই প্রবেশদ্বারের কথাই বলা হয়েছে।

নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিরা এবার হয়তো বলতে পারেন, ওই যুগে এলাকাটি সীমানাপ্রাচীরে ঘেরা ছিল এবং তাতে প্রবেশদ্বার ছিল, তার প্রমাণ কী? মুহাম্মাদ (ﷺ) এর দাবির কোনো সাক্ষী আছে? আর মুহাম্মাদ (ﷺ) যে ওই

---

[২২২] সহীহ মুসলিম, খণ্ড : ১, কিতাবুল ঈমান, হাদিস : ৩০৯

প্রবেশদ্বার দিয়েই ঢুকেছেন তার প্রমাণ কী? কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ কি আছে?

মুহাম্মাদ (ﷺ) যখন ইসরা ও মিরাজে গিয়েছেন, তখন সেখানে কেউ না থাকলেও এর কয়েক বছর পর খলিফা উমার (রা.) যখন জেরুজালেমে যান, তখন কিন্তু সেখানে অনেক লোক ছিল। খলিফা উমার (রা.) কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাসে ঢোকার বিবরণের মধ্যেও এটা উল্লেখ আছে যে—তিনি একটি দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করেছিলেন। এবং এটা ছিল সেই দ্বার, যে দ্বার দিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) ইসরার রাতে সেখানে প্রবেশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সেখানে মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। উমার (রা.) এর বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় সেখানে অনেক মানুষ ছিল, অনেক সাক্ষী ছিল। কাজেই সেখানে যে দ্বার বা দরজা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবন কাসির (র) এর বর্ণনা থেকে:

*“...**খলিফা উমার (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের খ্রিষ্টানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করলেন এবং শর্ত করলেন যে, তিন দিনের মধ্যে সকল রোমান নাগরিক বাইতুল মুকাদ্দাস ছেড়ে চলে যাবে। এরপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করলেন সেই দরজা দিয়ে, মি'রাজের রাতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।** কেউ কেউ বলেছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময়ে তিনি তালবিয়া পাঠ করেছিলেন, ভেতরে গিয়ে দাউদ (আ.)-এর মিহরাবের পার্শ্বে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায আদায় করলেন। পরের দিন ফজরের নামায মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করলেন।...এরপর তিনি ‘সাখরা’ বা বিশেষ পাথরের নিকট এলেন। কা‘ব আল-আহবার (র) থেকে তিনি ওই স্থান সম্পর্কে জেনে নিয়েছিলেন। কা‘ব (র) এই ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যেন তিনি মাসজিদটি ওই পাথরের পেছনে তৈরি করেন। হযরত উমার (রা.) বললেন,*

ইহুদি ধর্ম তো শেষ হয়ে গিয়েছে। ***তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্মুখে মাসজিদ নির্মাণ করলেন। এখন সেটি উমারী মাসজিদ নামে পরিচিত।*** *”*[২২৩]

ইমাম আহমাদ (র) আরও বর্ণনা করেন যে, উমার (রা.) বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের পর ঠিক সেখানেই নামায পড়েন, যেখানে রাসুলুল্লাহ (□) নামায পড়েছিলেন।[২২৪] উমার (রা.) দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন, নামায আদায় করেন, এবং পরে মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে—মাসজিদ তৈরির আগেই সেখানে দ্বার ছিল। বিবরণ থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, এই দ্বার হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকার প্রবেশদ্বার। বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি মানচিত্রের ছবি দেখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে। উমার (রা.) এর প্রবেশদ্বার এবং অন্য স্থানগুলো এতে চিহ্নিত করে দেখানো আছে।

---

[২২৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসির (র), ৭ম খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃষ্ঠা : ১০৭-১০৮

[২২৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসির (র), ৭ম খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃষ্ঠা : ১১২

LE TEMPLE DE JÉRUSALEM.
PL. XVII.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
a
b
c
d
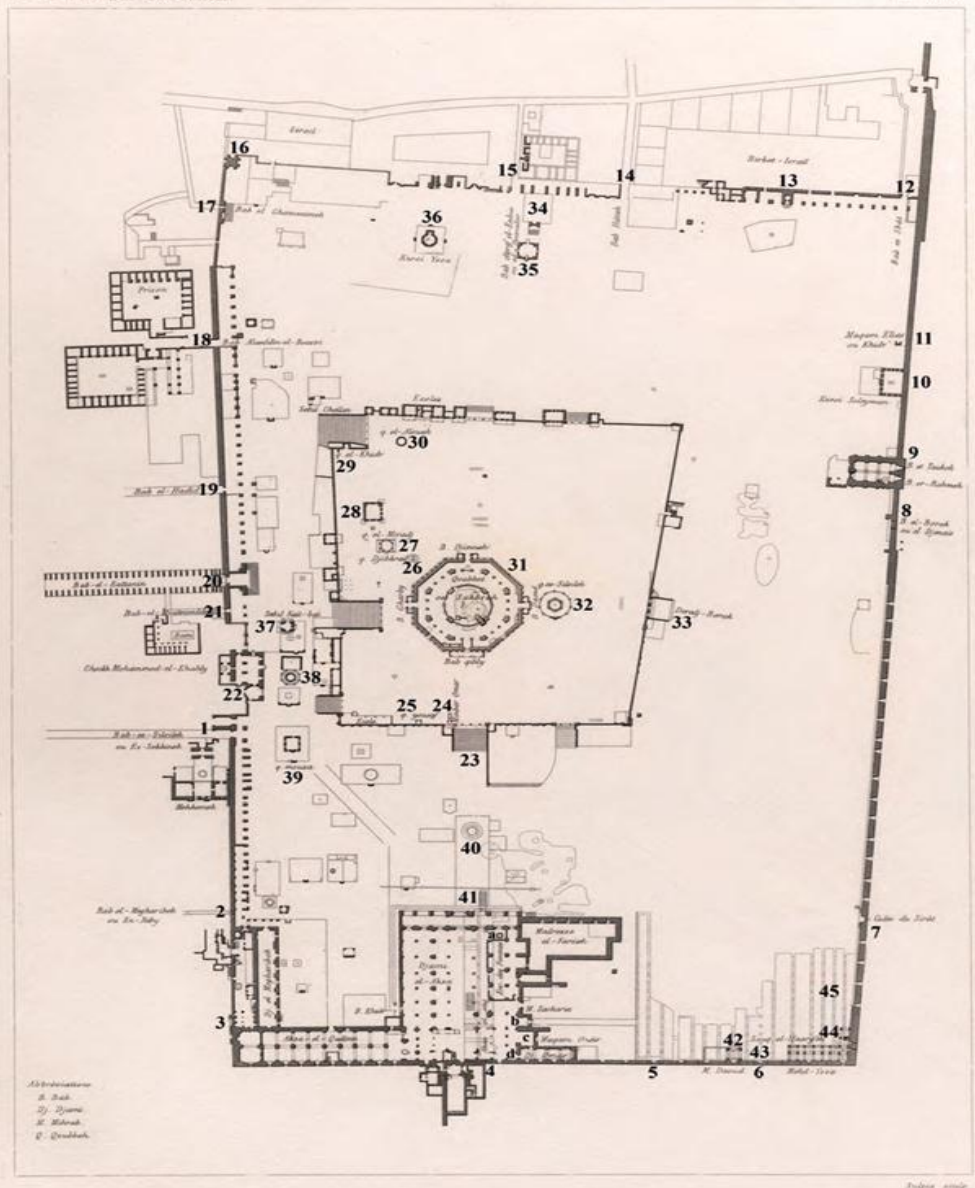
“আল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) কমপ্লেক্সের মানচিত্র” [মানচিত্রটি তৈরি করেছেন: গুলরু নেসিপোগলু (GÜLRU NECIPOĞLU), অধ্যাপক: ইসলামিক আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার
বিভাগ: হিস্ট্রি অব আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়] [২২৫]

GATES AND WALLS

l. (North) Gate of the Chain (bob al-silsila); (south) Gate of the Divine Presence (bäb al-sakina), also known as Gate of the Law Court (bäb at-mahkama) after the Sharita Court to its south [Gate of David]

2. Gate of the Maghribis (bäb al-maghariba), with Barclay's Gate under it [Gate of Remission (bäb al-hitta)l

3. Mosque of the Maghribis, with al-Fakhriyya Minaret

4. Double Gate with corridor (closed) [***Gate of the Prophet (bob al-nabi***)]

5. Triple Gate with corridor (closed) [Gate of Repentance (büb al-rahma) and Mihrab of Mary]

6. Single Gate (closed)

7. Battlement with protruding pillar marking the place of the Sirat Bridge

8. Funeral Gate (bob al-janä’iz), ***also known as Gate of al-buraq (closed)***

9. Golden Gate (closed) [Gate of Mercy; a double gate known after the mid-eleventh-century walling up of the Gate of Repentance (no.5 above) as (north) Gate of Repentance (bob ad-tawba) and (south) Gate of Mercy (bäb al-rahma)].

10. Solomon's Throne or Footstool (kursi sulayman)

11. Station (maqäm) of al-Khidr

12. Gate of the Tribes (bäb al-asbat)

13. Minaret near Gate of the Tribes (bäb al-asbat)

14. Gate of Remission (bäb al-hitta) [former position at no. 2 above]

15. Gate of Darkness (bab al-atm), also known as Gate of the Glory of the Prophets (bähsharaf al-anbiyä or bab at-dawadäriyya)

---

[২২৫] ‘The dome of the rock as palimpsest’ পৃষ্ঠা : ২০-২১

16. Minaret of the Ghawanima Gate, named after the Ghanim family [Minaret of Abraham]

17. Ghawanima Gate [Gate of Abraham (bab al-khalil)]

18. Gate of the Superintendant (bab-al-nazir)

19. Iron Gate (bob al-hadid)

20. Gate of the Cotton Merchants (bäb al-qattanin)

21. Ablution Gate (bob al-mathara)

22. Minaret of the Gate of the Chain (bob at-silsila) RAISED PLATFORM

23. Southern Stairway ***[Station of the Prophet(maqam al-nabi)]***

24. Stone Minbar of Burhan al-Din adjacent to the pier o t e south- ern stairway.

25. Dome of Yusuf

26. Dome of the Prophet (qubbat al-nabi) with Red Mihrab on its pave-menu: labeled Dome of Gabriel on de Vogüé's plan

27. ***Dome of the Ascension (qubbat al-mi'raj)***

28. Convert of shaykh Muhammad of Hebron with underground vault enclosing a natural rock and early mihrab (al-züwiya al-muhammadiyya) , also known as Mosque of the Prophet (masjid al-nabi)

29. Dome of al-Khidr (qubbat al-khidr)

30. Dome of the Spirits (qubbat al-arwäh)

31. Dome of the Rock (qubbat al-sakhra)

32. Dome of the Chain (qubbal al-silsila)

33. Western Stairway of al-Buraq

OUTER COURTYARD

34. Fountain of Sultan Süleyman with abutting mihrab aedicule

35. Iwan of Sultan Mahmud II, also known as Dome Of the Lovers Of the Prophet (qubbat al-ushshaq al-nabi)

36. Dome of Solomon (qubbatsulayman) [Solomon's Throne or Foot-stool (kurstsulaynän)]; labeled Throne or Footstool of Jesus on de Vogüé's plan

37. Fountain of Qaytbay

38. Fountain of Kasim Pasha

39. Dome of Moses (quhbatmusa)

40. Fountain known as the Cup (al-kä's)

41. Aqsa Mosque: a. Well of the Leaf (bi’r al-waraqa); b. Mihrab of Zechariah; c. Station (maqäm) of c Uzayr; d. Mosque of 'Umar

<u>42. Mihrab of David</u>

43. Market of understanding (süq al-ma’rifa)

44. Cradle of Jesus (mahd 'Isa)

45. Subterranean vaults known as Stables of Solomon
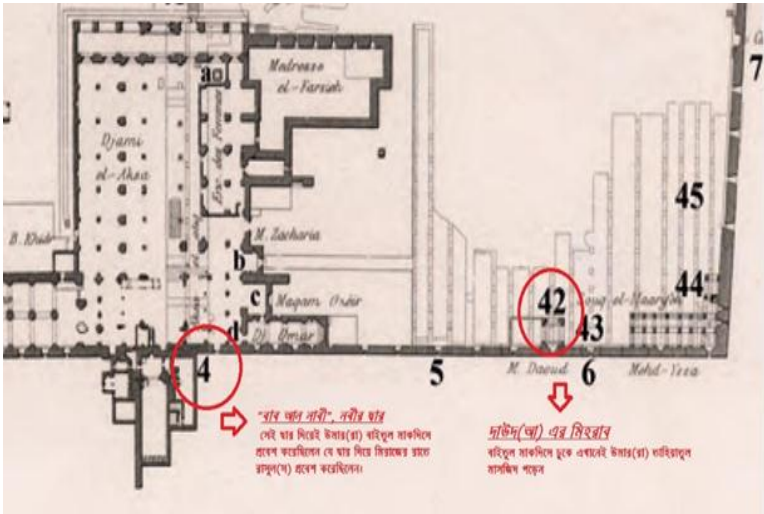
আসলে ওই এলাকাটি সম্পর্কে স্থানীয়দের পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। এই দ্বার ও মসজিদের খুঁটিনাটি তাদের জানা। এমনকি এখানে “বুরাক দ্বার” নামে একটি প্রবেশদ্বারও আছে [পৃষ্ঠা ১৮৫-এ উল্লেখিত মানচিত্রে ৮ নং দ্বার]। দ্বারটি বর্তমানে বন্ধ। এই দ্বার ও এলাকাটির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, তারা মোটেও নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হন না। এ ব্যাপারে ওই সব সরলমনা মুসলিম বিভ্রান্ত হন, যারা ফিলিস্তিন

থেকে অনেক দূরে বাস করেন, যাদের এলাকাটি সম্পর্কে ধারণা নেই এবং ইসরার ইতিহাস সম্পর্কেও বিস্তারিত জ্ঞান নেই।

আমরা আরও একটি বিবরণ দেখতে পারি:

"...এরপর তিনি [আবু বকর (রা.)] সেখান থেকে সোজা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট চলে আসলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি কি এদের কাছে বলেছেন যে এই রাতে আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিলেন?' তিনি বললেন, 'হাঁ।' আবু বকর (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর নবী!সে মাসজিদটির বর্ণনা দিন তো; আমি সেখানে গিয়েছিলাম।' তখন নবী (ﷺ) বললেন, 'তখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরা হলো। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।' ***এরপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আবু বকর (রা.) এর কাছে বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিতে লাগলেন। আর আবু বকর (রা.) প্রতিবারই বলতে লাগলেন, 'আপনি সত্যই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসুল।'*** *..."*[২২৬]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আবু বকর (রা.) পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার বর্ণনা তাঁর জানা ছিল। রাসুল (ﷺ) যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আবু বকর (রা.) এর দেখা বাইতুল মুকাদ্দাস হুবহু মিলে গিয়েছিল। যদি বর্ণনা না মিলতো, তাহলে তো আবু বকর (রা.) বুঝতেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য বলেননি। অথচ আদৌ এমন কিছু হয়নি, মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সত্যবাদিতাই আবু বকর (রা.) এর কাছে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারি ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অপবাদ দেয়, তাদের কি উচিত না এই বিবরণটি দেখা?

আরও একটি বিবরণ উল্লেখ করছি:

---

[২২৬] সীরাতুন নবী (সা.), ইবন হিশাম (র), ২য় খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) পৃষ্ঠা : ৭৪

"...মুশরিকরা বললো, তোমরা ইবন আবু কাবশার [মুহাম্মাদ (ﷺ)] দিকে তাঁকাও। সে ধারণা করে যে সে এক রাতে রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছে!

তিনি [রাসুল(ﷺ)] বললেন, "আমি তোমাদেরকে যে কথা বলছি ***তার প্রমাণ এই যে,*** *আমি অমুক উপত্যকায় অমুক গোত্রের একটি কাফেলার পাশ দিয়ে গিয়েলাম।*

তাদের একটি উট হারিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি তাদের উটটির সন্ধান দিলো। তারা যাত্রাপথে অমুক অমুক জায়গায় থামলো এবং অমুক দিন তারা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে।

তাদের সামনে একটি ধূসর বর্ণের উট আছে, যার দেহে একটি কালো ও আরেকটি বিচিত্র বর্ণের ছাপ আছে।'"

সেই দিনের জন্য মানুষ অপেক্ষা করছিলো। এমনকি দিনের অর্ধপ্রহরের নিকটবর্তী হয়ে গেলো। ইতিমধ্যেই কাফেলাটি চলে এলো। ***আর তাদের সামনে রাসুল(ﷺ) এর বর্ণনাকৃত উটটি ছিল।"*** [২২৭]

এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারে সে যুগেও লোকজন সন্দেহ পোষণ করেছিল। আর মুহাম্মাদ (ﷺ) সন্দেহবাদীদের যথাযথ প্রমাণ দেখান। সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিরা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর ইসরা ও মিরাজ মিথ্যা প্রমাণের জন্য কলম ধরে, তারা কেন এই বর্ণনাটি উল্লেখ করে না? সংশয়বাদীদের কি উচিত না, এই বর্ণনাটি ভালোমতো লক্ষ

---

[২২৭] ■ *দালায়িলুল নুবুওয়্যাহ* – ইমাম বায়হাকী, ২য় খণ্ড, ৩৫৫-৩৫৭ পৃষ্ঠা

■ *আল মুজামুল কাবির* – তাবারানী, ৭১৪২,

■ *মাজমাউল জাওয়াইদ,* ১ম খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা

■ *তাফসির কুরতুবী,* ১৩ নং খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১

করা, যাতে মুহাম্মাদ (ﷺ) সেই যুগের সংশয়বাদীদের সুস্পষ্টভাবে তাঁর কথার স্বপক্ষে প্রমাণ দেখিয়েছিলেন?

সব শেষে বলবো যে—ইসরা ও মিরাজ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর জন্য বিরাট এক মর্যাদা ও সাধারণ মানুষের জন্য পরীক্ষা। যুক্তি ও বিবেকের কষ্টিপাথরে কেউ যদি যাচাই করে, তাহলে সে এটা নিশ্চিত বুঝতে পারবে যে, সারাজীবনের আল-আমিন (বিশ্বস্ত) মুহাম্মাদ (ﷺ) ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারেও সত্য কথা থেকে এক চুল বিচ্যুত হননি। আর তখনই কেবল এ পরীক্ষায় সফল হওয়া সম্ভব হবে।

وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ

“আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।”

২২৮

---

২২৮ আল-কুরআন, বনী ইসরাইল (ইসরা), ১৭ : ৬০

যে বিয়ে আকাশে হয়েছিল

শিহাব আহমেদ তুহিন

ইতিহাসে যে মানুষটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বই লেখা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (ﷺ)। ভাবতে অবাক লাগে, সেই তিনিই ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটা জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য, রীতি-নীতি থেকে শুরু করে সবকিছু প্রায় রাতারাতি সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধাচারীরা যখন তাঁর দেখানো অনুপম আদর্শের চেয়ে ভালো কিছু প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন অভিযোগের আঙুল তুলেছে তাঁর পবিত্র ব্যক্তিগত জীবনের দিকে। যাদের নিজেদের ভালো-খারাপের কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই, তারাই বলতে গেলে তাঁর জীবনের প্রায় সবকিছুরই সমালোচনা করেছে। এই সমালোচনার লিস্টে তাদের খুব প্রিয় একটা টপিক "রাসুল (ﷺ) ও যায়নাব (রা.) এর বিয়ে।"

যায়নাব (রা.) ছিলেন রাসুল (ﷺ) এর ফুফাতো বোন এবং তাঁর আযাদকৃত দাস এবং একসময়কার পালকপুত্র যায়দ বিন হারিসার (রা.) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। যায়নাব (রা.) এর সাথে রাসুল (ﷺ) এর বিয়ের ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে এবং তাতে নিজেদের কল্পনার রং ছড়িয়ে ইসলাম-বিদ্বেষীরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, রাসুল (ﷺ) একজন নারীলোভী ছিলেন এবং তিনি যায়নাব (রা.)-কে নগ্ন অবস্থায় দেখে তাঁর রূপে আসক্ত হয়ে প্রেমে পড়ে যান এবং পরবর্তীতে তাঁকে বিয়ে করেন। এ ক্ষেত্রে তারা ইবন ইসহাক, আল-ওয়াকিদী, ইবন সাদ এবং ইবন জারির আত-তাবারি থেকে

উদ্ধৃত করে। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত করা হয় ইবন জারির আত-তাবারি (র) এর গ্রন্থ থেকে।

তাবারি (র) এর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার পূর্বে আমি পাঠকদের এই তথ্যটুকু দিতে চাই যে, রাসুল (ﷺ) সম্পর্কিত কোনো বর্ণনা বা উদ্ধৃতি পেলেই মুসলিমরা সেটাকে সত্যরূপে গ্রহণ করে না। পূর্ববর্তী আলেমগণ বেশ নিষ্ঠার সাথে গড়ে তুলেছিলেন “হাদিসশাস্ত্র”। তারা দেখিয়েছিলেন কীভাবে একটি হাদিস সঠিক, দুর্বল কিংবা মিথ্যা কি না—তা নির্ণয় করা যায়। একটি হাদিসের মূলত দুটি ভাগ থাকে। একটি হচ্ছে ‘সনদ’ বা তথ্যসূত্র এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘মতন’ বা বর্ণনা। একটি হাদিস বেশ কয়েকজন রাবি (হাদিস বর্ণনাকারী) বর্ণনা করে থাকেন; যদি প্রত্যেক রাবি বিশ্বস্ত এবং সূত্র-পরম্পরা ধারাবাহিক না হয়ে থাকেন, তবে সে হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় না। ইবন জারির আত-তাবারি (র) তাঁর গ্রন্থে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ নীতির প্রয়োগ করেননি। তিনি ভালো-খারাপ সকল ব্যক্তির কাছ থেকেই বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আত- তাবারী (র) তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন—

“আমি পাঠকদের সতর্ক করতে চাই যে, কিছু মানুষ আমার নিকট যে খবর বর্ণনা করেছে, এই বইয়ে আমি তার ওপর নির্ভর করে সবকিছু লিখেছি। আমি কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই গল্পগুলোর উৎস হিসেবে বর্ণনাকারীদেরকে (ধরে) নিয়েছি...। যদি কেউ আমার বইয়ে বর্ণিত কোনো ঘটনা পড়ে ভয় পেয়ে যান, তাহলে তার জানা উচিত যে, এই ঘটনা আমাদের কাছ থেকে আসেনি। আমরা শুধু তা-ই লিখেছি যা বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে পেয়েছি।”

ইবন কাসির (র), ইবন জারির আত-তাবারি (র) এর এই নীতির সমালোচনা করে লেখেন, *“ইমাম ইবন জারির (র) এরূপ বহু অসার বর্ণনা করেছেন যা সঠিক নয়, যেগুলো বর্ণনা করা উচিত নয় বলে আমরা তা ছেড়ে দিলাম। কেননা, এগুলোর মধ্যে একটিও প্রমাণিত ও সঠিক নয়।”*[২২৯]

---

[২২৯] তাফসির ইবন কাসির (১৫ নং খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮০৫)

অপরদিকে ইবন হাজার (র), ইবন জারির আত-তাবারি (র)-কে কিছুটা ডিফেন্ড করে লেখেন, *"এটি তাবারির একক বিষয় নয় এবং এই বিষয়ে তাঁকে পৃথকভাবে দোষ দেয়ার কিছু নেই। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ মনে করতেন যে, সনদসহ সহীহ হাদিস উল্লেখ করলেই দায়িত্ব পালিত হয়ে গেলো এবং তাঁরা যিম্মাদারি থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।"*[২৩০]

এখন দেখা যাক, ইবন জারির তাবারি (র) আসলে কী লিখেছিলেন যা নিয়ে মুহাদ্দিসগণ এতটা আপত্তি তুলেছিলেন। ইবন জারির তাবারি (র) তাঁর 'তারিখ' (৩/১৬১) এবং ইবন সাদ তাঁর 'তাবাকাত' (৮/১০১) গ্রন্থে উল্লেখ করেন—

"মুহাম্মাদ ইবন উমার বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন আমর আল-আসলামি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হিশাম বলেছেন "রাসুল (ﷺ) যায়দ বিন হারিসার বাসায় তাঁকে খুঁজতে গেলেন, তখন যায়দকে বলা হতো 'মুহাম্মাদের পুত্র'। কিন্তু তিনি তাঁকে বাসায় খুঁজে পেলেন না। এমতাবস্থায়, যায়নাব তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে তাঁর রাতের পোশাক পরে বের হলেন। নবী (ﷺ) তাঁর মুখ ফেরালেন এবং তিনি (যায়নাব) বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! সে এখানে নেই, দয়া করে ভেতরে আসুন।' কিন্তু নবী (ﷺ) (ভেতরে প্রবেশ করতে) রাজি হলেন না। তিনি (যায়নাব) রাতের পোশাক পরে বের হয়েছিলেন, কারণ তাঁকে বলা হয়েছিল নবী (ﷺ) দরজায় দাঁড়িয়ে, তাই তিনি তাড়াহুড়ো করেছিলেন। তিনি নবী (ﷺ) এর হৃদয়ে জায়গা করে নিলেন। নবী (ﷺ) অস্পষ্ট গুঞ্জন করতে করতে বের হয়ে গেলেন, (যার মধ্যে শুধু এতটুকু বোঝা গেলো) 'সকল প্রশংসা তাঁর যিনি হৃদয়ের পরিবর্তন করেন।' যখন যায়দ বাসায় আসলেন তখন তাঁকে বলা হলো, নবী (ﷺ) তাদের বাসায় এসেছিলেন। যায়দ (রা.) তখন যায়নাব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তাঁকে ভেতরে আসতে বলোনি?' যায়নাব (রা.) বললেন, 'আমি বলেছিলাম

---

[২৩০] লিসানুল মিযান : ৩/৭৪

কিন্তু তিনি আসেননি।' যায়দ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি কিছু বলে যাননি?' যায়নাব (রা.) বললেন, 'তিনি গুঞ্জন করতে করতে বের হয়ে গেলেন, আমি তার কিছুই বুঝতে পারিনি, শুধু এতটুকু বলতে শুনেছিলাম, 'সকল প্রশংসা তাঁর যিনি হৃদয়ের পরিবর্তন করেন।'

তারপর যায়দ (রা.) রাসুল (ﷺ) এর কাছে আসলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমাকে বলা হয়েছে আপনি আমাদের বাসায় এসেছিলেন কিন্তু ভেতরে আসেননি। যদি এটা এই কারণে হয়ে থাকে, আপনি যায়নাবকে পছন্দ করেন, তাহলে তাকে আপনার জন্য আমি ত্যাগ করবো।' কিন্তু নবী (ﷺ) বললেন, 'তোমার স্ত্রীর সাথে থাকো।' এরপর যায়দ (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলে নবী (ﷺ) আবার বললেন, 'তোমার স্ত্রীর সাথে থাকো।' কিন্তু যায়দ (রা.) তখন যায়নাব (রা.)-কে তালাক দিলেন এবং তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলো। এরপর (একদিন) নবী (ﷺ) যখন আয়িশা (রা.) এর সাথে কথা বলছিলেন তখন জিবরাইল (আ.) তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসলেন। তিনি স্বস্তি পেলেন এবং হেসে হেসে বললেন, 'কে যায়নাবের কাছে যাবে এবং তাকে বলবে যে আল্লাহ তাঁকে আমার স্ত্রী বানিয়েছেন?' তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, 'আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন ...' থেকে শেষ পর্যন্ত।"

এবার আমরা দেখি এ বর্ণনার সনদে কোনো সমস্যা আছে কিনা!

প্রথম সমস্যা

মুহাম্মাদ ইবন উমার আল ওয়াকেদিকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। হাদিসের ব্যাপারে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য না এ ব্যাপারে অসংখ্য মুহাদ্দিসিনের বক্তব্য আছে। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) বলেছেন, 'সে একজন মিথ্যাবাদী, যে কিনা হাদিস বানাতো।' আদ-দারাকুতনি বলেছেন, 'তার মধ্যে দুর্বলতা আছে।'[২৩১]

---

[২৩১] মিযানুল ই'তিদাল ফি নাকদির রিজাল, ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি (খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৭৩)

ইমাম শাফিঈ তার কিতাবগুলোকে ‘মিথ্যাচার’ বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, ‘আমার কোনো সন্দেহ নেই সে বানোয়াট হাদিস বর্ণনা করে।’ ইমাম আন-নাওয়ায়ি বলেছেন, “মুহাদ্দিসিনের ‘ইজমা আছে সে (হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে) দুর্বল।”[232] ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম তার হাদীসকে ‘পরিত্যাজ্য’ বলেছেন। আলী ইবন মাদিনী ও নাসাঈ তাকে ‘ওয়াজিউল হাদীস’ বা হাদীস জালকারী বলে মন্তব্য করেছেন।[২৩৩]

দ্বিতীয় সমস্যা

আবদুল্লাহ ইবন আমির আল-আসলামিকে দুর্বল বলা হয়। ইবন হাজার আল আসকালানি এবং আমির আল-মাদানি তাকে দুর্বল বলেছেন।[২৩৪]

তৃতীয় সমস্যা

মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া। তিনি বিশ্বস্ত কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তিনি কখনো নবী (ﷺ) এর সাথে সরাসরি কথা বলেননি। ইমাম যাহাবি বলেছেন, “তিনি ৪৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।”[২৩৫] আমরা জানি নবী (ﷺ) ১১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাই নবী (ﷺ) ও ইবন ইয়াহইয়ার জন্মের মাঝে প্রায় ছত্রিশ বছরের ব্যবধান ছিল।

আত-তাবারি (র) তাঁর বই আত-তারিখে (২২/১৩) একই ঘটনা একটু অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন:

“ইউনুস আমাকে বলেছেন, নবী (ﷺ) যায়দ বিন হারিসা (রা.)-কে তাঁর ফুফাতো বোন যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.) এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

---

[২৩২] তাহযিব আত-তাহযিব

[২৩৩] সীরাতে মোস্তফা, মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি (র), পৃষ্ঠা : ৯৭

[২৩৪] তাকরিবুত তাহযিব, ইবন হাজার আসকালানি (পৃষ্ঠা : ২৫১)

[২৩৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী (খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৬২)

একদিন নবী (ﷺ) তাঁকে খুঁজতে তাঁর বাসায় গেলেন, তাঁর বাসায় দরজা বলতে ছিল কেবল এক টুকরো কাপড়, বাতাসে কাপড়টি উড়ে গেলো এবং যায়নাব (রা.)-কে প্রকাশ করে দিলো। উনার পা অনাবৃত ছিল। তিনি নবীর (ﷺ) হৃদয়ে জায়গা করে নিলেন এবং তারপর থেকে তিনি অপরজনকে (যায়দকে) ঘৃণা করতেন। একদিন যায়দ (রা.) নবী (ﷺ) এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাই।' তিনি [নবী (ﷺ)] বললেন, 'কেন? তোমার কি তার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে?' তিনি (যায়দ) উত্তর দিলেন, 'না! আল্লাহর শপথ! আমার তার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তো তার মাঝে কেবল ভালোই দেখেছি।' তারপর নবী (ﷺ) বললেন, 'তোমার স্ত্রীর সাথে থাকো এবং তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো!' এই কারণেই আল্লাহ বলেছেন, 'তাঁকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন, অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।"[২৩৬]

এই হাদিসটি মু'দাল (অর্থাৎ, কমপক্ষে দুইজন বর্ণনাকারী এখানে অনুপস্থিত)। কারণ, ইবন যায়দ সাহাবী কিংবা তাবেয়ি কোনোটাই ছিলেন না।

এবার ইবন ইসহাকের বর্ণনা উল্লেখ করছি:

"যায়দ (রা.) অসুস্থ থাকার কারণে রাসুল (ﷺ) তাঁকে দেখতে যান। যায়দ (রা.) এর স্ত্রী যায়নাব (রা.) তখন তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁর সেবা করছিলেন। যখন তিনি (যায়নাব) কিছু কাজ করতে বাইরে গেলেন, তখন নবী (ﷺ) তাঁর দিকে তাকালেন, তাঁর মাথা নিচু করলেন এবং বললেন, 'সকল প্রশংসা তাঁর! যিনি চোখ ও হৃদয়ের দিক পরিবর্তন করেন।' তখন যায়দ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি তাকে আপনার জন্য তালাক দেবো?'

---

[২৩৬] *The history of Al Tabari-The victim of Islam,* Translated by Michael Fishbein [State University of New York Press, Albany, 1997] (Volume VIII, pp. 2-3)

কিন্তু নবী (ﷺ) জবাব দিলেন, 'না।' তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, 'আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।'[২৩৭]

এই হাদিসটির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এর কোনো সনদই উল্লেখ করা হয়নি, এছাড়া 'সীরাত ইবন হিশাম' গ্রন্থে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনটি হাদিসেরই সনদে অর্থাৎ বর্ণনাসূত্রে বড়সড় সমস্যা আছে। এবার যদি আমরা হাদিসগুলোর মতন বা বর্ণনাগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে অনেক অসামঞ্জস্য দেখতে পাবো। কোথাও বলা আছে, যায়নাব (রা.) রাতের পোশাক পরে বের হন, আরেক জায়গায় বলা আছে বাতাসে পর্দা উড়ে যাওয়াতে যায়নাব (রা.) এর পা দেখা গিয়েছিল। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় যায়দ (রা.) অসুস্থ ছিলেন অপরদিকে তাবারির বর্ণনায় যায়দ (রা.) বাসার বাইরে ছিলেন। কীভাবে একজন মানুষ একই সাথে অসুস্থ হয়ে বিছানায় আবার বাসার বাইরে থাকেন?

অনেকে ভাবতে পারেন, এই গল্পগুলো কিতাবগুলোতে আসলো কীভাবে যদি সত্যিই এর কোনো উৎস না থেকে থাকে। এর কারণ সম্ভবত দুইটি:

১) আল-ওয়াকেদি যিনি কিনা মিথ্যাবাদী হিসেবে সুপরিচিত, তিনি এই গল্পটি তৈরি করেছিলেন।

২) বাইবেলে বর্ণিত রাজা দাউদ ও বাতসেবার গল্প পড়ে কেউ এই গল্পটি তৈরি করেছে।[২৩৮] গল্পটিতে রাজা দাউদ, সুন্দর দেহের অধিকারী বাতসেবাকে

---

[২৩৭] General Ahmad Abdul-Wahhab, Ta'adud Nisa' Al-Anbiyaa wa Makanat Al-Mar'ah fi Al-Yahodiyyah wa Al-Masihiyyah wa Al-Islam, p. 68

[২৩৮] Holy Bible, 2 Samuel, Chapter 11

নগ্ন অবস্থায় গোসল করতে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে বাতসেবার স্বামীকে হত্যা করে বাতসেবাকে নিজের কাছে নিয়ে নেন।

মুহাম্মাদ (ﷺ) কেন যায়নাব (রা.)-কে বিয়ে করেছিলেন?

এর কারণটা জানতে হলে আমাদের ইতিহাসটা একটু নিরেপেক্ষভাবে জানার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে দেখি যায়দ (রা.) ও যায়নাব (রা.) এর বিয়ে-পূর্ব ও পরবর্তী প্রেক্ষাপট কেমন ছিল। জনপ্রিয় ও অন্যতম বিশুদ্ধ তাফসির গ্রন্থ তাফসির ইবন কাসির আমাদের বলছে,

"রাসুল (ﷺ) যায়দ বিন হারিসার পয়গাম নিয়ে যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.) এর কাছে হাজির হন। তিনি (যায়নাব) উত্তর দিলেন, "আমি তাকে বিয়ে করবো না।"[২৩৯]

যায়নাব (রা.) এর সরাসরি প্রত্যাখ্যান অনেকের কাছে বেশ রূঢ় মনে হতে পারে, কারণ এখানে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং রাসুল (ﷺ)। কেন তিনি সরাসরি না করেছিলেন? এর উত্তর দিয়েছেন মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি (র) তাঁর 'সীরাতে মোস্তফা' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন—

"যায়দ বিন হারিসা (রা.) ছিলেন রাসুল (ﷺ) এর আযাদকৃত ক্রীতদাস। অপরদিকে যায়নাব (রা.) ছিলেন অত্যন্ত খানদানি পরিবারের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মহিলা। সেই সাথে তিনি ছিলেন রাসুল (ﷺ) এর ফুফাতো বোন। আর দেশের সামাজিক প্রচলন হিসেবে তারা আযাদকৃত ক্রীতদাসের সাথে আত্মীয়তা গড়াকে খুবই আপত্তিকর, মানহানিকর ও অশোভনীয় বলে বিবেচনা করতেন। আর তাই রাসুল (ﷺ) যখন তাঁর আযাদকৃত গোলাম যায়েদের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিলেন তখন যায়নাব ও তাঁর ভাই তা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।[২৪০]

---

[২৩৯] তাফসির ইবন কাসির (১৫ নং খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮০৫)

এ পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ এলো:

“আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।”[২৪১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন কাসির (র) বর্ণনা করেন, *“এটা (আয়াতটা) শুনে যায়নাব (রা.) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ), আপনি কি এ বিয়েতে সম্মত আছেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘হাঁ।’ তখন যায়নাব (রা.) বললেন, ‘তাহলে আমারও কোনো আপত্তি নেই। আমি আল্লাহর রাসুল (ﷺ) এর বিরোধিতা করবো না। আমি তাকে আমার স্বামী হিসেবে বরণ করে নিলাম।*[২৪২]

যারা আলোচনার দীর্ঘসূত্রিতায় বিরক্ত হচ্ছেন, তাদের বলবো ধৈর্য ধরে আরেকটু পড়ে যেতে। কারণ এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি তা অনেক সন্দেহ নিরসন করবে। সুরা আল আহযাবের ৩৮ নং আয়াত এখানে ভেঙে ভেঙে উল্লেখ করছি:

i) *আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন:* এ আয়াতে যায়দ বিন হারিসার (রা.) কথা বলা হয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। তাঁকে আল্লাহ ইসলাম ও নবী (ﷺ) কে খুব কাছ থেকে অনুসরণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অপরদিকে, যায়দ (রা.) যখন খাদিজা (রা.) এর ক্রীতদাস ছিলেন, তখন তাঁর চাল-চলন রাসুল (ﷺ) কে মুগ্ধ করে এবং তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন। তিনি ছিলেন রাসুল (ﷺ) এর পালকপুত্র আর সবাই তাকে ‘যায়দ বিন মুহাম্মাদ’ ডাকতো। এটা ছিল যায়দ (রা.) এর প্রতি রাসুল (ﷺ) এর বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পালকপুত্রের

---

[২৪০] সীরাতে মোস্তফা, মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি (র) (পৃষ্ঠা : ৭২৮)

[২৪১] আল কুরআন, সুরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬

[২৪২] তাফসির ইবন কাসির (১৫ নং খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮০৫)

বিধান রহিত করে দিলেন এবং পিতৃ-পরিচয় জানার পরেও কাউকে ভিন্ন নামে ডাকতে নিষেধ করে দিলেন:

“আল্লাহ কোনো মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা যিহার করো, তাদের তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথামাত্র। আল্লাহ ন্যায়কথা বলেন এবং পথপ্রদর্শন করেন।”[২৪৩]

আল্লাহ খুব সুন্দরভাবে আমাদের উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন; যেভাবে মানুষের মধ্যে দুইটা মন থাকতে পারে না, ঠিক একই ভাবে কেউ পুত্র না হয়েই পুত্রের পরিচয় বহন করতে পারে না, এটা আমাদের মুখের কথামাত্র এবং আমাদের মনের সাথে তার কোনো সংযোগ নেই। তেমনিভাবে, যদি নিজেদের স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করি (যিহার—জাহিলি যুগের এক ধরনের তালাকের নিয়ম), তবে তারা আমাদের মা হয়ে যায় না, স্ত্রীই থাকে। পরবর্তীতে রাসুল (ﷺ) আর যায়দ (রা.)-কে নিজের পুত্র হিসেবে সম্বোধন করেননি; বরং বলেছিলেন, “তুমি আমার ভাই এবং বন্ধু।”[২৪৪]

ii) *তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো:* এ আয়াতটির আলোচনায় চলুন আবার ‘সীরাতে মোস্তফা’ গ্রন্থটিতে ফিরে যাওয়া যাক: “আল্লাহর হুকুম মোতাবেক যায়দ বিন হারিসা (রা.) এর সাথে যায়নাব (রা.)- এর বিবাহ হয়ে গেলো। বিবাহ তো হয়ে গেলো, কিন্তু যায়নাবের দৃষ্টিতে যায়দ নীচ ও হীনই রইলেন। ফলে তাদের মধ্যে বনিবনা হলো না মোটেই। যায়দ (রা.) বার বার রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট যায়নাব (রা.)-এর বেপরোয়া ভাবভঙ্গি এবং যায়দকে উপেক্ষা করার অভিযোগ করতে লাগলেন। এ অবস্থায় তিনি বার বার যায়নাবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন।” রাসুল (ﷺ) বিয়ে ভাঙতে নিষেধ করেন

---

[২৪৩] আল কুরআন, সুরা আহযাব, ৩৩ : ৪

[২৪৪] তাফসির ইবন কাসির (১৫ নং খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৩৮)

এবং বলেন, '*তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো।*'[২৪৫]

iii) *আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত:* পূর্বে ইমাম তাবারি (র) থেকে যে বর্ণনা উল্লেখ করেছি, তার সাহায্যে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'অন্তরে এমন বিষয় গোপন করেছিলেন' বলতে নবী (ﷺ) এর যায়নাব (রা.) এর প্রতি হঠাৎ আসক্ত হয়ে পড়াকে বোঝানো হয়েছে। পশ্চিমের অনেক লেখকই এ বর্ণনার সাথে নিজেদের কল্পনার রং ছড়িয়ে যাচ্ছেতাই লিখেছে তাদের বইয়ে।[২৪৬]

হঠাৎ আসক্ত হয়ে পড়ার বিষয়টি আসলে কিছু মানবমনের কল্পনা ছাড়া কিছুই না। কারণ—

প্রথমত, ইমাম তাবারি (র) যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তা নির্ভরযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, যদিও ধরে নিই সে হাদিস নির্ভরযোগ্য, তবুও রাসুল (ﷺ) এর হঠাৎ যায়নাবের (রা.) প্রতি আসক্ত হয়ে পড়াটা অবাস্তব। কারণ, যায়নাব (ﷺ) ছিলেন রাসুল (ﷺ) এর ফুফাতো বোন। রাসুল (ﷺ) তাঁর রূপ, গুণ সম্পর্কে বহু পূর্বে অবগত ছিলেন।

তৃতীয়ত, যদি এটাও ধরে নিই তিনি আসলেই যায়নাবের প্রতি আসক্ত ছিলেন, তাহলে কেন তিনি যায়নাবকে যায়দের সাথে বিয়ে দেবেন? সে রকমটা হলে তো তিনি নিজের জন্যই প্রস্তাব দিতেন। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, 'অন্তরে যে বিষয় গোপন করেছিলেন' বলতে তাহলে কী বোঝানো হয়েছে? মুসনাদ আবু হাতিমে রয়েছে যে, যায়নাব বিনতে জাহশ (রা.) যে রাসুল (ﷺ) এর স্ত্রী

---

[২৪৫] সীরাতে মোস্তফা, মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি (র) (পৃষ্ঠা : ৭২৮)

[২৪৬] The life of Mahomet, William Muir (Vol. 3, page-231)

হবেন, এ কথা বহু পূর্বে আল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু রাসুল (ﷺ) এ কথা প্রকাশ করেননি বরং তিনি যায়দ (রা.)-কে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে বলেছিলেন। তাই আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করে বোঝালেন এ কথা রাসুল (ﷺ) যতোই গোপন রাখুন না কেন, আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন।

রাসুল (ﷺ) বেশ ভালোমতোই জানতেন, এই আয়াতটি নিয়ে নিন্দুকেরা অনেক কল্পনার রং ছড়াবে। কিন্তু আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তাতে কোনোপ্রকার সংযোজন-বিয়োজনের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। আয়িশা (রা.) তাই বলতেন, *"যদি রাসুল (ﷺ) কিতাবুল্লাহর কোনো আয়াত গোপন রাখতেন, তবে এই আয়াতটিকেই গোপন করতেন।"* [২৪৭] পবিত্র কুরআনে এই আয়াতটি থাকাই প্রমাণ করে, এটি রাসুল (ﷺ) এর নিজের লেখা কোনো বই ছিল না; বরং এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত।

iv) *তারপর যায়দ যখন তার (যায়নাবের) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রেরা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে;* এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একেবারে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, কেন আল্লাহ তা'আলা যায়নাব (রা.)-কে রাসুল (ﷺ) এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার মাধ্যমে 'পালকপ্রথা' চিরতরে দূর হয়ে যায়।

অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, পোষ্যপুত্র হিসেবে পিতার পরিচয় বহন করলে এমন কী সমস্যা? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ইসলাম স্পেডকে স্পেড বলে। তাই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, পিতার পরিচয় বহন করলেই কেউ পিতা

---

[২৪৭] তাফসির ইবন কাসির (১৫ নং খণ্ড; পৃষ্ঠা : ৮০৫)

হয়ে যায় না। এ কারণে একই ঘরে প্রতিপালিত হলেও যে ছেলে কিংবা মেয়েকে দত্তক নেয়া হয়েছে তার অভিভাবকের যদি কোনো সন্তান থাকে, তবে সে তাদের ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে, বিপরীত লিঙ্গের হলে তারা গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) বলে সাব্যস্ত হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে, যদি কোনো মহিলা কোনো শিশুকে প্রথম দুই বছরের মধ্যে পাঁচ বা তার বেশিবার বুকের দুধ পান করান, তবে সে তার সন্তানের ভাই-বোন বলে গণ্য হবে।[২৪৮] আল্লাহ বলেন:

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকন্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন।"[২৪৯]

পাশ্চত্যের ফস্টার প্যারেন্টিং *(Foster Parenting)* সিস্টেম দেখে অনেকে ইসলামের এই বিধানটাকে বাড়াবাড়ি বলতে চান। যদিও তারা মুদ্রার অপর পিঠটা কখনোই বলেন না। পরিসংখ্যান অনুসারে, খোদ যুক্তরাজ্যেই প্রতি বছর ২০০০-২৫০০ অভিযোগ পাওয়া যায় ফস্টার প্যারেন্ট বা দত্তক নেয়া অভিভাবকদের বিরুদ্ধে, যারা কিনা তাদের দত্তককৃত শিশুদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। লাঞ্ছিত শিশুদের মধ্যে ৬০ ভাগ মেয়ে আর তাদের গড় বয়স মাত্র নয়![২৫০]

---

[২৪৮] *IslamQA-He found a baby and adopted him-what is the ruling?-* https://islamqa.info/en/33020

[২৪৯] আল কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪ : ২৩

[২৫০] http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/major-study-reveals-true-scale-of-abuse-of-children-living-in-care-9587244.html

যায়দ (রা.) যখন যায়নাব (রা.) এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়, তখন রাসুল (ﷺ) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। যায়নাব (রা.) রাসুল (ﷺ)-কে বলতেন, *'আল্লাহ তা'আলা আমার মধ্যে এমন তিনটি বিশেষত্ব রেখেছেন যা আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের মাঝে নেই। প্রথম এই যে, আমার নানা ও আপনার দাদা একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় এই যে, আপনার সাথে আমার বিয়ে আল্লাহ তা'আলা আকাশে পড়িয়েছেন। আর তৃতীয় এই যে, আমাদের মাঝে সংবাদ-বাহক ছিলেন জিবরাইল (আ.)।'*

যায়নাব (রা.) রাসুল (ﷺ) এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে বেশ গর্ব করে বলতেন, *'তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবক ও ওয়ারিশগণ। আর আমার বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আকাশের ওপর।*[২৫১]

যারা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অজাচার, সমকামিতার মতো জঘন্য বিষয়গুলোকে বৈধতার রায় দেন, তারা এরপরেও ঠিক কিসের ভিত্তিতে এই বিয়ে নিয়ে আপত্তি তোলেন—তা আমার বোধগম্য নয়। আর আমার এই লেখাটা তাদের জন্যও নয় যাদের একমাত্র রেফারেন্স হচ্ছে ইসলামবিদ্বেষ। এ লেখাটা তাদের জন্য, যারা হৃদয় দিয়ে সত্য খোঁজে।

আমি বিশ্বাস করি, হৃদয়টাকে খোলা রেখে সত্য খুঁজলে পরম করুণাময় তাঁর করুণার ধারা অবশ্যই বর্ষণ করবেন।

---

[২৫১] সহীহ বুখারী, অধ্যায় : ৯৭, হাদীস নং : ৭৪২০ [তাওহীদ পাবলিকেশন্স]

অপ্রমাণ্যের প্রমাণ

তানভীর আহমেদ

[১]

সকাল সকাল আবু বকরের (রা.) কাছে উপস্থিত হয়েছে কিছু লোক। কী যেন শুনতে এসেছে তারা। চোখেমুখে উন্নাসিকতা আর উচ্ছ্বাস।

"তোমার বন্ধু সম্পর্কে এখন কী বলবে, হে আবু বকর!? তিনি তো এখন দাবি করছেন—তিনি নাকি গতরাতে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন, সেখানে নাকি ইবাদাত করেছেন, আবার এক রাতের মধ্যেই মক্কায় ফিরে এসেছেন।"

আবু বকর (রা.) ভাবলেন স্বভাবসুলভ মিথ্যাচারই হয়তো করছে কুরাইশরা। *"তোমরা আমাকে আগে বলো, তিনি কি সত্যিই এ কথা বলেছেন কি না।" কুরাইশ লোকগুলো হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলো। "তিনি তো এখনও লোকদের কাছে এই কাহিনি বর্ণনা করছেন।"*

আবু বকর (রা.) বললেন, *"আল্লাহর কসম! যদি তিনি (ﷺ) এ কথা বলে থাকেন, তবে তিনি সত্য বলছেন। আর এতে এত আশ্চর্যের কী আছে? তিনি যখন বলেন যে তাঁর কাছে আসমান থেকে ওহী নাযিল হয়, একজন ফেরেশতা তা তাঁর কাছে নিয়ে আসেন, আমি তো সেসব কথায় বিশ্বাস করি; আর সেগুলো তো তোমাদের এখনকার বর্ণনার চেয়েও বিস্ময়কর!"*

সূচীপত্র

[২]

মানুষ প্রমাণ খোঁজে, প্রমাণের উপযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, শত আলোচনা করে জ্ঞান জাহির করে ছাড়ে। গবেষণা আর বিজ্ঞানচর্চার এই যুগে প্রমাণগুলো আজ বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রমাণ চাই করতে করতে মানুষ যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বাস্তবতা ভুলে যায় তা হলো—প্রমাণ ছাড়াই অনেক প্রমাণাতীত বিষয়াদি সে বাস্তব জীবনে অনায়াসে স্বীকার করে নেয়, বিশ্বাস করে নেয়—এমন সব অপ্রমাণ্য বিষয়াদি, যা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। একটু চোখ বুলানো যাক।

দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাগত সত্য (*Philosophical & Logical Truths*)

বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বা *Theoretical* বিষয়গুলো যুক্তি ও গণিতের ওপর নির্ভর করে প্রমাণ করা হয়। আর বিজ্ঞান যেসব দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার ওপর টিকে রয়েছে, সেগুলো বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। যেমন, একই সাথে একটি বিষয় সত্য আবার মিথ্যা হতে পারে না—এই যুক্তিটির ওপর ভিত্তি করে অনেক সময়ই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। অথচ একই সাথে একটি বিষয় সত্য আবার মিথ্যা হতে পারে না'—এই যুক্তিটির নিজেরই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেয়া যায় না। এটা কেবলই উপলব্ধির বিষয়। তেমনই দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাগত অন্যান্য সমস্ত সত্যগুলোই প্রমাণাতীত, কেবল উপলব্ধির বিষয়। 'পৃথিবীর সমস্ত আপেল লাল'—এই বাক্য সত্য হলে ইকবাল সাহেবের কেনা আপেলটি যে লালই হবে, তার আলাদা কোনো প্রমাণ দিতে হয় না। কারণ, দর্শনগত ও যুক্তিগত ধারণাগুলো বিজ্ঞান প্রথমে সত্য ধরে নিয়েই সামনে এগোয়। তাই সেগুলো আবার প্রমাণ করতে গেলে চক্রাকারে তর্ক *(Circular reasonings)* ছাড়া আর কিছুই হবে না।

আর গাণিতিক সত্যগুলোও *(Mathematical Truths)* দর্শনগত ও যুক্তিগত সত্যের আরেকটি রূপমাত্র। যেমন, 'পাঁচ' সংখ্যাটির ধারণা বা 'এক' এর পর

'দুই' সংখ্যাটাই আসে বা এক এক যোগ করলে 'দুই'-ই হয়—এমন সব অতি সাধারণ গাণিতিক বিষয়গুলোও দর্শনগত উপলব্ধির বিষয়। এগুলো বিজ্ঞান দিয়ে আলাদাভাবে প্রমাণ করতে হয় না।

অধিবিদ্যাগত/অবস্তুগত সত্য (*Metaphysical Truths*)

আমাদের এই জগৎটা আসলে কোনো কম্পিউটার সিমুলেশন বা কারও স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তবজগৎ আর এতে যা কিছু হচ্ছে তা বাস্তবিকই হচ্ছে। ১০ মিনিট আগে যে ঘটনাটা অতীত হয়েছে তা সত্যিই ঘটেছে, নিজ সত্তা বা 'আমি' এর উপলব্ধি, অন্যান্য মানুষের সত্তা বা মনের অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো এ ধরনের সত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং বিজ্ঞানের আওতারই বাইরে। কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই আমরা এই জগতের বাস্তবতা, অতীতের বাস্তবতা, নিজ ও অপরাপর সত্তার অস্তিত্ব ইত্যাদি *Metaphysical* ব্যাপারগুলো দিব্যি মেনে নিই। তাই হাস্যকর হলেও সত্য, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রমাণ বলে ফেনা তোলা কাউকে নিজের মনের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে বললেই চুপসে যেতে দেখা যায়।

মানবিকতা ও নৈতিকতা (Morals & Ethics)

মানবিকতা ও নৈতিকতাকে কখনো বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা বা মাপা যায় না। নাৎসি বিজ্ঞানীরা যে গ্যাস চেম্বারে মানুষ হত্যায় মেতে উঠতো, হিংস্র সব গবেষণায় মেতে উঠতো সেগুলো যে নীতিবিবর্জিত, অমানবিক ছিল—তা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এছাড়া ধর্ষণ, অজাচার ইত্যাদির মতো নৈতিকতা বিবর্জিত কার্যকলাপের কোনো বৈজ্ঞানিক সদুত্তর নেই। বিজ্ঞান এগুলোর খারাপ প্রভাব দেখাতে পারে মাত্র। কিন্তু এগুলো অপরাধ কি না সেই প্রশ্নে বিজ্ঞান নীরব।

ধর্মীয় বিশ্বাস আর বিধিবিধানে মুক্তচিন্তার দাবিদারেরা বিজ্ঞান টেনে আনলেও ধর্ষণ, সমকামিতার মতো বিষয়াদিতে ঠিকই 'মানবিকতা' আমদানি করে, তখন তাদের বিজ্ঞান পালিয়ে বেড়ায়। বাস্তবতা বিবর্জিত হয়ে যারা *LGBT rights* বা

সমকামিতা সমর্থন করে আর —‘ভালোবাসা যে কারও মধ্যে হতে পারে’, ‘এটা ব্যতিক্রম তবে অস্বাভাবিক কিছু না’— এ ধরনের ফালতু বাহানা দাঁড় করায়, তাদের বেশির ভাগও অজাচার বা *Incest*-কে অনৈতিক মনে করে; তখন তাদের ওইসব গাঁজাখুরি যুক্তি আর দেখা যায় না। আবার কিছু কুলাঙ্গার স্রষ্টাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানকে রবের আসনে বসায়। কিন্তু বিজ্ঞান নৈতিকতার প্রশ্নে অচল হওয়ায় ওই কুলাঙ্গাররাও রক্তসম্পর্কের অজাচারকে অনৈতিক প্রমাণ করতে পারে না; তবুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের যদি বলা হয় নিজ স্ত্রীকে নিজ ছেলের সাথে অজাচার করতে দেবে কি না—তখন ওদেরও ঠিকই নৈতিকতা চলে আসে। আর সর্বশেষ শ্রেণির যেসব চূড়ান্ত কুলাঙ্গাররা নৈতিকতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অপারগ হয়ে সমকামিতার সাথে সাথে নিজ বাবা-মা, ছেলেমেয়েদের সাথেও এমন অজাচারের বৈধতা দিয়ে দেয়, সেই কুলাঙ্গারদের ব্যাপারে বোঝাই যায় যে এরা আসলে সমাজে কী প্রতিষ্ঠা করতে চায়... এককথায় চূড়ান্ত মাত্রার ব্যভিচার ও অরাজকতা—ঠিক যেমনটা শয়তান চায়।

নৈতিকতা এবং এর থেকে উৎসারিত অপরাধবিজ্ঞান গড়েই উঠেছে ধর্মীয় অনুশাসনগুলোকে কেন্দ্র করে। কারণ, কারও ইচ্ছা হলেই কোনো কিছু করে ফেলতে পারবে কি না—এমন সমস্ত বিষয়াদি শেষমেশ নৈতিকতার প্রশ্নেই এসে দাঁড়ায়, যা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। আর মানুষভেদে যেহেতু নৈতিকতার মূল্যায়ন ভিন্ন, তাই যে-কেউ দাবি করতেই পারে যে, সে আরেকজনের নির্ধারণ করে দেয়া নৈতিকতার স্কেলে চলবে না। তাই এ ক্ষেত্রেও সবচেয়ে যৌক্তিক হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্ধারিত সার্বজনীন নৈতিকতা মেনে নেয়া। তাছাড়া, সৃষ্টিকর্তাই বিধান প্রদান ও নৈতিকতার স্কেল নির্ধারণের সবচেয়ে বেশি হকদার ও একচ্ছত্র অধিকারী। তা না হলে যে যা খুশি তা-ই করতে চাওয়ার অধিকার দিতে দিতে একসময় সভ্যতার পতন নিশ্চিত হয়; এ কারণেই আধুনিক *Individualism*, *Secularism* তথা সেক্যুলারব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। আর সমস্ত অধঃপতনের সূত্রপাত হয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্ধারিত নৈতিকতা ও অনুশাসন

ছুড়ে ফেলে বিজ্ঞান দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় মেতে ওঠে। ইদানিংকালে সমকামিতা বিষয়ে মানবিকতার প্রশ্ন এড়াতে 'গে জিন' *(Gay Gene)* আবিষ্কারের নতুন ফন্দি আঁটা হয়েছে। অর্থাৎ জন্মগতভাবেই কেউ সমকামি হয়ে গেলে তো এ কাজে আর অমানবিকতার তীর আসবে না। কিন্তু বহু চেষ্টা হলেও এমন জিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ কারণে বলতে শোনা যায়, বিজ্ঞানীরা "ধারণা করছেন" সমকামিতার কারণ হলো "গে জিন"। আর তাতেই নাস্তিক্যবাদীদের আস্ফালন শুরু হয়ে যায়, এমন সব নিউজগুলো ফলাও করে প্রচার করতে দেখা যায়। অথচ এমন ধারণা যে তাহলে অন্যসব অপরাধের ক্ষেত্রেও করে নেয়া যায় অর্থাৎ কেউ সিরিয়ালি খুন করছে— "কিলার জিন" এর কারণে, কেউ ধর্ষণ করছে "রেপিস্ট জিন" এর কারণে, এতে তার কোনো দোষ নেই, কেবল সেই জিনটা খুঁজে পাওয়া বাকি— একই যুক্তি এসব ক্ষেত্রে ঠিকই এড়িয়ে যাওয়া হয়। এভাবে যখন যে যুক্তি যেভাবে নিজের কাজে লাগে, সেভাবে যাচ্ছেতাইভাবে জোড়াতালি দিয়ে গড়ে উঠে ওদের তর্কগুলো।

সভ্যতার অধঃপতনের একটি বাস্তব উদাহরণ হলো, আমেরিকায় ৩০-৪০ বছর আগে সমকামিতাকে অপরাধ আর মানসিক ব্যাধি হিসেবে দেখা হলেও এখন সেখানে এটা বৈধ করা হয়ে গেছে। এছাড়া বিশ্বের কিছু জায়গায় *Incest Marriage* এরও বৈধতা রয়েছে! আবার কিছু জায়গায় রীতিমতো উলঙ্গ হয়ে ঘোরাফেরার অধিকারের জন্য আন্দোলনও চলে।

আর বলাই বাহুল্য, সভ্যবেশী অসভ্যদের দেশে মানুষ উলঙ্গ হয়ে চলাফেরার জন্য নির্ধারিত বহু সৈকত রয়েছে! এভাবে ধীরে ধীরে পশুর স্তরও অতিক্রম করে নেমে যাচ্ছে ওরা। আর এই সমস্তকিছুর প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, তাঁর নির্ধারিত নৈতিকতাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞান দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। কারণ ওই একটাই, বিজ্ঞানে 'নৈতিকতা' প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই!

শিল্পকলা ও নান্দনিকতা (*Aesthetics and Art*)

শিল্পকলার মূল্য বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিজ্ঞানের আওতার বাইরে আর তাই শিল্প-সাহিত্যও বিজ্ঞান দ্বারা মাপা যায় না। সে কারণে পাথরের ভাস্কর্য যতো নিখুঁতই হোক না কেন, বিজ্ঞানের হিসাবে তার মূল্য কেজি দরে অন্যান্য পাথরের মতোই। তেমনই চিত্রকর্ম, সাহিত্যকর্ম বাস্তবে যতই সৃজনশীল ও নান্দনিক হোক না কেন, সেগুলোর সবই বিজ্ঞানের হিসাবে রীতিমতো মূল্যহীন। কারণ শিল্পমূল্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব না।

দেশীয় কলাবিজ্ঞানীরা আল্লাহকে অবিশ্বাসের জন্য এত বিজ্ঞান কপচায়, অথচ শিল্পকলারই যে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই তা তাদের মনে থাকে না। এছাড়া শিল্পবোধে আসক্তি বেশিরভাগ সময়েই নগ্নতায় গিয়ে ঠেকে। প্রাচীন গ্রিক ভাস্কর্য থেকে উপমাহাদেশীয় প্রাচীন মূর্তি, চিত্রকর্ম, সাহিত্য সবকিছু সেই সাক্ষ্যই বহন করে। কামনা-বাসনাকে নির্জীব এসব শিল্পমাধ্যমে ধারণ করা মূলত *Objectophilia* নামক বিকারগ্রস্ততার প্রায়োগিক রূপ।

শিল্পচর্চাকারীদের বেশির ভাগই এই মানসিক বিকারগ্রস্ততায় আক্রান্ত হয়ে যায় আর নিজেদের সাহিত্যে-শিল্পকর্মে নগ্নতা, বিকৃত যৌনাচার ইত্যাদির প্রকাশ ঘটায়। চিত্রকর ছবিতে এগুলো ফুটিয়ে তোলে, সাহিত্যিক নিজের গল্প-কবিতা-উপন্যাসের কল্পিত চরিত্রদের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে, তো ভাস্কর ফুটিয়ে তোলে ভাস্কর্যে।

শিল্পের আধুনিক রূপ সিনেমা, গান ইত্যাদিতেও শিল্পের নামে বেহায়াপনা, অশ্লীলতার প্রসার হয়। শিল্পের নামে ওদের কাছে সবই চলে। কিন্তু এ রকম বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, অবাধ যৌনাচার বা এমন কিছু হওয়ার সুযোগ রয়েছে তেমন বেশির ভাগ মাধ্যমগুলোকেই ইসলামি অনুশাসন কখনো বৈধতা দেয় না। বৈধতা দেয় না কোনোটিরই লাগামহীনতার। সে কারণেই যুগে যুগে কলাচর্চাকারীদের ইসলামের প্রতি এত বিদ্বেষ।

এককথায়, তারা শিল্পের নামে যা খুশি তা করার স্বাধীনতা চায়। অর্থাৎ, তারা সেক্যুলারিজমই চায় 'শিল্প' নামক মুখোশের আড়ালে। এ কারণেই দেখা যায়, যে-ই শিল্পসাহিত্য সচেতন, সে-ই সেক্যুলার। আবার যে সেক্যুলার সেও শিল্পসাহিত্য অনুরাগী।

চৈতন্যবোধ (*Consciousness*)

নিজস্ব অনুভূতি বা চৈতন্যবোধ কখনো বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞান কখনোই বলতে পারে না ভালোবাসার, ঘৃণার, রাগ-অভিমান করার বা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হবার অনুভূতি কেমন। স্ক্যান করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কিন্তু অনুভূতিগুলো আসলে কেমন তা জানা যায় না।

এছাড়াও অনুভূতি-অভিজ্ঞতা হয় একান্তই নিজস্ব ও ব্যক্তিভেদে একেক রকম। বিশ্বাস, ভালোবাসা ইত্যাদি ছাড়াও সমুদ্রের পাড়ে সূর্যাস্ত দেখার অনুভূতি কেমন, ঝরনার মৃদু শব্দ শোনার অনুভূতি কেমন—এসব থেকে শুরু করে সাধারণ লাল রং দেখার অনুভূতিটিও আসলে একজনের নিকট কেমন—তা বিজ্ঞান তো দূরের কথা, দ্বিতীয় আরেকজনও বলতে পারে না; এমনকি দ্বিতীয়জনকে হুবহু একই বিষয়াদি দেখানো-শোনানো হলেও। চেতনা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার একান্তই ব্যক্তিগত হওয়ার এই ব্যাপারটিকে *Qualia* বলা হয়ে থাকে।

[৩]

বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, এমন অজস্র বিষয়াদি জানার পর 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধেই কিছু বিষয় লক্ষণীয়।

প্রথমত, অনেকে বিজ্ঞানকে সব সমস্যার সমাধান মনে করে, মনে করে বিজ্ঞান হলো *Omnipotent.* অথচ দর্শন, যুক্তি, মানবিকতা-নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়াদি যে বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, তা তাদের মাথায় আসে না। তাছাড়াও *'বিজ্ঞান দিয়ে সব ব্যাখ্যা করা যায়'* বা *'বিজ্ঞান হলো Omnipotent'*

অথবা *'বিজ্ঞান একসময় ঠিকই উত্তর খুঁজে বের করবে'* এই কথাগুলোও স্রেফ দর্শনগত উক্তি বা বিশ্বাসমাত্র। এই কথাগুলোরও কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই! এগুলোও বিজ্ঞানের প্রতি অন্ধবিশ্বাস—একে বলা হয় *Scientism* যা কিনা *New-Atheism* এর ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান আসলে কী? পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, যুক্তিতর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে জগৎ সম্বন্ধে জানবার পদ্ধতিগত উপায়ই হলো বিজ্ঞান। সাধারণত বিজ্ঞান দুই উপায়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়—*Deductive reasoning* আর *Inductive Reasoning*। *Deductive reasoning*-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কিছু দর্শন, যুক্তিতর্ককে সত্য ধরে নিয়ে শেষমেশ সিদ্ধান্তে আসা হয়। আর *Inductive Reasoning*-এ পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসা হয়। প্রথমটিতে যে কেবলই উপলব্ধি ও দর্শনগত কিছু সত্যকে মেনে নিয়েই সামনে আগানো হয়—তা আগেই আলোচিত হয়েছে। আর ২য় উপায়ে অর্থাৎ, *Inductive Reasoning*-এ যেসব পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসা হয়, সেগুলোর পরবর্তী পর্যবেক্ষণ সব সময়ই ভিন্ন ফলাফল দেখাতে পারে।

যেমন—কেউ যদি একটি শহরের ২০,০০০ কবুতর পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধন্তে আসে যে, এই শহরের কবুতরগুলো সাদা, তাহলে তার সিদ্ধান্ত আপাত সত্য হলেও অ্যাবসোলুট বা পরম সত্য হবে না। কারণ ২০,০০১ তম কবুতরটি সব সময়ই বাদামি বা ধূসর হতেই পারে। *Inductive Reasoning* ভিত্তিক এমন বহু তথ্য আমরা 'বিজ্ঞান' শব্দের আড়ালে নিত্য অকাট্য ভেবে নিই। তাছাড়া আরেকজনের পর্যবেক্ষণ থেকে আসা সিদ্ধান্ত যে আসলেও সত্য—সেটা মেনে নিয়ে আমরা মূলত সিস্টেমনির্গত 'বিজ্ঞানী' দাবিদারদের বিশ্বাস করে যাই। এছাড়াও রাজনীতির প্রশ্নে, ইতিহাসের প্রশ্নে, নৈতিকতার প্রশ্নে, এ রকম আরও অনেক প্রশ্নে আমরা নানাজনের কথা বিশ্বাস করে যাই অহরহ, তখন বলি না চাক্ষুষ প্রমাণের কথা।

কিন্তু 'সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব' যা উপলব্ধিগতভাবে আমরা অনুভব করি—সে ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারি না ৪০ বছর ধরে 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী

মানুষটি শেষ নবুওয়্যাতের আর এক রাতের মধ্যে ইসরা-মিরাজের দাবি নিয়ে এলে, লেখাপড়া না জেনেও কুরআনের মতো অশ্রুতপূর্ব বাণী নিয়ে এলে, আসলে বিশ্বাস করতে পারি না তা নয়, বরং বিশ্বাস করতে চাই না।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যাখ্যাস্বরূপ অনেক তত্ত্ব দাঁড় করায়। আর অনেকসময়ই সেসব তত্ত্ব পর্যবেক্ষণেরও অযোগ্য হলেও মানুষ তাতে 'বিশ্বাস' করে, স্রেফ পক্ষপাতদুষ্ট সিস্টেমনির্গত 'বিজ্ঞানীরা' বিশ্বাস করেন বলে। এই সিস্টেম পক্ষপাতদুষ্ট কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট বস্তুবাদী দর্শনের ওপর গড়ে ওঠা, এবং এই সিস্টেম অন্ধভাবে সায়েন্টিজমে বিশ্বাসী। অর্থাৎ এই সিস্টেম বিশ্বাস করে 'বিজ্ঞান দিয়ে সব ব্যাখ্যা করা যায় বা যাবে'। প্রকৃতিগতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট এই সিস্টেম থেকে বের হওয়া বায়াসড বিজ্ঞানীদের অপ্রমাণিত মত এবং বিশ্বাসকে উপস্থাপন করা হয় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হিসেবে। বেশি বেশি প্রচার করা হয় নাস্তিকতার উপসংহারকে সমর্থন করে এমন বিভিন্ন হাইপোথিসিসগুলোকে। ফলস্বরূপ এই সিস্টেমনির্গত অপ্রমাণিত, প্রমাণ অযোগ্য দাবিগুলোকে আমরা হরহামেশা বিশ্বাস করি। যেমন, *Multiverse Theory*-তে অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্বাসী, অথচ সবাই জানে যে এই মহাবিশ্বের বাহিরে কোনোকিছু পর্যবেক্ষণও সম্ভব নয়। এখন স্রষ্টাও পর্যবেক্ষণ-আওতামুক্ত, আবার অন্য মহাবিশ্বও পর্যবেক্ষণ-আওতার বাইরে। তাহলে কেন শেষমেশ থিওরিই বেছে নেয়া! এবং একে বৈজ্ঞানিক (*scientific*) বলে দাবি করা? যেন স্রষ্টাকে অবিশ্বাসের জন্যই এতসব নাটক। তা না হলে যে বস্তুবাদী হওয়া যায় না, পাওয়া যায় না 'যা খুশি তা করা'র সার্টিফিকেট।

চতুর্থত, তাত্ত্বিক বিষয়াদি ছাড়াও পরিমাপসহ অন্যান্য প্রায়োগিক ক্ষেত্রের মূল বিষয়গুলোও আমরা কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়া মেনে নিই। প্র্যাক্টিকালের বিষয়গুলো হলো এককগুলো। যেমন, এক মিটার আসলে কতোটুকু? কেন এতটুকুই হলো? কেন সামান্য বেশি বা সামান্য কম হলো না - এই প্রশ্নগুলো আমরা কেউ করি না। কারণ, এই ধরনের বিষয় মেনে না নিয়ে তর্ক করা আসলে অযথা কালক্ষেপণের খারাপ নিয়্যাতকেই নির্দেশ করে। অথচ একই জিনিস যে আল্লাহর দেয়া বিধিবিধানগুলোর জন্যও প্রযোজ্য—তা নাস্তিক আর

সংশয়বাদীদের খেয়াল থাকে না। এই বিধান এমন কেন হলো, ওটা অমন কেন হলো, কেন ওটা এ রকম হলো না—এমন সমস্ত প্রশ্নও যে মেনে না নেয়ার খাতিরে অযথা কালক্ষেপণেরই নামান্তর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে নাস্তিক, সংশয়বাদী আর সমঘরানার প্রাণীরা কেবল দুটো কারণে করে থাকতে পারে। এক, তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে অথবা দুই, কেবল অবিশ্বাসের জন্য তারা ভণ্ডামি বা *Hypocrisy*-তে মেতেছে।

পঞ্চমত, বিজ্ঞানের একটি শাখা *Quantum Physics*-এর অনেক বিষয়ই আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে অনুধাবণ করা গেলেও বিজ্ঞান তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যেমন, *Quantum Entanglement* হলো ইলেকট্রনের মতো উপপারমাণবিক কণিকাগুলোর এমন এক বিশেষ অবস্থা, যখন বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব হলেও দুটি কণিকার মধ্যে এক রকম যোগাযোগ থাকে। পুরো মহাবিশ্বে এই অবস্থায় কণিকারা বিরাজমান থাকায় পুরো মহাবিশ্ব রীতিমতো একটা জীবন্ত দেহের মতো! অথচ এটা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম সূত্র—মহাবিশ্বে আলোর গতিবেগ সর্বোচ্চ—এর বিপরীত। এর কারণ হিসেবে কোয়ান্টাম কণিকার জগৎ আর তার ধর্মকে আলাদা বিবেচনা করেই এর নিষ্পত্তি করে দেয়া হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য, অন্যান্য সবকিছুর মতো এখানকার 'কেন' প্রশ্নেও বিজ্ঞান নীরব। কীভাবে হয় সে ব্যাখ্যাতেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে।

[৪]

Burden of Proof এর ভুল প্রয়োগ

Burden of Proof হলো কেউ কোনো দাবি নিয়ে এলে সেই দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করার *Burden* বা দায়ভার। এত এত কিছু প্রমাণ ছাড়া মেনে নিলেও কেবল স্রষ্টার ক্ষেত্রেই এসে নাস্তিকদের *Burden of Proof* খোঁজাটা আসলে ভণ্ডামিই নির্দেশ করে। কিন্তু সেটা বাদ দিলেও ইতিহাসে *Burden of Proof*-এর সবচেয়ে বাজে আর বুদ্ধিহীন প্রয়োগ সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রেই হয়ে

থাকে, আর সেটা করে যত্তসব বুদ্ধিহীন অথর্বরাই। কারণ আস্তিক-নাস্তিক আলোচনায় *Burden of Proof*-এর কথা যখন আনা হয়, তখন *by default* বা আগে থেকেই ধরে নেয়া হয় যেকোনো সৃষ্টিকর্তা নেই আর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এক নতুন দাবি। আর তাই দাবিকারীকে নিজ দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। যুক্তি ঠিক আছে, তবে প্রয়োগ নয়! বরং সৃষ্টির নৈপুণ্য আর সুবিন্যাস থেকেই *by default* একজন *Intelligent Designer/ Manufacturer* বা এককথায় স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ঠিক যেমন এই লেখাটি পড়বার সময় *by default* একজন লেখকের অস্তিত্ব মন স্বীকার করে নেয়। লেখাটির পেছনে যে একজন বুদ্ধিমান সত্তার অস্তিত্ব আছে তা আলাদা করে প্রমাণ করতে হয় না।

ডিএনএ কোডিংয়ের কথাও যদি বাদ দিই, মহাবিশ্বের উৎপত্তি, ছায়াপথ, নক্ষত্রসমূহ থেকে শুরু করে অণু এবং আণবিক কণার মতো বস্তুর আকার আকৃতিও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেকগুলো মৌলিক ধ্রুবকের ওপর নির্ভর করে। আর প্রতিটি সংখ্যায় যে পরিমাণ নিখুঁত সমন্বয় করা হয়েছে, তা একজন *Intelligent Designer*-এর অস্তিত্বের দিকেই নির্দেশ করে। মহাকর্ষধ্রুবক যদি $১০^{৬০}$ এর (অর্থাৎ, ১ এর পরে ৬০ টি শূন্য) এক ভাগ বেশি বা কম হতো, তাহলে কোনো ছায়াপথ, গ্রহনক্ষত্র কিছুই সৃষ্টি হতো না। শুধু এই ধ্রুবকের অতো সূক্ষ্ম পরিমাণ বিচ্যুতিতেও মহাবিশ্বের সূচনালগ্নেই এর অতিব্যাপ্তি হয়ে যেতো বা মুহূর্তেই ধীর ব্যাপ্তির কারণে পরক্ষণেই গুটিয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো। আবার, মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান $১০^{১২০}$ এর এক ভাগও এদিক-সেদিক হলে তা মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের হারে একই প্রভাব ফেলে কখনো এ পর্যন্ত আসা তো দূরের কথা, মহাবিশ্ব নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যেতো।

যে সমস্ত বিচ্যুতির কথা বলা হচ্ছে, তা যে আসলে কতো ক্ষুদ্র তা বুঝতে পৃথিবীতে মোট যতোটি বালুকণা রয়েছে—তা কল্পনা করা যেতে পারে। এই সংখ্যক বালুকণা দিয়ে যদি একটা ধ্রুবক গঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়, তবে পৃথিবীতে আরেকটি বালুকণা যোগ করলে বা একটি সরিয়ে নিলে আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না! প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, পারমাণবিক মৌলিক

কণিকাগুলোর ভর, হাবল ধ্রুবকসহ আরও বহু ধ্রুবকের এমন নিখুঁত ভারসাম্য বা *Fine Tuning* একজন বুদ্ধিমান সত্তা আছেন এই যৌক্তিক উপসংহারের দিকেই *by default* নিয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে *Burden of Proof* আসলে নাস্তিকদের ওপরেই বর্তায়। আমরা সৃষ্টিজগৎ থেকে স্বভাবজাতভাবেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বুঝি। এটাই হলো *by default.* এখন তোমরা নিজেদের অস্বীকারের প্রমাণ দাও।

নাস্তিক্যবাদী বিজ্ঞানীরা এমন অসম্ভব নিখুঁত বিন্যাসকে স্রষ্টা ছাড়া ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় *Multiverse Theory* এনেছে যেখানে মূলত বলা হয় পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর যতো সম্ভাবনা হওয়া সম্ভব, তার সবগুলো ক্রমান্বয়ে হয়ে চলছে অর্থাৎ লক্ষ-কোটি বিলিয়নসংখ্যক মহাবিশ্ব বিভিন্ন মানের মৌলিক ধ্রুবক নিয়ে ক্রমাগত জন্মাচ্ছে আর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনোটি হয়তো টিকে যাচ্ছে কিছুকাল। আর এভাবে করে যে মহাবিশ্বটির সবকিছু একেবারে *Perfect* হয়ে গিয়েছে, ঠিক সেটাতেই সৌভাগ্যবশত আমরা রয়েছি! অথচ এই তত্ত্ব বা বিশ্বাস প্রমাণের কোনো উপায় নেই। কারণ, অন্য কোনো মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণই সম্ভব নয়। এই তত্ত্বও যে *Burden of Proof*-এর দাবি রাখে সে কথা আর কেউ বলে না। কেবল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অবিশ্বাসের জন্য এই সমস্ত রূপকথায় বিশ্বাস আর প্রচার-প্রসার করে চলে। অথচ না দেখেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা এলে, আল্লাহর ইচ্ছায় এক রাতে ইসরা-মিরাজ ভ্রমণের কথা এলে এরাই আবার রূপকথা বলে বলে মুখে ফেনা তোলে।

আগেকার যুগের জ্ঞানীরাও সৃষ্টিনৈপুণ্য থেকে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারতেন। তখন কেবল শুধু আজকের মতো সূক্ষ্ম মানসহ জানা ছিল না। নবী ইবরাহিম (আ.) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বৈচিত্র্যময় বিষয়গুলো দেখে চিন্তাভাবনা করে স্রষ্টায় বিশ্বাসে এসে পৌঁছেছিলেন (৬ : ৭৫), তো অ্যারিস্টটল কল্পনা করেছিল সারাটা জীবন মাটির নিচে কাটিয়ে দেয়া কিছু মানুষেরা হঠাৎ ওপরে উঠে এলে সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে ঠিকই একজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। অবশ্য ইবরাহিম (আ.) যে আল্লাহরই কাছে আন্তরিকভাবে সাহায্য প্রার্থনাস্বরূপ বলেছিলেন, “যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে

অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।" (৬ : ৭৭) এমন সাহায্য চাওয়া অ্যারিস্টটল বা হালের অ্যান্টনি ফ্লিউদের বেলায় শোনা যায় না। অথচ স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুধাবনের পর তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে সাহায্য প্রার্থনাই হলো সর্বপ্রথম দায়িত্ব যা কিনা প্রকৃত মুমিনরা সুরা ফাতিহার মাধ্যমে দিনে কমপক্ষে ১৭ বার করে থাকে।

[৫]

আসলে প্রমাণ খোঁজাতে সমস্যা নেই। সমস্যা হলো যাচাইয়ের সৎ মানসিকতা থেকে প্রমাণ না খুঁজে অবিশ্বাস পুষে রেখে কালক্ষেপণের জন্য 'প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই' বলে বেড়ানো। এমন মানুষদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিই, অন্তরে সৎ নিয়্যাত রয়েছে নাকি কালক্ষেপণের বা সংশয় সন্দেহে ডুবে থেকে দুনিয়াতে যা খুশি তা-ই করে বেড়ানোর ধান্দা রয়েছে তা সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

ইসরা ও মিরাজের রাতের পরদিন সকালে তাই মক্কার কাফিরদের জন্যও কাফেলার প্রমাণ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি। অথচ আবু বকরও (রা.) প্রমাণ খুঁজেছিলেন। অতঃপর প্রমাণ পাবার পর ঠিকই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য বলছেন। অর্থাৎ, প্রমাণের চেয়েও বড় হলো আসলেও আপনি আন্তরিক কি না, আসলেও আপনি বিশ্বাস করতে চান কি না। নইলে শত-সহস্র প্রমাণেও কোনো ফায়দা হবে না। তাই আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বান্দাদের থেকে প্রথমেই চেয়েছেন গায়েবে বিশ্বাস, কারণ যে বিশ্বাস করতে চায় না তার জন্য কোনো প্রমাণই অকাট্য হবে না। সে কারণেই সুরা বাক্বারার প্রথমেই আল্লাহ বলেছেন 'যারা গায়েবে বিশ্বাস করে'। কারণ আমরা আসলে প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস করি—তা নয়; বরং একটা বিষয় সচেতন বা অবচেতনভাবে বিশ্বাস করি বলেই প্রমাণ পাই, সে বিষয়ের প্রমাণ গ্রহণ করি।

আর আমরা যে সবকিছুর প্রমাণ পেয়ে পেয়ে বিশ্বাস করি না—তা তো আগেই আলোচনা হলো। তাই আবু বকরের (রা.) মতো সর্বোত্তম ঈমান না হোক,

সামান্য বিশ্বাসের সদিচ্ছা আর আন্তরিকতাও যদি অন্তরে না থাকে, তবে কখনোই 'বিশ্বাস' সম্ভবপর নয়।

...

"... এরপর আবু বকর (রা.) সেখান থেকে সোজা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট চলে আসলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি কি এদের কাছে বলেছেন যে, এই রাতে আপনি বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন?' তিনি (ﷺ) বললেন, 'হাঁ।' আবু বকর (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! সে মাসজিদটির বর্ণনা দিন তো; আমি সেখানে গিয়েছিলাম।' তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন যে, ওই সময় বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরা হলো। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। এরপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আবু বকর (রা.) এর কাছে বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিতে লাগলেন। আর আবু বকর (রা.) প্রতিবারই বলতে লাগলেন, 'আপনি সত্যই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসুল।'"[২৫২]

---

[২৫২] সীরাতুন নবী (সা.), ইবন হিশাম (র), ২য় খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃষ্ঠা : ৭৪

একজন অ্যান্টনি ফ্লিউ-এর গল্প

সত্যকথন ডেস্ক

প্রায় পাঁচ দশক জুড়ে অ্যান্টনি ফ্লিউ ছিলেন পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় একজন নাস্তিক। ফ্লিউ শুধু ব্যক্তিগতভাবে একজন নাস্তিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন নাস্তিকতার প্রচারকদের মধ্যে প্রথম সারির একজন। বলা যায় ফ্লিউ ছিলেন অ্যাকাডেমিক নাস্তিকতার আইকন। কিন্তু প্রায় ৫০ বছর নাস্তিকতার পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাবার পর ২০০৪ সালে ফ্লিউ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অবশ্যই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। জীবনভর দার্শনিক অনুসন্ধানের পর, এবং একজন নাস্তিক হিসেবে নিজের প্রায় সম্পূর্ণ জীবন কাটানোর পর শেষ পর্যন্ত অ্যান্টনি ফ্লিউ এই উপসংহারে পৌঁছান যে, সকল তথ্য উপাত্ত ও যুক্তিপ্রমাণ একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকেই নির্দেশ করে।

জীবনের বেশির ভাগ সময় ধরেই নাস্তিকতার দার্শনিক বীরপুরুষ হিসেবে পরিচিত ফ্লিউ তার এই উপসংহার ঘোষণা করার পর এতদিন তাকে মাথায় তুলে রাখা নাস্তিকরাই উঠেপড়ে লাগলো তাকে 'জরাগ্রস্ত', 'ভীমরতিতে পাওয়া বুড়ো' ইত্যাদি প্রমাণে। তারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে গেলো শেষ বয়সে গিয়ে কিছু খ্রিষ্টানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফ্লিউ নিজের মত বদলেছেন।

ফ্লিউ এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং নাস্তিকতা থেকে আস্তিকতার দিকে তার এই দার্শনিক যাত্রা বর্ণনা করে একটি বই লিখলেন, "*There Is A God, How The World's Most Notorious Atheist Changed His Mind*". কোন

সূচীপত্র

যুক্তি ও প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, এই বইতে ফ্লিউ তা ব্যাখ্যা করলেন।

"এখন আমি বিশ্বাস করি এক অসীম বুদ্ধিমত্তা এই মহাবিশ্বকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। আমি বিশ্বাস করি যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মগুলো দ্বারা এই মহাবিশ্ব পরিচালিত হয়, সেগুলোর মাধ্যমে একজন স্রষ্টার ইচ্ছা ও অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। আমি বিশ্বাস করি জীবন এবং জীবনধারার উৎস ঐশ্বরিক।" [২৫৩]

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজতান্ত্রিকদের পাঠচক্রে খুঁজে পাওয়া স্রোতের সাথে গা ভাসানো নিরামিষ নাস্তিক কিংবা 'সামহোয়্যার ইন ব্লগ' বা মুক্তমনা ব্লগে ইংরেজি থেকে নানা প্রবন্ধ অনুবাদ করে "মুক্তচিন্তার" পতাকা ওড়ানো গালিবাজ শব্দসন্ত্রাসী জাতীয় নাস্তিক ছিলেন না অ্যান্টনি ফ্লিউ। খুব অল্প বয়সে নাস্তিকতার ওপর একটি লেখা প্রকাশ করে ফ্লিউ দার্শনিক অঙ্গনে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন।

১৯৫০ সালে প্রকাশিত *"Theology and Falsification"* নামের এই পেপারটি গত পঞ্চাশ বছরে বার বার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। ফ্লিউয়ের এই লেখা দার্শনিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল এবং ফ্লিউয়ের জন্য এনেছিল একজন তুখোড় দার্শনিক হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। পুরো ক্যারিয়ারজুড়েই অ্যাকাডেমিক জগতে ফ্লিউয়ের অবস্থান ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। একপর্যায়ে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হিসেবেও দায়িত্বরত ছিলেন। তবে অধিকাংশ নাস্তিকদের মধ্যে উপস্থিত একটি বৈশিষ্ট্য থেকে ফ্লিউ মুক্ত ছিলেন।

অধিকাংশ নাস্তিক নিজের নাস্তিকতার দিকে যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তি নিয়ে সামান্য ঘাঁটাঘাঁটি করে। কিন্তু নাস্তিকতার বিশ্বাসে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করার পর সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এবং দার্শনিক যুক্তিতর্ক সম্পর্কে চিন্তা করা বন্ধ করে দেয়, অথবা শুধু নিজেদের সংকীর্ণ

---

[২৫৩] *There Is A God*, page 88

অবিশ্বাসের বিশ্বাসের লেন্স দিয়ে সবকিছুকে বিচার করে। এই জায়গাটাতে ফ্লিউ ছিলেন আলাদা। ফ্লিউয়ের একটি দুর্লভ গুণ ছিল। *“প্রমাণাদি যেদিকে নিয়ে যায় তার অনুসরণ করা”*র নীতির কথা তিনি বাকি নাস্তিকদের মতো শুধু মুখে আওড়াতেন না; বরং সত্যিকারভাবেই এই নীতির অনুসরণ করতেন।

ফ্লিউয়ের নিজের ভাষায়—

“এমনকি বিগ ব্যাং তত্ত্ব কিংবা ফাইন-টিউনিং (Fine Tuning) তত্ত্ব প্রকাশের বহু আগেই আমার অন্যতম সেরা দুইটি ধর্মতত্ত্ব বিরোধী বই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আশির দশকের শুরুর দিকে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা শুরু করতে বাধ্য হলাম। আমি এই কথা স্বীকার করেছিলাম যে, সমসাময়িক মহাজাগতিক (Cosmological) আবিষ্কারগুলোর কারণে নাস্তিকরা বিব্রত হতে বাধ্য। কারণ থমাস অ্যাকুইনাস দর্শনের মাধ্যমে যেটি প্রমাণ করতে পারেননি (‘মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে’) তা মহাবিশ্বতত্ত্ববিদরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে শুরু করলেন।”[২৫৪]

আর এ কারণেই শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং নতুন আবিষ্কার তাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে যে—একজন বুদ্ধিমান সত্তাই এই মহাবিশ্বের উদ্ভাবন এবং ডিজাইন করেছেন। তিনি দেখলেন যে, বিগ ব্যাং তত্ত্বানুসারে ধারণা করা হয় মহাবিশ্ব আনুমানিক তেরো বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে। যদি একে সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে আমরা বর্তমানে যে জটিল পর্যায়ের জীব এবং জীববৈচিত্র্য *(complex life & complexity of life)* দেখি, বিবর্তনের মাধ্যমে তাতে উপনীত হবার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। এছাড়া, মাইক্রোবায়োলজি এবং ডিএনএ’র ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারও তাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করে যে, এ সবকিছুর পেছনে অবশ্যই একটি বুদ্ধিমান সত্তা থাকতে বাধ্য।

২০০৭ সালে বেনজামিন উইকারের সাথে সাক্ষাৎকারে ফ্লিউ বলেছিলেন—

---

[২৫৪] There Is A God, page 135

“আইনস্টাইনসহ আরও বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতের সাথে ক্রমবর্ধমান একাত্মতার অনুভূতি আমার সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস আনার পেছনে কাজ করেছে। আইনস্টাইনসহ আরও অনেক বিজ্ঞানী তাদের সূক্ষ্মদর্শিতার কারণে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, এই মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত এবং সুসংহতো জটিলতার (integrated complexity) পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্তার (স্রষ্টা) ভূমিকা আবশ্যক। এছাড়া আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই উপসংহারে পৌঁছেছিলাম যে জীবন ও জীববৈচিত্র্য—যা মহাবিশ্বের চাইতেও বেশি জটিল—শুধু একটি বুদ্ধিমান সত্তার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়।[২৫৫]

নাস্তিকরা সব সময় দাবি করে শুধু সাধারণ অশিক্ষিত, অজ্ঞ লোকেরা, যারা কোনো চিন্তাভাবনা করে না, তারাই স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। কিন্তু অ্যান্টনি ফ্লিউ নাস্তিকদের সব যুক্তি জানতেন। এমনকি বর্তমানে নাস্তিকরা যেসব যুক্তি ব্যবহার করে, এর অনেকগুলো তিনি নিজেই দাঁড় করিয়েছিলেন। নাস্তিকতার পক্ষে তিনি ৩০টির মতো বই লিখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি অন্ধ অবিশ্বাসী ছিলেন না, তাই সব যুক্তি ও প্রমাণ যে দিকে নির্দেশ করছিল, তিনি শেষপর্যন্ত সেই উপসংহারেই পৌঁছেছিলেন। আর তাই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, এ মহবিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক।

একজন নাস্তিক হিসেবে অ্যান্টনি ফ্লিউয়ের দার্শনিক পথ পরিক্রমার সবচেয়ে ইউনিক বৈশিষ্ট্য হলো প্রমাণ ও যুক্তির অনুসরণের ব্যাপারে তার সদিচ্ছা, যা অন্যান্য নাস্তিকদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই অনুপস্থিত। যখন ফ্লিউয়ের পাশাপাশি আপনি একজন ডকিন্স, হ্যারিস কিংবা ডেনেটকে দাঁড় করাবেন, তখন তাদের আত্মকেন্দ্রিক, উগ্র, অপরিপক্ক এবং ঝগড়াটে রূপ খুব সহজেই ধরা পড়বে।

অ্যান্টনি ফ্লিউ মারা যান ২০১০ সালে। একজন আস্তিক (*Deist*) হিসেবে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী না হয়ে। আর এতেই আছে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আমরা সত্যকথনের পাঠকদের জন্য, কিংবা

---

[২৫৫] Dr. Benjamin Wiker: Exclusive Flew Interview, 30 October 2007

নাস্তিকদের জন্য অ্যান্টনি ফ্লিউকে আস্তিকতার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করছি না। একজন মুফতি-মাওলানা যেমন মুরতাদ হতে পারে, আবার একজন অ্যান্টনি ফ্লিউ আস্তিক হতে পারে। এতে করে কোনো পক্ষেরই ভুল বা সঠিক হবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। নাস্তিক এবং মুসলিম — দুই পক্ষের জন্যই এতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলেই আমরা অ্যান্টনি ফ্লিউয়ের গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

নাস্তিকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়টি ইতিমধ্যে ফ্লিউ এর গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। আর তা হলো, অবিশ্বাসের অন্ধবিশ্বাস বাদ দিয়ে বিশুদ্ধভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ে চিন্তার সদিচ্ছার বিষয়টি। অনুরাগ-বিরাগের ঊর্ধ্বে উঠে প্রমাণ যেদিকে নির্দেশ করে সে উপসংহারকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকার বিষয়টি।

আর মুসলিমদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো, আস্তিক হওয়া শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য না। নাস্তিকদের তর্কে পরাজিত করাও আমাদের উদ্দেশ্য না। যদিও আমরা স্বীকার করি এ কাজটা আনন্দদায়ক। আমাদের উদ্দেশ্য ঈমান ও বিশুদ্ধ তাওহিদ অর্জন করা। আস্তিক হওয়া মানে হেদায়েত পাওয়া না। এ হলো শুধু বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়া। আমাদের কাজ হলো বাস্তবতাকে স্বীকার করার পর আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা-এর আনুগত্য করা।

অনেক সময়েই দেখা যায়, আস্তিক-নাস্তিক বিতর্ক, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, ইত্যাদি নিয়ে আমরা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, আমরা আমাদের ঈমানের দিকে, আমাদের তাওহিদের বিশ্বাসের দিকে অমনোযোগী হয়ে পড়ি। বুদ্ধি আপনাকে একটা পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে দেবে, যেমন অ্যান্টনি ফ্লিউয়ের ক্ষেত্রে তা তাকে সত্য পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট না। সত্য পর্যন্ত পৌঁছানোর পর আমাদের দায়িত্ব শেষ না; বরং আমাদের মূল দায়িত্ব শুরু।

আমাদের মূল দায়িত্ব হলো সত্যকে খুঁজে পাবার পর তার অনুসরণ করা, শোনা ও মানা। কারণ, যখন আপনি বুঝবেন মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছে, যখন আপনি উপলব্ধি করবেন আপনার একজন স্রষ্টা আছে, তখন আপনি এ-

ও বুঝবেন যে, এই স্রষ্টার প্রতি আপনার দায়িত্ব আছে। আস্তিক হওয়া আমাদের বিচারের দিনে কোনো কাজে আসবে না, যদি আমরা আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াহর অনুসরণ না করি। আমাদের সবার সব ক্ষেত্রে এ সত্যকে মনে রাখা উচিত। আমাদের আইনস্টাইন বা ফ্লিউয়ের ঈমানের দরকার নেই। আমাদের আবু বকর আস-সিদ্দিকের (রা.) মতো ঈমান দরকার। আইনস্টাইন বা প্যাসকেল আমাদের আদর্শ না। সাহাবীগণ (রা.) আমাদের আদর্শ। যারা অনর্থক প্রশ্ন কিংবা তর্কে সময় নষ্ট করতেন না। আর যখন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হতো, তারা (রা.) বলতেন আমরা 'শুনলাম ও মানলাম'। আমরা দু'আ করি এবং আশা করি, আমাদের সকল আন্তরিক মুসলিম ভাই ও বোনেরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করবেন।

নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, এই সুবিশাল মহাবিশ্ব ও এই অবিশ্বাস্য জটিল ও বৈচিত্র্যময় জীবনের সৃষ্টিকর্তা আপনাকে, আমাকে, এই সবকিছুকে নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন—

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[২৫৬]

আল্লাহ আমাদের সত্যকে চেনার, সত্যকে মানার ও সত্যকে বিশুদ্ধভাবে প্রচার করার তাওফিক দান করুন। নিশ্চয়ই হেদায়েত কেবল আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা-এর পক্ষ থেকেই।

[২৫৬] আল-কুরআন, সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২